নিবেদিত

নির্মিত

একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান

অভিজিৎ রায়

সমকামিতা

একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান

অভিজিৎ রায়

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.com

সমকামিতা

অভিজিৎ রায়

মুদ্রন প্রকাশক: শুদ্ধস্বর

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১০

দ্বিতীয় ইবুক প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৬

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক
ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: সব্যসাচী হাজরা

আলোকচিত্র: সংগৃহীত

ইবুক তৈরি
নরসুন্দর মানুষ

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

ISBN: 978-984-8837-24-5

Somokamita by **Avijit Roy**
Published by: Istishon eBook
First published in February 2010
Second eBook published in November 2016

সারা বিশ্বের অগণিত সংখ্যালঘু যৌনপ্রবৃত্তির মানুষদের মুক্তিসংগ্রামে যারা নির্ভয়ে আত্মত্যাগ করেছেন, তাদের পুরোধা আমেরিকার গ্রিনউইচ গ্রামের স্টোনওয়াল ইন-এর সংগ্রামী মজদুরদের

এবং

বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারে, মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং মননের বিকাশে আত্মনিবেদিত সকল লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজকর্মীদের উদ্দেশ্যে

"এখানে ছাড়তে হবে সকল অবিশ্বাস

এখানে ধ্বংস হবে সকল ভীরু হতাশ্বাস।"

দান্তের ডিভাইন কমেডিতে বর্ণিত নরকের প্রবেশদ্বারে উৎকীর্ণ পদাবলি,

যা পরবর্তীকালে মনীষী কার্ল মার্‌কস্‌ বিজ্ঞানের প্রবেশদ্বারে খোদিত করে রাখতে চেয়েছিলেন আজীবন।

সূচিপত্র

{সূচিপত্র ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক যুক্ত; **পর্ব নম্বর** লেখায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যাবে, সেই সাথে **পর্ব-পৃষ্ঠার টাইটেলে** মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি সূচিপত্রে আসা যাবে}

ভূমিকা

সময় পাল্টাচ্ছে। নতুন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পাল্টাচ্ছে আমাদের সনাতন মন মানসিকতা। খসে পড়ছে দীর্ঘদিনের নীতি ও নৈতিকতার কালো চাদরে ঢাকা মলিন আবরণগুলো। ভেঙ্গে পড়ছে শতাব্দীর ঘুণে ধরা সমাজের প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের অচলায়তন। শুরুটা হয়েছিল পশ্চিমে অনেক আগেই, এর ঢেউ এখন আছড়ে পড়তে শুরু করেছে পূবের উপকূলেও। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে সম্প্রতি নয়াদিল্লির হাইকোর্ট সমকামিতা অপরাধ নয় বলে রায় দিয়েছে (জুলাই, ২০০৯)[1]। ১৪৮ বছরের পুরোনো ঔপনিবেশিক আইনে সমকামিতাকে যেভাবে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনতা' হিসেবে গণ্য করে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল - এ রায়ের মধ্য দিয়ে সেটির অবসান ঘটল। সমকামিতা নামক যৌনপ্রবৃত্তিটি ভারতের মতো দেশে প্রথমবারের মতো পেল কোনো ধরনের আইনি স্বীকৃতি।

চিত্রঃ দিল্লী হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পর সমকামী অধিকার কর্মীদের উল্লাস (সৌজন্য – নিউইয়র্ক টাইমস)

[1] Indian Court Overturns Gay Sex Ban, The New York Times, July 2, 2009

দিল্লি হাইকোর্ট সমকামিতা নিষিদ্ধ আইনকে বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়েছে, সুস্পষ্টভাবে একে মানুষের 'মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন' বলে রায় দিয়েছে। নিঃসন্দেহে এ এক ঐতিহাসিক যাত্রা, শুধু সমকামীদের জন্য নয়, সার্বিকভাবে মানবাধিকারের জন্যও। কৃষিবিপ্লব, শিল্পবিপ্লবের ধারাবাহিকতায় যৌনতার বিপ্লব সূচিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে – সেই নবজাগরণের যে ঢেউ আজ ভারতে এসে পড়েছে, কিন্তু তাঁর ছোঁয়া বাংলাদেশে এখনো তেমনভাবে দৃশ্যমান নয়। বাংলাদেশের সমকামী যৌনতা আজ এক অনিশ্চিত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। দেশের প্রধান প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো কিংবা সচেতন বুদ্ধিজীবী সমাজ নারী অধিকার, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কিংবা বড়জোর পাহাড়ি কিংবা আদিবাসীদের অধিকারের বিষয়ে আজ কিছুটা সচেতনতা দেখালেও তারা এখনো যৌনতার স্বাধীনতা কিংবা সমকামীদের অধিকার নিয়ে একদমই ভাবিত নয়। প্রকাশ্যে কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেও দেখা যায় না ইস্যুটি নিয়ে কাজ করতে। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে তাদের জন্য এ ধরনের আন্দোলন বা সচেতনতা তৈরির প্রয়াস নেয়া যে কষ্টসাধ্য, তা সহজেই অনুমেয়। সমকামিতা অস্বীকৃত শুধু নয়, অনেক জায়গায় আবার এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এখানে সমকামীদের হয় লুকিয়ে থাকতে হয়, কিংবা অভ্যস্ত হতে হয় ‘ক্লোসেটেড গে’ হয়ে ‘বিবাহিত’ জীবন যাপনে। তাদের অধিকার হয় পদে পদে লঙ্ঘিত। এর সুযোগ নিয়ে অনেক সময় খুব কাছের বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে ঘটে আক্রমণ আর নানা পদের হেনস্থা। ‘সনাতন বাঙালি কিংবা ধর্মীয় সংস্কৃতি’র ধারক এবং বাহকের দল আর অন্যদিকে ‘অপসংস্কৃতি’র বিরুদ্ধে সদা-সোচ্চার স্বঘোষিত অভিভাবকবৃন্দ; কারো কাছ থেকেই সমকামীরা বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রত্যাশা করতে পারে না। আসলে সমকামীদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির একটা বড় কারণ আমাদের বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব। আর এ কথা বলে দেয়া নিষ্প্রয়োজন যে–সব পুরানো সংস্কৃতির মতোই আমাদের সংস্কৃতিরও অনেকটা জুড়েই বিছানো আছে অজ্ঞতার পুরু চাদর। আমাদের সংস্কৃতিতে গুরুভক্তি যেমন প্রবল তেমনি লক্ষণীয় ‘মান্য করে ধন্য হয়ে যাবার’ অন্তহীন প্রবণতা। আমরা গুরুজনদের বহু ব্যবহারে জীর্ণ আদর্শের বাণী

আর অভিভাবকদের শেখানো বুলি তোতাপাখির মতো আজীবন আউরে যেতে ভালোবাসি। আমাদের ভয় অনেক। সীমাহীন স্ববিরোধ আর বংশপরম্পরায় চলে আসা প্রথা মান্য করে যাওয়াকেই আমাদের সমাজে 'আদর্শ' বলে চিহ্নিত করা হয়। এর বাইরে পা ফেললেই বিপদ। কিন্তু তারপরও কাউকে না কাউকে তো 'বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার' দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতেই হবে। এই বইয়ের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বাংলাভাষীদের জন্য অজ্ঞতার চাদর সরানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে, সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ হাজির করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, সমকামিতা কোনো বিকৃতি বা মনোরোগ নয়, এটি যৌনতারই আরেকটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। প্রাণীজগতে এখন পর্যন্ত পনেরশ'র বেশি প্রজাতিতে বিজ্ঞানীরা সমকামিতার সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর আংশিক তালিকা এ বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পাশাপাশি আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস খুঁজে দেখানো হয়েছে সমকামিতাকে যতই 'অপসংস্কৃতি' কিংবা 'পশ্চিমা বিকৃতি' বলে চিহ্নিত করা হোক না কেন, এর প্রকাশ প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সংস্কৃতিতেও অত্যন্ত প্রবলভাবেই আছে। এ দিকে, বহুদিন হতে চললো, জেন্ডার সচেতন প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থায় সমকামিতাকে মনোরোগ কিংবা বিকৃতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না। পশ্চিমের আধুনিক চিকিৎসকেরা এবং মনোবিজ্ঞানীরা এখন সমকামিতাকে একটি স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তিই মনে করেন। উল্লেখ্য ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর American Psychiatric Association বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোনো নোংরা ব্যাপার নয়, নয় কোনো মানসিক ব্যধি। এ হলো যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ১৯৭৫ সালে American Psychological Association-ও একইরকম অধ্যাদেশ দিয়েছিল। তারপরেও যে সমকামীদের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে গেছে বলা যাবে না। আমেরিকার স্কুলগুলোতে একটু মেয়েলি গোছের ছেলেদের 'গে' প্রতিপন্ন করে আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়া হয়েছে – এ ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে পত্র-পত্রিকা এবং মিডিয়ার আলোয় উঠে এসেছে। শুধু সমকামী হবার কারণেই হত্যা করা হয়েছে ওয়াইয়োমিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাথু শেফার্ডের মতো মেধাবী ছাত্রকে। আমেরিকায় এখনো গে এবং লেসবিয়ানরা সামাজিক স্বীকৃতি ও

আইনগত বৈধতার জন্য আন্দোলন করছেন, অংশ নিচ্ছেন 'গে-প্রাইড' মার্চে। তাদের আন্দোলনের ফলে আমেরিকার বেশ কয়েকটি রাজ্যে সমকামী বিয়ে আজ স্বীকৃত। ব্রিটেনেও বিগত টনি ব্লেয়ারের সরকার কয়েক বছর আগে প্রথম সমকামী যুগলদের স্বীকৃতি দিয়েছে। কানাডায় আজ সমকামী, রূপান্তরকামী, উভকামী এবং উভলিঙ্গ মানুষেরা সেখানকার অন্যান্য নাগরিকদের মতোই সমান সুবিধা ভোগ করে থাকে, এমনকি তাদের মধ্যকার বিয়েও 'সিভিল ম্যারেজ' হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। পশ্চিমে সমকামী-অধিকার আন্দোলনের সাফল্য এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কয়েকটি প্রধান দেশও তাদের আইন সংস্কারে এগিয়ে এসেছে। চীনে আগে মাও সে তুংয়ের আমলে মনে করা হতো, সমকামিতা হচ্ছে 'পুঁজিবাদের বিকৃতি'। কিন্তু আশির দশক থেকে তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। নেলসন ম্যানডেলার নেতৃত্বে সাউথ আফ্রিকায় বর্ণবাদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে নতুন সংবিধান হয় তাতে শুধু ধর্মই নয়, যৌনতা বিষয়ে কোনো বৈষম্য করা হবে না এমন ধারা সংযোজিত হয়। পাকিস্তানের মতো রক্ষণশীল রাষ্ট্রেও উভলিঙ্গ নারী-পুরুষদের জন্য সমানাধিকারের আইন পাশ করা হয়েছে[2]। আমরা আশা করব, যুগের দাবির সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও একটা সময় সমকামিতা এবং অন্যান্য যৌনপ্রবৃত্তির প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব গড়ে উঠবে, একটা সময় পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ ষাঁড়দের যাতাকলে নিয়ত পিষ্ট সংখ্যালঘু যৌনপ্রবৃত্তির মানুষগুলোর আইনি অধিকার স্বীকৃত হবে। আর সেজন্য দরকার আমাদের সবার বিজ্ঞানমনস্ক উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

এ বইটির প্রথম দিককার কিছু অংশ সিরিজ আকারে[3] মুক্তমনা (www.mukto-mona.com) এবং সচলায়তন ব্লগে (www.sachalayatan.com) প্রকাশের সময় পাঠকদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সাড়া পেয়েছি। সে সময় বহু পাঠক তাদের

---

[2] Historic Decision: Pakistan's Supreme Court Orders Equal Rights for Transgender Pakistanis, Dawn, Wednesday, 15 Jul, 2009

[3] সমকামিতা (সমপ্রেম) কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ? ১ম, ২য়, ৩য় এবং চতুর্থ পর্ব; অভিজিৎ রায়; মুক্তমনা এবং সচলায়তন।

মূল্যবান মতামত দিয়ে ধারাবাহিক সিরিজটির মানোন্নয়নে সহায়তা করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে আমাকে বিতর্কেও জড়াতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, সে সমস্ত বিতর্কের ফলে যে সমস্ত নতুন নতুন তথ্যের সমন্বয় আমার বইয়ে ঘটেছে তার জন্যও সংশ্লিষ্ট পাঠক এবং ব্লগারদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মুক্তমনা এবং সচলায়তনে প্রবন্ধটি প্রকাশের আগে ইন্টারনেটে সমকামিতার উপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো গঠনমূলক আলোচনাসমৃদ্ধ রসদ বাংলায় ছিল না। বহু পাঠক আমাকে ই-মেইল করে জানিয়েছেন যে, সিরিজটি তাদের সমকামিতা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা আমূল বদলে দিতে সাহায্য করেছে। লেখক হিসেবে নিঃসন্দেহে এটি আমার এক বিরাট প্রাপ্তি। ২০০৭ সালে সচলায়তন ব্লগে পাঠকদের ভোটে এই সিরিজটি অন্যতম বর্ষসেরা লেখা হিসেবে তালিকায় স্থান পেয়েছিল। এছাড়া আমেরিকার সিলিকন ভ্যালি থেকে প্রকাশিত মাসিক পড়শী পত্রিকায় এই সিরিজের কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল 'সমকামিতা কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ?' শিরোনামে। মুক্তমনার অন্যতম সুহৃৎ কানাডার অটোয়ায় বসবাসরত কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের এমিরিটাস অধ্যাপক এবং সুলেখক ড. মীজান রহমান আমার পাণ্ডুলিপিটি আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন এবং সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। তাঁর অত্যন্ত তথ্যবহুল মতামত 'বিকৃতি না প্রকৃতি' শিরোনামের বইয়ের শেষে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডিরত স্নিগ্ধা আলী নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে একটি ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন। স্নিগ্ধার লেখাটিও তাঁর অনুমতি নিয়ে গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ফ্লোরিডা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইরতিশাদ আহমদ পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন, যা পাণ্ডুলিপিটির মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সুইডেন নিবাসী মুক্তমনা সদস্য এবং মানবাধিকারকর্মী মাহবুব সাঈদ সমকামিতার উপর বেশ কিছু কেস স্টাডি সংগ্রহ করে এই বইয়ের জন্য দিয়েছেন। বইটির শেষ পর্যায়ে এসে আলী ইশতিয়াকের সাহায্য এবং সহযোগিতা আমাকে দারুণভাবে উপকৃত করেছে। এদের সকলের কাছে আমি ঋণী।

আমার জীবনসঙ্গিনী বন্যা (যে নিজেও একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক) তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও পাণ্ডুলিপির প্রতিটি অধ্যায় পড়ে তার সুচিন্তিত মতামত দিয়েছে। যেখানে যেখানে পছন্দ হয়নি সেসমস্ত জায়গায় স্কুল শিক্ষিকাদের মতোই লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে সংশোধনে বাধ্য করেছে। তার মতামত আমার পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে - তা বলাই বাহুল্য। প্রুফ রীডার হিসেবে অঞ্জন আচার্য্যের অবদান সত্যই আমাকে বিস্মিত করেছে। জেন্ডার বিষয়ক তার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আমার পান্ডুলিপির শুধু শ্রীবৃদ্ধিই করেনি, আমার নিজের মানসজগৎকেও ঋদ্ধ করেছে পুরোমাত্রায়। সবশেষে শুদ্ধস্বরের আহমেদুর রশীদের প্রেরণা এবং তাগাদা ছাড়া এ বই আলোর মুখ দেখতো না কখনোই। কাজেই এই বই পাঠকদের ভালো লাগলে সেই কৃতিত্বের সিংহভাগই বাংলাদেশের এই তরুণ এবং উদ্যমী প্রকাশকের প্রাপ্য।

আমি মনে করি আমার এ বইটি বাংলাদেশে বিজ্ঞানমনস্ক উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে আর এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রথম অধ্যায়

প্রকৃতি ও সমকামিতা

রহস্যময় আমাদের এই প্রকৃতি আর প্রকৃতির অংশ সুবিশাল জীবজগৎ, আর আরো রহস্যময় বোধ হয় আমাদের চারপাশের মানুষগুলো। অন্য প্রাণীদের মতোই দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় পথ পাড়ি দিতে গিয়ে টিকে থাকার সংগ্রামে মানুষকে অবিরতভাবে যুদ্ধ করে যেতে হয়েছে –খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান কিংবা নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু এগুলোর পাশাপাশি মানুষ প্রকৃতিজগতের অন্যান্য প্রানীদের মতোই বিবর্তিত হয়েছে আরো একটি জৈবিক তাড়নায়, সেটি হলো যৌনতা। সত্যি বলতে কি বিবর্তনের মূল চালিকা শক্তির কথা ভাবলে দুটো জিনিস আমাদের চোখের সামনে প্রথমেই উঠে আসে – প্রজননের মাধ্যমে বংশবিস্তার এবং টিকে থাকা। তাই, যৌনতা নিঃসন্দেহে প্রকৃতির এক বিশেষ শক্তি। শুধু প্রকৃতি কেন, আমাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে যৌনতা। যৌনতাকে আশ্রয় করে সারা দুনিয়ার কবি-সাহিত্যিকেরা সাহিত্য রচনা করেছেন প্রতিটি যুগেই। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, যৌনতার কারণে পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রক্তপাতও কম হয়নি। তার উল্লেখ পাওয়া যায় সাহিত্যে, ইতিহাসে, আর শিল্পীর ভাস্কর্যে। পশ্চিমা বিশ্বে হোমারের সেই প্রাচীন সাহিত্য *ইলিয়াড* শুরুই হয়েছিল একটি যুদ্ধকে কেন্দ্র করে, আর সেই যুদ্ধ আবার হয়েছিল একটি নারীকে অপহরণের কারণে – সেই হেলেন; হেলেন অব ট্রয়। আমাদের সংস্কৃতিতেও প্রাচীন রামায়নের কাহিনী আমরা জানি – রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়েছিল সীতাকে অপহরণের জন্য। প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরের ভাস্কর্যে অজস্র মৈথুনরত মূর্তির আধিক্য প্রাচীন ভারতে যৌনতার প্রতীকী শক্তিকে স্পষ্ট করে তুলে। আপনি যদি কখনো ভারতের পুরী গিয়ে থাকেন,

তাহলে সেখানে দেখবেন – পুরীর মন্দিরের খুব উঁচুতে – কোনার্ক, ভুবনেশ্বর, খাজুরাহো প্রভৃতি মন্দিরের সর্বত্রই আছে যৌনক্রিয়ারত নারী-পুরুষ আর পশুর মুর্তি। আবার সেই সব মূর্তির পাশে লতা পাতা ফল ফুল ত্রিভুজ দিয়ে নির্মিত হয়েছে অসংখ্য যৌনতার প্রতীক। ইন্দোনেশিয়ার সেলিবিস দ্বীপের পুরনো মন্দিরের চারপাশে পাওয়া যায় স্তন, স্ত্রী-অঙ্গ এবং নগ্ন পুরুষদেহের পুরুষাঙ্গের অসংখ্য মূর্তি। শুধু প্রাচীন মন্দির নয়, যৌনতার প্রতীক অত্যন্ত প্রকট আকারে ধরা আছে বহু আধুনিক মন্দিরেও – গৌরিপট্ট এবং শিবলিঙ্গে। পুরীর মতো ঠিক একইভাবে আপনি যদি প্যারিস রোম কিংবা ভ্যাটিকানসিটি[4] ভ্রমণ করেন, দেখবেন রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য যৌন আবেদনময় আবেগঘন নগ্ন নারী-পুরুষের মূর্তি। নগ্নতা আর যৌনতা গায়ে গা ঠেকিয়ে আছে মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিডে, রডিনের চুম্বনে, ভেনাসে কিংবা পিকাসোর বহু ছবিতে। যৌনতা আছে বাৎস্যায়নের কামসূত্রে, যৌনতা আছে কালীদাসের মেঘদূতে কিংবা কুমারসম্ভবম-কাব্যে। যৌনতা আছে হাল আমলের হুমায়ুন আজাদ, ইমদাদুল হক মিলন, শোভা দে কিংবা তসলিমা নাসরিনের লেখায় । যৌনতা কোথায় নেই? বার্নাড শ সত্যই বলেছেন – 'যৌনতা সব জায়গাতেই কম বেশি পাওয়া যায় – কেবল টেলিফোন ডিরেক্টরি ছাড়া'। সত্যি বলতে কি, যতই আড়াল রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, যৌনতাও আসলে মানুষের প্রধান চাহিদাগুলোরই একটি। শুধু চাহিদা বলে থেমে গেল ভুল হবে – যৌন প্রবৃত্তি হলো সৃষ্টিশীলতা, চিন্তন ও মননের এক অন্যভূবন। এখানে নানা স্রোতের খেলা প্রতিনিয়তই চলে। চলে নানা টানাপোড়েন। কিন্তু চাহিদা কিংবা সৃষ্টিশীলতা যেমন

---

[4] ভ্যাটিকান সিটির মূর্তিগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানকার বহু মূর্তির যৌনাঙ্গে কৃত্রিম পাতার আস্তরণ (fig leaves) পড়িয়ে রাখা আছে। মূর্তির রঙের সাথে পাতার রঙের বৈসাদৃশ্য উৎকটভাবে লক্ষনীয়। কথিত আছে, পোপ পায়াস ৯ মাইকেল এঞ্জেলোসহ অন্যান্য শিল্পীদের শিল্পকর্মের মধ্যকার অবারিত নগ্নতা দেখে অতিশয় ভীত হন, এবং ঈশ্বর বিশ্বাসীদের এই ভয়াবহ নগ্নতার হাত থেকে রক্ষা করতে তার অনুচরদের সাথে নিয়ে হাতুরী শাবল সহযোগে ভ্যাটিকানে অবস্থিত মূর্তিগুলোর লিঙ্গ ধবংস করেন। তারপর ওগুলোতে পাতার আস্তরণ লাগিয়ে দেন যাতে শিল্পকর্মগুলোর সৌন্দর্য 'অটুট' থাকে। এই ঘটনা ইতিহাসে Great Castration নামে পরিচিত। ঔপন্যাসিক ড্যান ব্রাউন তার 'এঞ্জেলস এন্ড ডিমনস' বইয়ে তা উল্লেখ করেছেন।

আছে, যৌনতার অবদমনও খুব উৎকটভাবেই দৃশ্যমান, অন্তত আমাদের সমাজে। যৌনতার এমনি অবদমিত এবং অচ্ছুৎ এক অধ্যায়ের নাম হচ্ছে সমকামিতা।

অনেকেই সমকামিতা নিয়ে বেজায় বিব্রত থাকেন। নাম শুনলেই আঁতকে উঠেন। কাঠমোল্লারা তো গালি দিয়ে খালাস- সমকামিরা হচ্ছে খচ্চর স্বভাবের, কুৎসিত রুচিপূর্ণ, মানসিক বিকারগ্রস্ত। এমনকি প্রগতিশীলদের মধ্যেও রয়েছে নানা রকম ওজর আপত্তি। যারা শিক্ষিত, 'আধুনিক' শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, গে, লেসবিয়ন ইত্যকার তথাকথিত 'পশ্চিমা' শব্দের সাথে কমবেশি পরিচিত হয়েছেন, তারাও খুব কমই ব্যাপারটিকে মন থেকে 'স্বাভাবিক' বলে মেনে নিতে পারেন। তাদের অনেকেই এখনো ব্যাপারটিকে 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ' মনে করেন, আর নয়ত ভাবেন – পুরো ব্যাপারটি উৎকট ধরনের ব্যাতিক্রমধর্মী কিছু, এ নিয়ে 'ভদ্র সমাজে' যত কম আলোচনা করা যায় ততই মঙ্গল। উপরে উপরে না বললেও ভিতরে ভিতরে ঠিকই মনে করেন সমকামীরা তো হচ্ছে গা ঘিন ঘিনে বিষ্ঠাকৃমি জাতীয় এঁদো জীব। মরে যাওয়াই মনে হয় এদের জন্য ভালো। সমাজ সভ্যতা রক্ষা পায় তাহলে। কিন্তু সত্যই কি 'সমকামিতা' এরকম ঘৃণ্য কোনো কিছু?

সমকামিতা কি?

বাংলায় 'সমকামিতা' শব্দটি এসেছে বিশেষণ পদ –'সমকামী' থেকে। আবার 'সমকামী' শব্দের উৎস নিহিত রয়েছে সংস্কৃত 'সমকামিন' শব্দটির মধ্যে। যে ব্যক্তি সমলৈঙ্গিক ব্যক্তির প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে তাকে 'সমকামিন' বলা হতো। সম এবং কাম শব্দের সাথে ইন প্রত্যয় যোগ করে 'সমকামিন' (সম + কাম + ইন্) শব্দটি সৃষ্টি করা হয়েছে। সমকামিতা নামের বাংলা শব্দটির ব্যাবহারও খুব একটা প্রাচীন নয়। প্রাচীনকালে সমকামীদের বোঝাতে 'ঔপরিস্টক' শব্দটি ব্যবহৃত হতো। যেমন, বাৎস্যায়নের কামসূত্রের ষষ্ঠ অধিকরণের নবম অধ্যায়ে

সমকামীকে চিহ্নিত করতে 'ঔপরিস্টক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে এ শব্দের বহুল ব্যবহার আর লক্ষ্য করা যায়নি, বরং 'সমকাম' এবং 'সমকামী' শব্দগুলোই কালের পরিক্রমায় বাংলাভাষায় স্থান করে নিয়েছে। কেউ কেউ আজ সমকামিতাকে আরেকটু 'শালীন' রূপ দিতে 'সমপ্রেম' শব্দটির প্রচলন ঘটাতে চান [5]।

সমকামিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'হোমোসেক্সুয়ালিটি' তৈরি হয়েছে গ্রীক 'হোমো' এবং ল্যাটিন 'সেক্সাস' শব্দের সমন্বয়ে। গ্রীক ভাষায় 'হোমো' বলতে বোঝায় 'সমধর্মী' বা 'একই ধরনের'। আর সেক্সাস শব্দটির অর্থ হচ্ছে যৌনতা। কাজেই একই ধরনের অর্থাৎ, সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার (যৌন) প্রবৃত্তিকে বলে হোমোসেক্সুয়ালিটি। আর যারা সমলিঙ্গের প্রতি এ ধরনের আকর্ষণ বোধ করেন, তাদের বলা হয় হোমোসেক্সুয়াল। 'হোমোসেক্সুয়াল' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কার্ল মারিয়া কার্টবেরি ১৮৬৯ সালে। তিনি একটি ছোট পুস্তিকায় (Pamphlet) প্রুসিয়ার সমকামীদের প্রতি নিবর্তনমূলক আইনের সমালোচনা করেন। পরবর্তীতে এই শব্দটিকে তাদের বইয়ে ব্যবহার করেন জীববিজ্ঞানী গুস্তভ জেগার এবং রিচার্ড ফ্রেইহার ভন ক্রাফট ইবিং ১৮৮০সালে ইবিং-এর *Psychopathia Sexualis* বইটি সাধারণ মানুষ এবং চিকিৎসকদের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠে অচীরেই এবং সেই সাথে 'হোমোসেক্সুয়াল' এবং 'হেটারোসেক্সুয়াল' শব্দদুটিও যৌনপ্রবৃত্তি বোঝাতে ইংরেজি পরিভাষায় স্থান করে নেয়।

আমি এই বইয়ে বৈজ্ঞানিক (মূলত জীববিজ্ঞান ও জেনেটিক্সের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে) এবং আধুনিক সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণা থেকে আলোচনা করে একটি উপসংহারে পৌছুতে চেষ্টা করব। বাংলা সহ পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্যগুলোতে

[5] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, *সমপ্রেম,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।

সমকামিতার উল্লেখ এবং পরিশেষে বিভিন্ন খ্যাতনামা সমকামীদের জীবন নিয়েও খানিকটা গভীরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। তবে সেগুলো আসবে ধীরে ধীরে। প্রথম দিকের পর্বগুলো মূলত বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আমি এই পর্বগুলোতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখার চেষ্টা করব সমকামিতা ব্যাপারটি সত্যই 'অস্বাভাবিক' বা 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' কোনো কিছু কিনা। আমার বিশ্লেষণের ভিত্তি হবে এ মুহূর্তে বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের কাছ থেকে পাওয়া সর্বাধুনিক তথ্য।

আমি শুরু করছি ভুলভাবে ব্যবহৃত কিছু মন্তব্য দিয়ে, যা সমকামিতার বিরুদ্ধে প্রায়শই ব্যবহার করা হয় :

"সমকামিতা প্রাকৃতিক কোনোভাবেই হতে পারে না মূলত (নারী-পুরুষে) কামটাই প্রাকৃতিক"

কিংবা অনেকে এভাবেও বলেন –

"নারী আর পুরুষের কামই একমাত্র প্রাকৃতিক যা পৃথিবীর সকল পশু করে। যার মূল লক্ষ্য হলো বংশ বৃদ্ধি"

আমি ইন্টারনেটের বিভিন্ন ফোরাম এবং ব্লগসাইটগুলোতে স্পর্শকাতর এ বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে এ ধরনের অসংখ্য মন্তব্যের সম্মুখীন হয়েছি। উক্তিগুলো স্রেফ উদাহরণ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অনেকেই সমকামিতাকে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' বা 'অস্বাভাবিক' হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য উপরোক্ত ধরনের যুক্তির আশ্রয় নেন। আমি এই উক্তির পেছনের যুক্তিগুলো নিয়েই মূলত এখানে আলোচনা করব।

আসলে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ', 'অস্বাভাবিক', 'প্রাকৃতিক নয়'–এই ধরনের শব্দচয়ন করার আগে এবং ঢালাওভাবে তা প্রয়োগ করার আগে কিন্তু খোলা মনে পুরো বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে। এই বাংলাতেই এমন একটা সময় ছিল যখন বাল্যবিবাহ করা ছিল 'স্বাভাবিক' (রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমসহ অনেকেই বাল্যবিবাহ

করেছিলেন) আর মেয়েদের বাইরে কাজ করা ছিল 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ'। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মেয়েদের বাইরে কাজ করার বিপক্ষে একটা সময় যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন এই বলে [6] –

'যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হতো, তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাতো। যদি বল, পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এই দুর্বল অবস্থা হয়েছে, সে কোনো কাজেরই কথা নয়।'

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের যুক্তি এখন মানতে গেলে কপালে টিপ দিয়ে, হাতে দু-গাছি সোনার বালা পরে গৃহকোণ উজ্জ্বল করে রাখা রাবীন্দ্রিক নারীরাই সত্যিকারের 'প্রাকৃতিক'। আর শত সহস্র আমিনা, রহিমারা যারা প্রখর রোদ্দুরে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজে ইট ভেঙ্গে, ধান ভেনে সংসার চালাচ্ছে, কিংবা পোশাকশিল্পে নিয়োজিত হয়ে পুরুষদের পাশাপাশি ঘামে শ্রমে নিজেদের উজার করে চলেছে – তারা সবাই আসলে 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ' কুকর্মে নিয়োজিত – কারণ, 'প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না'। বাংলাদেশের অখ্যাত আমিনা, রহিমাদের কথা বাদ দেই, নাসার মহাজাগতিক রকেট উৎক্ষেপন থেকে শুরু করে মাইনিং ফিল্ড পর্যন্ত এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে মেয়েরা পুরুষদের পাশাপাশি আজ কাজ করছেন না। তাহলে? তাহলে আর কিছুই নয়। নিজের যুক্তিকে তালগাছে তোলার ক্ষেত্রে 'প্রকৃতি' অনেকের কাছেই খুব সহজ একটি মাধ্যম । তাই প্রকৃতির দোহাই পাড়তে আমরা 'শিক্ষিত জনেরা' বড্ড ভালোবাসি। প্রকৃতির দোহাই পেড়ে আমরা মেয়েদের গৃহবন্দি রাখি, জাতিভেদ বা বর্ণবাদের পক্ষে সাফাই গাই, অর্থনৈতিক সাম্যের বিরোধিতা করি, তেমনি সময় সময় সমকামী, উভকামিদের বানাই অচ্ছুৎ। কিন্তু যারা যুক্তি নিয়ে একটু আধটু পড়াশোনা করেছেন তারা জানেন যে, প্রকৃতির দোহাই পাড়লেই তা

---

[6] রমাবাই এর বক্তৃতা উপলক্ষে, জৈষ্ঠ, ১২৯৬, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। এছাড়া মুক্তমনায় রাখা 'Tagore without Illusion' পাতাটিও দেখা যেতে পারে।

যুক্তিসিদ্ধ হয় না। বরং প্রকৃতির কাঁধে বন্দুক রেখে মাছি মারার অপচেষ্টা জন্ম দেয় এক ধরনের কুযুক্তি বা হেত্বাভাসের (logical fallacy)। ইংরেজিতে এই হেত্বাভাসের পুথিগত নাম হলো - 'ফ্যালাসি অব ন্যাচারাল ল' বা 'অ্যাপিল টু নেচার' [7]। এমনি কিছু 'অ্যাপিল টু নেচার' হেত্বাভাসের উদাহরণ দেখা যাক –

১। মিস্টার কলিন্সের কথাকে এত পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই। কলিন্স ব্যাটা তো কালো। কালোদের বুদ্ধি সুদ্ধি একটু কমই হয়। কয়টা কালোকে দেখেছ বুদ্ধি সুদ্ধি নিয়ে কথা বলতে? প্রকৃতি তাদের পাঁঠার মতো গায়ে গতরে যেটুকু বাড়িয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে সেই অনুপাতে কম। কাজেই তাদের জন্মই হয়েছে শুধু কায়িক শ্রমের জন্য, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার জন্য নয়।

২। মারামারি, কাটাকাটি হানাহানি, অসাম্য প্রকৃতিতেই আছে ঢের। এগুলো জীবজগতের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কাজেই আমাদের সমাজে যে অসাম্য আছে, মানুষের উপর মানুষের যে শোষণ চলে তা খারাপ কিছু নয়, বরং 'কম্পলিটলি ন্যাচারাল'।

৩। প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হতো, তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাতো।

৪। সমকামিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রকৃতিতে তুমি কয়টা হোমোসেক্সুয়ালিটির উদাহরণ দেখেছ? এমনি উদাহরণ দেওয়া যায় বহু।

উপরের উদাহরণগুলো দেখলে বোঝা যায়, ওতে যত না যুক্তির ছোঁয়া আছে, তার চেয়ে ঢের বেশি লক্ষনীয় 'প্রকৃতি' নামক মহাস্ত্রকে পুঁজি করে পাহাড় ঠেলার প্রবণতা। কাজেই বোঝা যাচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের স্বভাবজাত অ্যাপিল টু নেচার-এর শিকার হচ্ছে সমকামীরা। সমকামীদের প্রতি সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং সাংগঠিকভাবে ছড়িয়ে

---

[7] হেত্বাভাস নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য http://www.infidels.org/library/modern/mathew/logic.html দ্রষ্টব্য

দেওয়া হয়েছে ঘৃণা। সমকামিতাকে একটা সময় দেখা হয়েছে মনোবিকার, মনোবৈকল্য বা বিকৃতি হিসেবে। সমকামীদের অচ্ছুৎ বানিয়ে এদের সংস্রব থেকে দূরে থাকার প্রবণতা অনেক দেশেই আছে। শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার তো আছেই, কখনো এদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে আত্মহননের পথে। কখনো বা স্রেফ সমকামী হবার কারণে করা হয়েছে হত্যা। আর এগুলোতে পুরোমাত্রায় ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে ধর্মীয় সংগঠন এবং রক্ষণশীল সমাজ। সমকামীদের প্রতি হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণে ইংরেজিতে সৃষ্টি হয়েছে নতুন একটি শব্দ–হোমোফোবিয়া (Homophobia)। মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি নিতান্ত অন্যায়। তবে মানবাধিকার এবং সমানাধিকারের প্রেক্ষাপটে যাবার সমকামিতা বলতে আসলে কি বোঝায় তা আমাদের সকলের ভালো করে জানা দরকার।

আমরা জেনেছি সমকামিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হোমোসেক্সুয়ালিটি তৈরি হয়েছে গ্রীক 'হোমো' এবং ল্যাটিন 'সেক্সাস' শব্দের সমন্বয়ে। সমকামী মানুষেরা সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে বলে তাদের (যৌন)প্রবৃত্তিকে বলে হোমোসেক্সুয়ালিটি। আর যারা সমলিঙ্গের প্রতি এ ধরনের আকর্ষণ বোধ করেন, তাদের বলা হয় হোমোসেক্সুয়াল। বর্তমানে হোমোসেক্সুয়াল শব্দটি একাডেমিয়ায় কিংবা চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হলেও সাড়া বিশ্ব জুড়ে সমকামীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 'গে' এবং লেসবিয়ান' শব্দদুটি অধিক হারে মিডিয়ায় ব্যবহৃত হয়। গে এবং লেসবিয়ান শব্দদুটিরও ইতিহাস আছে। গালভরা এবং বহুল প্রচলিত 'হোমোসেক্সুয়াল' শব্দের বদলে পশ্চিমে 'গে' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ১৯২০ সালে। তবে সে সময় এটির ব্যবহার একেবারেই সমকামীদের নিজস্ব গোত্রভুক্ত ছিল। প্রিন্টেড মিডিয়ায় শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ১৯৪৭ সালে। লিসা বেন নামে এক হলিউড সেক্রেটারি 'Vice Versa: America's Gayest Magazine' নামের একটি পত্রিকা প্রকাশের সময় সমকামিতার প্রতিশব্দ হিসেবে 'গে' শব্দটি ব্যবহার করেন, যদিও সে সময় 'গে' শব্দটি 'হাসি খুশি' অর্থেই ব্যবহৃত হতো। গে

শব্দটি যথার্থ অর্থ নিয়ে আসলে ব্যাপকতা পায় ১৯৬০ সালের দিকে যখন সমকামীদের অধিকার রক্ষায় সচেতন লোকজন 'Gay is good' জাতীয় বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড বহন করতে থাকে। তারপর থেকেই 'গে' শব্দটি 'হোমোসেক্সুয়াল' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে দ্রুত ইংরেজি পরিভাষায় স্থান করে নেয়। তবে সমকামিতার সাথে যুক্ত সবাই যে সার্বিকভাবে 'সমকামী'দের বোঝাতে 'গে' শব্দটি ব্যবহার করেন তা অবশ্য নয়। যেহেতু পরিভাষায় 'গে' শব্দটি অনেকক্ষেত্রেই পুরুষবাচক শব্দ হিসেবে গৃহীত হয়, নারী সমকামীদের অনেকেই তাদের নিজেদের যৌনপ্রবৃত্তিকে তুলে ধরতে 'লেসবিয়ান' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। এই শব্দটি এসেছে গ্রীস দেশের 'লেসবো' নামের দ্বীপমালা থেকে। কথিত আছে, খ্রিষ্টপূর্ব ছয় শতকে স্যাপো নামে সেখানকার এক শিক্ষিকা মেয়েদের মধ্যকার প্রেমময় জীবন নিয়ে কাব্য রচনা করে 'কবিতা উৎসব' পালন করেছিলেন। প্রথম দিকে লেসবিয়ান বলতে 'লেসবো দ্বীপের অধিবাসী' বোঝালেও, পরবর্তীতে নারীর সমপ্রেমের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তবে এ ব্যাপারে একটি জিনিস পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। যদিও সমকামিতা নির্দেশক শব্দগুলো পরিভাষায় স্থান পেয়েছে খুব বেশি দিনে আগে নয়, কিন্তু যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে সমকামিতা মানব সভ্যতায় সব সময়ই ছিল, প্রাচীনকাল থেকেই। বার্ন ফোন তাঁর 'হোমোফোবিয়া' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেন [8],

> 'Though the term is of recent invention, the behavior it describes has always been part of sexual activity. That human beings have desired, loved, and had sex with members of their own sex over time is abundantly demonstrated in visual art and medical, philosophical and literary texts of all historical periods'.

তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে,কেন তাহলে সমকামিতা নির্দেশক শব্দ আগে পরিভাষায় ছিল না? এর কারণ হচ্ছে,অন্যান্য যৌনপ্রবৃত্তির মতো সমকামিতাও অতি

[8] Byrne Fone, Homophobia: A History, Picador , November 3, 2001

স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবেই পৃথিবীর বহু জায়গায় স্বীকৃত ছিল। কেউ আলাদাভাবে সেটাকে 'শ্রেণীকরণ' করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কোনো কোনো সংস্কৃতিতে সমকামিতা ব্যাপারটির মূল এতোটাই গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে,এটি নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করারও কারো অবকাশ ছিল না[9]। ফরাসি ঐতিহাসিক ফুকোর মতে[10],'সেক্সুয়ালিটি' ব্যাপারটাই আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের আবিস্কার। আধুনিক সমকামীদের প্রবৃত্তিকে আলাদাভাবে শ্রেণীকরণ করার আগে তাদের আলাদা নামে ডাকার কোনো প্রয়াস কারো মধ্যে দেখা যায়নি। সে সময় প্রবৃত্তি হিসেবে সমকামিতা ছিল, কিন্তু আলাদাভাবে 'সমকামী'বলে কিছু ছিল না। অনেক বিশ্লেষকই মনে করেন,সমকামীদের নিয়ে আলাদা শ্রেণীকরণ না থাকায় তাদের উপর কোনো শারীরিক বা মানসিক নিবর্তন বা নিপীড়নও সেভাবে ছিল না।

সমকামিতা কি কেবল পশ্চিমা বিশ্বের বিকৃতি?

অনেকেই সমকামিতাকে ভুলভাবে কেবল পশ্চিমা বেলাল্লাপনা বলে মনে করেন। তাদের অনেকে ভাবেন, সমকামিতা হচ্ছে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের বিকৃতি। এটা ঠিক নয়। সমকামিতার ইতিহাস আসলে অনেক পুরনো। প্রাচীন গ্রীসের ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণে সমকামিতার স্পৃহার কথা জানা যায়। ধর্মীয়ভাবে সমপ্রেম এখানে স্বীকৃত ছিল। 'ভেনাস' ছিলেন তাদের কামনার দেবী। এই দেবীই আবার সমকামিদের উপাস্য ছিলেন। এছাড়া 'প্রিয়াপ্রাস' নামেও আরেক দেবীকেও সমকামিরা আরাধনা করতো বলে শোনা যায়। তাহিতির বিভিন্ন জায়গায় সমকামে আসক্ত ব্যক্তিদের আরাধ্য দেবতার মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। আনাতেলিয়া, গ্রীস এবং রোমার বিভিন্ন মন্দিরে 'সিবিলি' এবং 'ডাইওনিসস'-এর পুজো ব্যাপকভাবে শুরু

---

[9] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press; 1 edition.

[10] Michel Foucault, The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction, Vintage, April 14, 1990

হয়েছিল। সিবিলির পুরোহিতেরা গাল্লি নামে পরিচিত ছিলেন। এরা নারীবেশ ধারণ করতেন। মাথায় নারীর মতো দীর্ঘ কেশ রাখতে পছন্দ করতেন। এরা সমকামী ছিলেন বলেও অনুমিত হয়। পরে এশিয়া মাইনর থেকে সিবিলি পুজো পারস্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এ সমস্ত প্রথা পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়।

পারস্য সাহিত্যে অনেক কবি তাদের প্রেমিকাকে পুরুষ নামে ডাকতেন –তবে এটি সম্ভবতঃ অঞ্চল ভিত্তিক কোনো প্রথা। আরব সমাজে বয়স্ক পুরুষ এবং বালকের মধ্যে যৌন সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য তো বটেই মধ্যযুগে (ইসলামের বিস্তৃতির সময়) বহুল প্রচলিতও ছিল। সাকী বলতে এখন আমাদের চোখের সামনে সুরাপাত্র হাতে যে মোহনীয় লাস্যময়ী নারীর ছবি ভেসে উঠে, প্রাচীন আরবে সাকী বলতে তা বোঝানো হতো না। গবেষকরা বলেন, সাকী বলতে আরবে নারীর পাশাপাশি সুদর্শন কিশোরও বোঝানো হতো। তারা শুধু পানপাত্রে দ্রাক্ষারসই পরিবেশন করতো না, পাশাপাশি অন্যান্য পার্থিব সেবাও পরিবেশন করতো। এর উল্লেখ পাওয়া যায় আরবের বহু সমকামী কবিদের রচনায়[11]। এমনকি কোরানের কিছু আয়াতে (৫২:২৪, ৫৬:১৭, ৭৬:১৯) বেহেস্তে উদ্ভিন্নযৌবনা হুরীর পাশাপাশি 'মুক্তা-সদৃশ' কিশোর বালকের সেবা পাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আসলে সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই সমকামিতা সবসময়ই মানব সমাজে ছিল। গ্রীক, রোমান, চৈনিক, পাপুয়া নিউ গিনি অথবা উত্তর আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতায় সমকামিতার অজস্র উদাহরণ আছে।

---

[11] প্রসঙ্গত আরবীয় কবি আবু নুয়াসের (৭৫৬ - ৮১৪) একটি কবিতা উল্লেখ করা যেতে পারে –

O the joy of sodomy!/ So now be sodomites, you Arabs./ Turn not away from it—/ therein is wondrous pleasure./ Take some coy lad with kiss-curls/ twisting on his temple/ and ride as he stands like some gazelle/ standing to her mate./ A lad whom all can see girt with sword/ and belt not like your whore who has/ to go veiled./ Make for smooth-faced /boys and do your/ very best to mount them, for women are/ the mounts of the devils.

সমকামিতা ছিল অ্যাজটেক ও মায়া সভ্যতায়। হিন্দু পুরাণেও উল্লেখ পাওয়া যায় পুরুষীনী অথবা তৃতীয় প্রকৃতির। বর্তমানে গুজরাটের সঙ্খলপুরে বহুচোরা মাতার যে মূর্তি আছে তা অনেকটা ‘সিবিলির’ আদলে রচিত। ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্মের একটি বিশেষ শাখা আছে। এরা একসাথে রাধা-কৃষ্ণের ভজনা করে থাকে। এদের অনেকে স্ত্রীবেশ ধারণ করে। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম সাধক গদাধর গোস্বামী নাম নিয়েছিলেন রাধিকা। আবার গোবিন্দ ঘোষ রঙ্গদেবী হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। আসলে মূল কথা হচ্ছে, সমকামিতা, রূপান্তরকামিতা, উভকামিতা– এগুলো কোনোটাই আধুনিক পশ্চিমাদের আবিষ্কার কিংবা বিকৃতি নয়, বরং এটি প্রাচীন সভ্যতা থেকে আমাদের সংস্কৃতির মধ্যেই ছিল; পত্র-পত্রিকা, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ইন্টারনেটের কারণে ব্যাপারগুলো সামনে চলে এসেছে ।

এখন কথা হচ্ছে সমকামিতা কি জন্মগত নাকি আচরণগত? এটি বুঝতে হলে আমাদের যৌনপ্রবৃত্তিকে বুঝতে হবে। আজকের দিনের মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যৌন-প্রবৃত্তির ক্যানভাস আসলে সুবিশাল। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ (বিষমকামিতা) যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনিভাবেই দেখা যায় সম লিঙ্গের মানুষের মধ্যে প্রেম এবং যৌনাকর্ষণ। এই দ্বিতীয় ধারার মানুষেরা বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি কোনো যৌন-আকর্ষণ বোধ করে না, বরং নিজ লিঙ্গের মানুষের প্রতি এরা আকর্ষন বোধ করে। এদের যৌনরুচি এবং যৌন আচরণ এগুতে থাকে ভিন্ন ধারায়। ব্যাপারটি অস্বাভাবিক নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের বাইরে অথচ স্বাভাবিক এবং সমান্তরাল ধারায় অবস্থানের কারণে এধরনের যৌনতাকে অনেক সময় সমান্তরাল যৌনতা (parallel sex) নামেও অভিহিত করা হয়। সমান্তরাল যৌনতার ক্ষেত্র কিন্তু খুবই বিস্তৃত। এতে সমকামিতা যেমন আছে তেমনি আছে উভকামিতা, কিংবা দুটোই, এমনকি কখনো রূপান্তরকামিতাও। আমি আমার বক্তব্য মূলত ‘সমকামিতা’ বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব, যদিও অন্যান্য যৌন-প্রবৃত্তিগুলো (যেমন রূপান্তরকামিতা)

ও বিভিন্ন সময় আলোচনায় উঠে আসবে। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা বলেন, সমকামিতা নিঃসন্দেহে যেমন আচরণগত হতে পারে, তেমনি হতে পারে জন্মগত বা প্রবৃত্তিগত। এতে পরস্পরবিরোধিতা নেই। যাদের সমকামী যৌনপ্রবৃত্তি জন্মগত, তাদের যৌন-প্রবৃত্তিকে পরিবর্তন করা যায় না, তা সে থেরাপি দিয়েই হোক, আর ঔষধ দিয়েই হোক। মানুষের মস্তিষ্কে হাইপোথ্যালমাস নামে একটি অঙ্গ রয়েছে, যা মানুষের যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। সিমন লিভের শরীরবৃত্তীয় গবেষণা থেকে জানা গেছে এই হাইপোথ্যালমাসের interstitial nucleus of the anterior hypothalamus, বা সংক্ষেপে INAH3 অংশটি সমকামীদের ক্ষেত্রে আকারে অনেক ভিন্ন হয়[12]। আরেকটি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে ডিন হ্যামারের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে। ডিন হ্যামার তাঁর গবেষণায় আমাদের ক্রোমোজমের যে অংশটি (Xq28) সমকামিতা ত্বরান্বিত করে তা শনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন[13]। এছাড়াও আরো বিভিন্ন গবেষণায় মনস্তাত্ত্বিক নানা অবস্থার সাথে পিটুইটরি, থাইরয়েড, প্যারা-থাইরয়েড, থাইমাস, এড্রিনালসহ বিভিন্ন গ্রন্থির সম্পর্ক আবিস্কৃত হয়। যদিও 'গে জিন' বলে কিছু এখনো আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু বেশ কিছু জৈবিক ফ্যাক্টর সমকামী প্রবণতা তৈরি এবং তরান্বিত করতে পারে (আমি এদের গবেষণা নিয়ে পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করব)। এই ধরনের গবেষণা সঠিক হয়ে থাকলে বলতেই হয় সমকামী মনোবৃত্তি হয়ত অনেকের মাঝেই জন্মগত না জেনেটিক, আরো পরিষ্কার করে বললে, 'বায়োলজিকালি হার্ড-ওয়্যার্ড'। জন্মগত সমকামিরা 'বায়োলজিক্যালি হার্ড-ওয়্যার্ড' হলেও আচরণগত সমকামীরা তা নয়। এরা আসলে বিষমকামী। এরা কোনো ব্যক্তিকে বিষমলিঙ্গের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে তাদের সাথে যৌন-সংসর্গে লিপ্ত হয়। যেমন, জেলখানায় দীর্ঘদিন আটকে থাকা বন্দিরা যৌনসঙ্গীর অভাবে সমলিঙ্গের কয়েদিদের সাথে যৌন সম্পর্ক

---

[12] Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, Scientific American, May 1994.

[13] যদিও সাম্প্রতিক সময়ে এই পরীক্ষার ফলাফল কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

স্থাপন করেত পারে। কিন্তু, জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলেই দেখা যায়, এদের আচরণের পরিবর্তন ঘটে। এই ধরনের যৌন প্রবৃত্তির বাইরেও আছে উভকামিতা, কিংবা আছে উভকামিতার সমকামিতা। আলফ্রেড কিন্সে এই ধরনের বিভিন্ন যৌনতাকে পরিমাপ করার জন্য ‘যৌনতা বিষয়ক স্কেল’ উদ্ভাবন করেন। এই স্কেলের এক প্রান্তে আছে পরিপূর্ণ বিষমকাম, অন্যপ্রান্তে পরিপূর্ণ সমকাম। দুই মেরুর মাঝামাঝি রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়- প্রধানত বিষমকাম, তবে প্রায়ই সমকাম; সমান সমান বিষমকাম এবং সমকাম; প্রধানত সমকাম তবে প্রায়ই বিষম কাম; প্রধানত সমকাম, তবে মাঝে মধ্যে বিষমকাম ইত্যাদি। কিন্সের এ স্কেল[14] নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও এটি অন্তত বোঝা যায় যে, আমাদের যৌন-প্রবৃত্তির ক্যানভাস আসলে খুবই বিস্তৃত, এবং যৌন প্রবৃত্তি একইভাবে সকলের মাঝে ক্রিয়াশীল হয় না।

সমকামিতা প্রবনতা আসলে সমান্তরাল যৌনতারই অংশ

আজকের দিনের মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যৌন-প্রবৃত্তির ক্যানভাস আসলে সুবিশাল। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ (বিষমকামিতা) যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনিভাবেই দেখা যায় সমলিঙ্গের মানুষের মধ্যে প্রেম এবং যৌনাকর্ষণ। এই দ্বিতীয় ধারার মানুষেরা বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি এরা কোনো যৌন-আকর্ষণ বোধ করে না, বরং নিজ লিঙ্গের মানুষের প্রতি এরা আকর্ষন বোধ করে। এদের যৌনরুচি এবং যৌন আচরণ এগুতে থাকে ভিন্ন ধারায় । ব্যাপারটি অস্বাভাবিক নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের বাইরে অথচ স্বাভাবিক এবং সমান্তরাল ধারায় অবস্থানের কারণে এধরনের যৌনতাকে সমান্তরাল যৌনতা (parallel sex) নামেও অভিহিত করা হয়।

[14] কিন্সের স্কেল নিয়ে বিস্তৃতভাবে এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যৌন প্রবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবেই সেক্স বা যৌনতার উদ্ভব নিয়ে কিছু না কিছু বলতে হয়। রিচার্ড ডকিন্সের 'বিবর্তনীয় স্বার্থপর জিন' (selfish gene) তত্ত্ব সঠিক হয়ে থাকলে বলতেই হবে যৌনতার উদ্ভব নিঃসন্দেহে প্রকৃতির একটি মন্দ অভিলাষ[15]। কারণ দেখা গেছে অযৌন জনন (asexual) প্রক্রিয়ায় জিন সঞ্চালনের মাধ্যমে যদি বংশ বিস্তার করা হয় (প্রকৃতিতে এখনো অনেক এককোষী জীব, কিছু পতঙ্গ, কিছু সরিসৃপ এবং কিছু উদ্ভিদ- যেমন ব্ল্যাক বেরি অযৌন জনন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে থাকে) তবে বাহকের পুরো জিনটুকু অবিকৃত অবস্থায় ভবিষ্যত প্রজন্মে সঞ্চালিত করা যায়। কিন্তু সে বাহক যদি যৌন জননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে থাকে, তবে তার জিনের অর্ধেকটুকুমাত্র ভবিষ্যত প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে বংশবিস্তার করলে এটি বাহকের জিনকে ভবিষ্যত প্রজন্মে স্থানান্তরিত করবার সম্ভাবনাকে সরাসরি অর্ধেকে নামিয়ে আনে[16]। এই অপচয়ী প্রক্রিয়ার আসলে কোনো অর্থই হয় না। কারণ, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূল নির্যাসটিই হলো– প্রকৃতি তাদেরই টিকে থাকার ক্ষেত্রে তাদেরকেই বাড়তি সুবিধা দেয় যারা অত্যন্ত ফলপ্রসুভাবে নিজ জিনের বেশি সংখ্যক অনুলিপি ভবিষ্যত প্রজন্মে সঞ্চালিত করতে পারে[17]। সে হিসাবে কিন্তু অযৌন জননধারীরা (আমি এখন থেকে এদের 'অযৌনপ্রজ' হিসেবে উল্লেখ করব) বহু ধাপ এগিয়ে আছে যৌনধারীদের (এদের উল্লেখ করা হবে 'যৌনপ্রজ' নামে) থেকে।

---

[15] Dylan Evans & Howard Selina, *Introducing Evolution*, Icon Books, UK, 2001

[16] এই বইয়ের পরিশিষ্টে 'যৌনতার ব্যয়' নামে একটি গানিতিক মডেল উপস্থাপনা করে যৌনপ্রজ এবং অযৌনপ্রজদের মধ্যকার প্রক্রিয়ার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

[17] Joann C. Gutin, *Why Bother? Sex seems like an unnecessary complicated means of reproducing. So how did it ever started? And why did it catch on?* Discover, June, 1992.

রয়, সিলো আর ট্যাংগো - তিনে মিলে ছিল এক পেঙ্গুইন পরিবার

ম্যানহাটনের সেন্ট্রাল পার্কের চিড়িয়াখানা। সেখানে এক পেঙ্গুইন দম্পতির বাস। একেবারে প্রেমিক দম্পতি যাকে বলে। ৬ বছর ধরে তারা একসাথে আছে। তাদের আলাদা করাই মুশকিল। এরা একে অন্যের গলা জড়িয়ে ধরে রাখে। এক সাথে গলা ছেড়ে ডেকে উঠে। আর শারীরিক যৌনসম্পর্ক তো আছেই। একটি দিকেই কেবল ব্যতিক্রম- এই পেঙ্গুইন দম্পতির দুজনেই পুরুষ। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারেননি। পরে যখন বুঝলেন তখন তো তাদের আক্কেল গুরুম। কার ভুলে প্রথম থেকেই এই পুরুষ পেঙ্গুইন দুটোকে একসাথে রাখা হয়েছিল কে জানে। তবে এই 'অস্বাভাবিক' সম্পর্ক তো আর বেশি দিন চলতে দেয়া যায় না। কাজেই চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, তাদের খাঁচায় কিছু নারী পেঙ্গুইন ছেড়ে দেয়া

হবে। তারা ভাবলেন, নারী সঙ্গ পেয়ে নিশ্চয় তারা এই 'বেলাল্লাপনা' ত্যাগ করবে। কিন্তু রয় আর সিলো খাচাঁর নতুন মেয়েদের দিকে ভালো মতো তাকিয়ে দেখলোই না, সম্পর্ক তৈরি করা তো দূরের কথা! তারা নিজেদের প্রেমে নিজেরাই মশগুল। কর্তৃপক্ষই আর কি বা করবেন। তাই সেইভাবেই রয়ে গেল তারা।

এর মধ্য আরেক ঘটনা ঘটলো। রয় সিলো দম্পতি[18] তাদের বাসার পাশে পড়ে থাকা একটি বড় পাথরের টুকরো তাদের বাসায় নিয়ে এসে নিয়ম করে তা দিতে শুরু করলো। এটা দেখে বোধ হয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের মনে একটু দয়া হলো। তারা আরেক 'হেটারোসেক্সুয়াল' পেঙ্গুইন দম্পতির কাছ থেকে একটি ডিম ধার করে নিয়ে এসে রয় আর সিলোর বাসায় রেখে দিলো। সেই ডিমে মাস খানেক ধরে নিয়ম করে তা দিয়ে রয় আর সিলো বাচ্চা ফুটালো। জন্ম হলো এক ফুটফুটে মেয়ে পেঙ্গুইন শিশুর – ট্যাংগো। তারা সেই বাচ্চাকে নিজদের বাচ্চা হিসেবেই আদর যত্ন করে বড় করে তুললো। বড় হয়ে ট্যাংগো নিজেও সমকামী পেঙ্গুইন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'তানুজি' আরেক নারী পেঙ্গুইনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।

রয়-সিলো-ট্যাংগোর এই ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা নিয়ে ২০০৫ সালে আমেরিকায় প্রথম বাচ্চাদের জন্য একটি বই প্রকাশিত হয় And Tango Makes Three নামে[19]। আমেরিকায় শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে সমকামিতাকে গঠনমূলকভাবে উপস্থাপনার প্রথম দৃষ্টান্ত এটি। কিন্তু আমেরিকার রক্ষণশীল মহল এতে খুশি হননি। তারা বইটিকে 'শিশুদের জন্য ক্ষতিকর' হিসেবে আখ্যায়িত করে স্কুলের লাইব্রেরিগুলোতে এই বইয়ের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করতে চান। কিন্তু আমেরিকার আদালতের রায়ে সেটা আর সম্ভব হয়নি।

---

[18] ছয় বছর এক সাথে থাকার পরে এই সমকামী দম্পতি আলাদা হয়ে গেছে বলে সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশিত হয়েছে।

[19] And Tango Makes Three, Peter Parnell and Justin Richardson, Simon & Schuster Children's Publishing, April 26, 2005
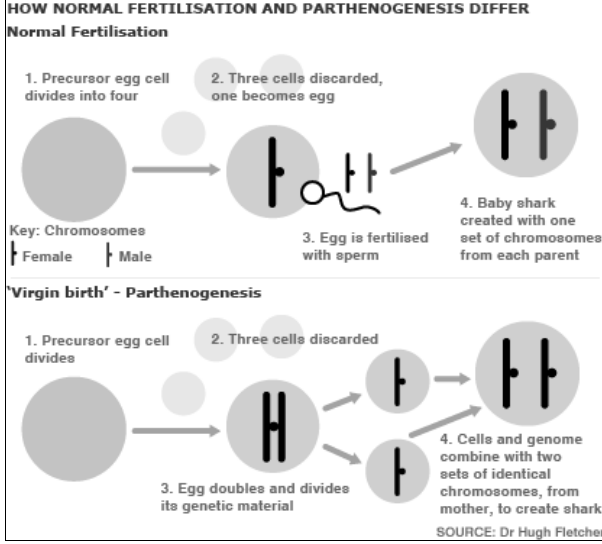
চিত্রঃ সাধারণ নিষেক প্রক্রিয়া এবং পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ার পার্থক্য দেখানো হয়েছে

কারণ অযৌনপ্রজদের যৌনপ্রজদের মতো সময় নষ্ট করে সঙ্গী খুজে জোড় বাঁধতে হয় না। সঙ্গম করে করে শক্তি বিনষ্ট করতে হয় না। নিজের বা সঙ্গীর বন্ধ্যাত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। বুড়ো বয়সে ভায়াগ্রা সেবন করতে হয় না। কিংবা সন্তানের আশায় হুজুর সাঈদাবাদীর কাছে ধর্ণা দিতে হয় না। যথাসময়ে এমনিতেই তাদের বাচ্চা পয়দা হয়ে যায়। কীভাবে? আমরা এখন যে ক্লোনিং –এর কথা জেনেছি, এদের প্রক্রিয়াটা অনেকটা সেরকম। এক ধরনের 'প্রাকৃতিক ক্লোনিং' এর মাধ্যমে এদের দেহের অভ্যন্তরে নিষেক ঘটে চলে অবিরত। ফলে কোনো রকম শুক্রানুর সংযোগ ছাড়াই দেহের ডিপ্লয়েড ডিম্বাণুর নিষেক ঘটে চলে। জীববিজ্ঞানে এর একটি গালভরা নাম আছে- পার্থেনোজেনেসিস (Parthenogenesis)।

কাজেই পার্থেনোজেনেসিস নামধারী অযৌনপ্রজরা সত্যিকার অর্থেই অপারাজেয়,

অন্তত যৌনপ্রজদের তুলনায়। এদের কোনো পুরুষ সঙ্গীর দরকার নেই। সবাই এক একজন মাতা মরিয়ম– সয়ম্ভু যীশু উৎপাদনে পারঙ্গম। যৌনপ্রজরা যে সময়টা ব্যয় করে সঙ্গী খুঁজে তোষামোদ, আদর সোহাগের পশরা খুলে ধুঁকতে ধুঁকতে জিন সঞ্চালন করে, সে সময়ের মধ্যে অযৌনপ্রজরা গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা পয়দা করে ফেলতে পারে – এবং বাইরের কারো সাহায্য ছাড়াই। ফলে 'স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে' এরা বাড়তে থাকে গুনোত্তর হারে। নীচে এরকম একটি অযৌনপ্রজ প্রজাতি "হুইপটেল গিরগিটি"র ছবি দেওয়া হলো।

চিত্রঃ হুইপ্টেল গিরগিটি – অযৌনপ্রজ প্রজাতির হার্টথ্রব। এদের বংশবিস্তারের জন্য কোনো পুরুষ সঙ্গীর প্রয়োজন নেই।

মজার ব্যাপার হলো এই হুইপটেল গিরগিটিকূলের সবাই মহিলা, আর তা হবে নাই বা কেন! তাদের তো কোনো পুরুষ শয্যাসঙ্গীর দরকার নেই। পুরুষেরা তাদের জন্য 'বাহুল্যমাত্র'। কিন্তু তারপরও তাদের মধ্যে সেক্স- সদৃশ একধরনের ব্যাপার ঘটে। দেখা গেছে এক গিরগিটি আরেক গিরগিটিকে যদি জড়িয়ে ধরে রাখে তাহলে তাদের

ডিম পাড়ার হার বেড়ে যায়[20]। প্রকৃতির সমকামী প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত[21]! আমাদের কাছে যত অস্বাভাবিক বা প্রকৃতিবিরুদ্ধই মনে হোক না কেন, হুইপটেল গিরগিটি বা এ ধরনের সরীসৃপদের কাছে কিন্তু এটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা, এবং এরা এভাবেই প্রকৃতিতে টিকে আছে, এবং টিকে আছে খুব ভালোভাবেই। ২০০৬ সালে সরীসৃপকুলের আরেক প্রজাতি কমোডো ড্রাগন (Komodo Dragon) কোনো পুরুষসঙ্গী ছাড়াই লন্ডনের চিড়িয়াখানায় বাচ্চা জন্ম দিয়ে রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দেয়[22]।

চিত্রঃ ২০০৬ সালে লন্ডনের চিড়িয়াখানায় কমোডো ড্রাগন

বিজ্ঞানীরা ২০০১ সালে নেব্রাস্কার ডুরলি চিরিয়াখানার হাতুরীমুখো হাঙ্গরেরও

[20] David Crews, Animal Sexuality, Scientific American, January, 1994

[21] বিজ্ঞানী জোয়ান রাফগার্ডেন তাঁর 'ইভলুশন রেইনবো' (২০০৪) বইয়ে হুইপটেল গিরগিটিদের 'লেসবিয়ান লিজার্ড' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

[22] এনায়েত রহিম, কমোডো ড্রাগনের বিস্ময়কর প্রজনন, নিসর্গ, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৬; আরো দেখুন, Susan Milius, No-Dad Dragons: Komodos reproduce without males, http://www.sciencenews.org/articles/20061223/fob1.asp

(Hammerhead shark) প্রজনন লক্ষ করেছেন কোনো পুরুষসঙ্গীর সাহায্য ছাড়াই[23]। এগুলো সবই পার্থেনোজেনেসিস-এর খুবই স্বাভাবিক উদাহরণ। এ ছাড়াও শুধুই মেয়ে প্রজাতির মাধ্যমে পার্থেনোজেনেসিসের উদাহরণ আছে বিভিন্ন মাছে[24] এবং বহু মেরুদণ্ডী প্রাণীতেও[25]। পার্থেনোজেনেসিসের আরো ভালো উদাহরণ খুঁজতে চাইলে বাংলাদেশের খোদ ঢাকা শহরের ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় চলে যেতে পারেন। শুনেছি, আঁশ পোকা নামে এক বদখদ পোকায় নাকি ছেয়ে গেছে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার গাছপালা। ক্যান্টনমেন্টের বাসিন্দারা রীতিমতো অস্থির। প্রথম আলোতে এ নিয়ে রিপোর্ট পর্যন্ত হয়েছিল। বংশবৃদ্ধির জন্য এ পোকার কোনো পুরুষ লাগে না, মাদী পোকাটি একাই হাজারে হাজার ডিম পেড়ে পঙ্গপালের মতো বংশবৃদ্ধি করে আর আশেপাশের গাছপালাগুলোকে ছিবড়া বানিয়ে ফেলে।

---

[23] Captive shark had 'virgin birth', BBC News, May 23, 2007, http://www.nova.edu/ocean/ghri/bbc_virginshark.html

[24] Vrijenhoek RC, 1984. The evolution of clonal diversity in Poeciliopsis In: Evolutionary genetics of fishes (Turner BJ, ed). New York: Plenum Press; 399–429.

[25] Vrijenhoek, R. C., R. M. Dawley, C. J. Cole and J. P. Bogart, 1989 A list of known unisexual vertebrates, In Evolution and Ecology of Unisexual Vertebrates, edited by R. Dawley and J. Bogart. Bulletin 466, New York State Museum, Albany, New York, pp. 19-23.

দ্বিতীয় অধ্যায়

রূপান্তরকামিতা আর উভকামিতার জগৎ

রূপান্তরকামিতার জগৎ

রূপান্তরকামিতার[26] একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করি। আই আইটির এক ভদ্রলোকের কথা জানতাম। খুব মেধাবী এক ছাত্র। কিন্তু পুরুষ হয়ে জন্মালে কি হবে, তিনি নিজেকে সবসময় নারী মনে করতেন। নারীদের সাথে থাকতে বা বন্ধুত্ব করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন তিনি। ভদ্রলোকের নাম নৃসিংহ মণ্ডল। দৈনিক আজকাল ১৯৯৯ সালের ১২ই আগাস্ট তাকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিল এই শিরোনামে- "ছয় বছর ধরে মেয়ে হতে চাইছে আই আইটি-র কৃতি ছাত্র"। সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতিতে মনে করা হয়, এধরনের লোকেরা নিশ্চয় মনোরোগী। ভারতের নামকরা ডাক্তারেরা তাঁকে পরীক্ষা করলেন, তাঁর শরীরে হরমোনগত কোনো তারতম্য চোখে পড়লো না, মানসিক বিকারের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না। ডাক্তারেরা কি করবেন ভেবে পেলেন না। শুধু চিকিৎসা ক্ষেত্রে নয়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে

---

[26] রূপান্তরকামিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে ট্রান্সেক্সুয়ালিটি (Transexuality)। ট্রান্সেক্সুয়াল মানুষেরা ছেলে হয়ে (বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে) জন্মানো সত্ত্বেও মনমানসিকতায় নিজেকে নারী ভাবেন (কিংবা কখনো আবার উল্টোটি- নারী হিসেবে জন্মানোর পরও মানসিক জগতে থাকেন পুরুষসুলভ)। এদের কেউ কেউ বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান করেন, এই ব্যাপারটিকে বলা হয় (ট্রান্সভেস্টিজম / ক্রসড্রেস), আবার কেউ সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারির মাধ্যমে রূপান্তরিত মানবে (Transexual)পরিণত হন। এরা সকলেই বৃহৎ রূপান্তরপ্রবণ সম্প্রদায়ের (Transgender) অংশ হিসেবে বিবেচিত। বইয়ের শেষে ট্রান্সজেন্ডার, ট্রান্সেক্সুয়ালিটি এবং ট্রান্সভেস্টিজম সংক্রান্ত পরিভাষা দ্রষ্টব্য। বাংলাভাষায় এদেরকে পরিচিত করার সঠিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নেই। এ বইয়ের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে কিছু নতুন পরিভাষা তৈরিতে।

তৈরি হলো একধরনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির এবং জটিলতার। নৃসিংহ মন্ডলও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি মানবাধিকার কমিশনের মধ্যমে নিজের "নারী হবার অধিকার" অধিকার প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। মেডিকেল বোর্ডের সামনে দ্বিধাহীন ভঙ্গিতে বললেন – "ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে হতো আমি ছেলে নই, মেয়ে। বাবা রেগে যেত। মা কিছু বলতেন না। ছেলেবেলা থেকেই মেয়েদের পোশাক পরতে পছন্দ করতাম। চিরকালই আমার ছেলেবন্ধুর চেয়ে মেয়ে বন্ধু বেশি। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি"। চিকিৎসকেরা তাকে বোঝালেন, "একবার ছেলে থেকে মেয়ে হয়ে গেলে ভবিষ্যতে কোনো পরিস্থিতিতে চাইলেও আবার ছেলে হওয়া যাবে না"। নৃসিংহের পালটা প্রশ্ন মেডিকেল বোর্ডকে – "সে পরিস্থিতি আসবে কেন? আমার যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। আমি ভেবেচিন্তেই মেয়ে হতে চাই"। তার প্রতি প্রশ্ন ছিল – "সামাজিক অসুবিধা হতে পারে, চাকরি-বাকরির অসুবিধা হতে পারে"। তাঁর জবাব ছিল – "এখন স্কলারশিপ পাই। গবেষণার পরে দেশে বিদেশে চাকরি পাবই। আর সামাজিক কোনো অসুবিধা আমার হবে না। আর হলেও আমার কিছু যায় আসে না"[27]।

আরেকটা উদাহরণ দেই। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার পুরুষ রূপান্তরকামী জরগেন্সেনের লেখা "Christine Jorgensen: A Personal Autobiography" বইটির কথা বলা যায়। ক্রিস্টিন জরগেন্সেনের আগের নাম ছিল জর্জ জরগেন্সেন। তিনি সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। তিনি নিজেকে নারী ভাবতেন। তার রূপান্তরকামী মানসিকতার জন্য চাকরি চলে যায়। পরে **১৯৫২** সালে অস্ত্রপ্রচারের মাধ্যমে তিনি নারীতে রূপান্তরিত হন। ক্রিস্টিন জরগেন্সেন ছাড়াও আরকজন বিখ্যাত রূপান্তরকামী ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ডঃ রেনি রিচার্ডস। চক্ষুচিকিৎসক, এক সময় ছিলেন পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়। **১৯৭২** সালে পুরুষদের গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টের ফাইনালেও পৌঁছেছিলেন।

[27] আজকাল, ১২ ই আগস্ট, ১৯৯৯।

একসময় বিবাহিত ছিলেন, ছিলেন এক সন্তানের পিতা। সে সময় তাঁর নাম ছিল রিচার্ড রাসকিন্ড। কিন্তু সব সময়ই তিনি নিজেকে নারী ভাবতেন। শেষপর্যন্ত নিজের অভিপ্রায়কে মূল্য দিয়ে সেক্স রিএসাইনমেন্ট অস্ত্রপ্রচারের মাধ্যমে তিনি নারীতে রূপান্তরিত হন এবং রেনি রিচার্ডস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর এই রূপান্তরকরণ টেনিস জগতে জটিলতা সৃষ্টি করে। ইউনাইটেড স্টেটস টেনিস এসোসিয়েশন তাকে নারী হিসেবে ১৯৭২ সালে ইউএস ওপেন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়। রেনি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন এবং আইনি লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে অবশেষে ১৯৭৭ সালে মহিলা হিসেবে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি তার জীবনের নানা জটিলতার কাহিনী উল্লেখ করে বই লেখেন 'No Way Renee: The Second Half of My Notorious Life (২০০৭)'। এ ধরনের অজস্র ঘটনার উদাহরণ হাজির করা যায়। এগুলোর পেছনে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণকে অস্বীকার না করেও বলা যায় – এ ধরনের চাহিদা বা অভিপ্রায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। আর সে জন্যই, প্রখ্যাত রূপান্তরকামী বিশেষজ্ঞ হেনরী বেঞ্জামিন বলেন, আপাত পুরুষের মধ্যে নারীর সুপ্ত সত্তা বিরাজমান থাকতে পারে। আবার আপাত নারীর মধ্যে পুরুষের অনেক বৈশিষ্ট্য সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। তিনি বলেন – "Every Adam contains the element of Eve and every Eve harbors traces of Adam, physically as well as psychologically." হেনরি বেঞ্জামিন ছাড়াও এ নিয়ে গবেষণা করেছেন রবার্ট স্টোলার, এথেল পারসন, লিওনেল ওভেসে প্রমুখ। এদের গবেষণায় উঠে এসেছে দুই ধরনের রূপান্তররকামীতার কথা। শৈশবের প্রথমাবস্থা থেকে যাদের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের মানুষ হবার সুতীব্র বাসনা থাকে তাদের মুখ্য রূপান্তরকামী বলা হয়। অন্যদিকে যারা দীর্ঘদিন সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়েও নানারকম সমস্যায় পড়ে মাঝে মধ্যে নারীসুলভ ভাব অনুকরণ করার চেষ্টা করে তাদের বলে গৌন রূপান্তরকামী। ১৯৬০ সালে মনোচিকিৎসক ওয়ালিন্দার রূপান্তরকামীদের উপরে একটি সমীক্ষা চালান। তাঁর এই সমীক্ষা থেকে জানা যায়, প্রতি ৩৭,০০০ এ একজন পুরুষ রূপান্তরকামীর জন্ম হচ্ছে অন্যদিকে প্রতি

১০৩,০০০-এ একজন স্ত্রী রূপান্তরকামীর জন্ম হচ্ছে। ইংল্যান্ডে এ সমীক্ষাটি চালিয়ে দেখা গেছে যে সেখানে প্রতি ৩৪,০০০-এ একজন পুরুষ রূপান্তরকামী ভূমিষ্ট হচ্ছে আর অন্যদিকে প্রতি ১০৮,০০০-এ একজন জন্ম নিচ্ছে একজন স্ত্রী রূপান্তরকামী। অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডে গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে সেখানে ২৪,০০০ পুরুষের মধ্যে একজন এবং ১৫০,০০০ নারীর মধ্যে একজন রূপান্তরকামীর জন্ম হয়[28]। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায়, জোয়ান অব আর্ক থেকে শুরু করে আজকের প্রথিতযশা জীববিজ্ঞানী জোয়ান (জনাথন) রাফগার্ডেন কিংবা বাস্কেটবল লিজেন্ড ডেনিস রডম্যান সহ অনেকের মধ্যেই যুগে যুগে রূপান্তর প্রবণতা বিদ্যমান ছিল এবং এখনো আছে[29]। উইকিপেডিয়াতেও খ্যাতিমান রূপান্তরকামীদের একটি আংশিক তালিকা পাওয়া যাবে[30]।

এখন কথা হচ্ছে মানবসমাজে রূপান্তরকামীতার আস্তিত্ব আছে কেন? এ বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের ‘সেক্স’ এবং ‘জেন্ডার’ শব্দদুটির অর্থ এবং ব্যঞ্জনা আলাদা করে বুঝতে হবে। সেক্স এবং জেন্ডার কিন্তু সমার্থক নয়। বাংলা ভাষায় শব্দদুটির আলাদা কোনো অর্থ নেই, এদের সঠিক প্রতিশব্দও আমাদের ভাষায় অনুপস্থিত। সেক্স একটি শরীরবৃত্তীয় ধারণা। আর জেন্ডার মূলত নারী ও পুরুষের সমাজ-মনস্তাত্বিক অবস্থা। এই প্রসঙ্গে ‘এনসাইক্লোপিডিয়া অব সাইকোলজিতে’ বলা হয়েছে –

> Sex refers to the physiological, hormonal and genetic makeup (XX or XY chromosome) of an individual; Gender is a cultural category that contains roles, behaviors, rights, responsibilities, privileges and personality traits assigned by that specific culture to men and women.

হেনরি বেঞ্জামিন তাঁর ‘ট্রান্সেক্সুয়াল ফেনোমেনন’ বইয়ে অনেকবারই বলেছেন –

---

[28] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, সমপ্রেম, পূর্বোক্ত।

[29] Leslie Feinberg, Transgender Warriors: Making History from Joan of Arc to Dennis Rodman, Beacon Press, 1997.

[30] List of transgender people, wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/ List_of_transgender_people

Gender is located above, and sex is below the belt. অর্থাৎ সোজা কথায়, সেক্স সমগ্র বিষয়টিকে 'দেহ কাঠামো' নামক ছোট্ট চৌহদ্দির মধ্যে আটকে ফেলতে চায়, যেখানে জেন্ডার বিষয়টিকে নিয়ে যেতে চায় সাংস্কৃতিক নীলিমায়। আমরা আধুনিক চিন্তাধারার সাথে তাল মিলিয়ে এই বইয়ে 'সেক্স' বলতে শারীরিক লিঙ্গ বুঝব, আর 'জেন্ডার' বলতে বুঝব মানসিক কিংবা সাংস্কৃতিক লিঙ্গকে[31]।

মারিয়ার কথা

১৯৮৮ সালের অলিম্পকের আয়োজনে যোগদানের প্রস্তুতি চলছে। মারিয়া প্যাতিনো নামের স্পেনের শীর্ষস্থানীয় মহিলা হার্ডলার অলিম্পিকে যোগদানের শেষ প্রস্তুতিটুকু সেরে নিচ্ছেন। মেয়েদের ইভেন্টগুলোতে যোগদানের নিয়ম হিসেবে তাকে একটি ছোট্ট পরীক্ষা সেরে ফেলতে হবে। সেই পরীক্ষায় দেখা হবে মারিয়া সত্য সত্যই মেয়ে কিনা।

সেটা নিয়ে অবশ্য মারিয়ার চিন্তা নেই। তিনি যে মেয়ে তা জন্মের পর থেকেই তিনি জানেন। যে কেউ তাকে দেখলেই মেয়ে বলেই মনে করবে। দেহকাঠামো, কাঁধের আকার, কটিদেশ নিতম্ব সব কিছুই বলে দেয় তিনি নারী। আগে নারী ক্রীড়াবিদদের গায়নোকলজিস্টদের প্যানেলের সামনে দিয়ে নগ্ন হয়ে হেটে যেতে হতো। এখন পরিস্থিতি বদলেছে। এই অপমানজনক ব্যাপারের মধ্য দিয়ে তাদের

---

[31] বইয়ের পরিশিষ্টে সেক্স এবং জেন্ডারের পার্থক্যসূচক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

যেতে হয় না। গালের পাশ থেকে সামান্য চামড়া নিয়ে জেনেটিক টেস্ট করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফলাফল জানিয়ে দেয়া যায়।

মারিয়া নির্বিঘ্ন চিত্তেই স্যাম্পল দিয়ে এলেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই ডাক্তারের অফিস থেকে ফোন এলো। কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে। মারিয়াকে আবারো পরীক্ষা দিতে হবে। মারিয়া আবারো গেলেন। আবারো টেস্ট হলো। এবারে আরেকটু বিস্তৃত পরীক্ষা। ডাক্তারদের মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই ঝামেলাটি কি ছিল।

মারিয়া যখন পরদিন অলিম্পিকের ট্র্যাকে প্রথমবার দৌড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঠিক তখনই খবরটি ফাঁস করা হলো। মারিয়া 'সেক্স টেস্ট'-এ ফেল করেছেন। তিনি মেয়ের মতো দেখতে হলেও ক্রোমোজমের গঠন অনুযায়ী তিনি পুরুষ। তার দেহকোষে Y-ক্রোমজোমের অস্তিত্ব রয়েছে। তার দেহের ভিতরে সুপ্ত অবস্থায় পুরুষাঙ্গের উপস্থিতি আছে। উপরন্তু, তার কোনো ডিম্বাশয় এবং জরায়ু নেই। ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির (IOC) 'সংজ্ঞা' অনুযায়ী তিনি নারী নন। কাজেই তাকে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না।

হতাশ মারিয়া স্পেনে ফিরে এলেন। স্পেনে আসার পর তার জীবনে আক্ষরিক অর্থেই কেয়ামত নেমে এলো। স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ মারিয়ার আগের সমস্ত টাইটেল এবং পদক কেড়ে নিলো আর পরবর্তী সকল প্রতিযোগিতায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। তার বয়ফ্রেন্ড তাকে ছেড়ে চলে গেলো। তার স্কলারশিপ বাতিল করা হলো; হঠাৎ করেই মারিয়া নিজেকে দেখতে পেলেন অন্ধকারের এক অথৈ সমুদ্রে। পরে মারিয়া সেই সময়কার দুর্বিষহ অবস্থার কথা বর্ণনা করে বলেছিলেন এভাবে - 'আমাকে মানচিত্র থেকে স্রেফ মুছে ফেলা হলো – এমন একটা ভাব যেন আমি কখনো ছিলামই না। অথচ আমি বারো বছর ধরে খেলাধূলার সাথে জড়িত ছিলাম, আর এই ছিল তার প্রতিদান'[32]।

এর পরের ঘটনা আরো নাটকীয়। মারিয়া তার গাঁটের হাজার হাজার টাকা

---

[32] Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality, Anne Fausto-Sterling, Basic Books , November, 2000

খরচ করে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হলেন। বহু ডাক্তারের সাথে তার সাক্ষাত হলো। ডাক্তারেরা অবশেষে তার এই অদ্ভুতুরে 'রোগের' কারণ খুঁজে পেলেন। তাকে জানানো হলো, মেডিকেলের পরিভাষায় এই অবস্থাটিকে বলা হয় - Androgen Insensitivity। যদিও মারিয়া অন্য সব স্বাভাবিক ছেলেদের মতো Y-ক্রোমজোম নিয়েই জন্মেছিলেন, এবং অন্য সব পুরুষের মতো তার অন্ডকোষ থেকেও প্রচুর পরিমাণ পুরুষ হরমোন টেস্টোসটেরোন (এন্ড্রোজেন হরমোনের একটি স্টেরয়েড শ্রেণী) নিঃসৃত হয়েছিল, কিন্তু তার কোষগুলো শিশু বয়সে সেই নিঃসৃত হরমোনকে সনাক্ত করতে পারেনি। বিজ্ঞানীরা বলেন পৃথিবীতে বিশ হাজার পুরুষ শিশুর মধ্যে অন্তত একজন এরকম 'এন্ড্রোজেন গ্রাহক' (Androgen Receptors)-জনিত সমস্যা নিয়ে পৃথিবীতে জন্মায়[33], যাদের কোষ এই নিঃসৃত এন্ড্রোজেন সনাক্ত করতে পারে না। মারিয়ারও তাই হয়েছিল। এর ফলে মারিয়ার দেহে 'পুরুষসুলভ' বৈশিষ্টগুলো অনুপস্থিত ছিল প্রথম থেকেই, যদিও তার ক্রোমোজমের গঠন ছিল পুরুষেরই। তারপর বয়ঃসন্ধিকালে এন্ড্রোজেন নিঃসৃত হলেও তার দেহে এন্ড্রোজেনের প্রতি কোনো সংবেদনশীলতা না থাকায় তার স্তন বৃদ্ধি পেল, কটিদেশ কমে আসলো, আর নিতম্ব ভারী হয়ে উঠলো, চারপাশের অন্যান্য নারীদের মতোই। কাজেই মারিয়া দেখতে শুনতে এবং মন মানসিকতায়ও নারীই হয়ে উঠেছিলেন, তার ক্রোমজমে যাই থাকুক না কেন। নারীত্বের দাবি নিয়ে তার নিজের মনেও কখনোই সন্দেহের সৃষ্টি হয়নি।

মারিয়া আইওসি'র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ, তিনি জানেন তিনি নারী, তিনি বড়ও হয়েছেন নিজেকে নারী হিসেবেই দেখে। হঠাৎ করে কেউ এসে বললো –তিনি পুরুষ, আর হলো নাকি! তিনি স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞানী এলিসন কার্লসনের সাথে মিলে তার নিজস্ব যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকলেন। বিজ্ঞানীরা আজ জানেন নারী কিংবা পুরুষ হবার ব্যাপারটা শুধু ক্রোমোজমের গঠনের উপরই নির্ভরশীল নয়, তার চেয়ে বেশি নির্ভর

---

[33] Eve's Rib: Searching for the Biological Roots of Sex Differences, Robert Peel, Publishers, New York, 1994.

করে হরমোনের উপর [34]। অথচ অলিম্পিক কমিটির পরীক্ষায় হরমোন সংক্রান্ত ব্যাপারই নেই। মারিয়া দাবি করলেন, তার পেলভিক কাঠামো এবং কাঁধের কাঠামোর গঠন এবং অন্যান্য দেহজ বৈশিষ্টগুলো দেখে যেন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নারীদের ইভেন্টগুলোতে প্রতিযোগিতা করা জন্য তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে 'নারীত্ব' আছে কিনা! প্রায় আড়াই বছর ধরে যুদ্ধ চালানোর পর ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচার এথলেটিক ফেডারেশন[35] (IAAF) মারিয়াকে পূর্বেকার পদে পুনর্বহাল করলো এবং **১৯৯২** সালে মারিয়া আবার স্প্যানিশ অলিম্পিক দলে যোগদান করতে পারলেন। ইতিহাসে এই প্রথম বারের মতো কোনো নারী আইওসির 'সেক্স টেস্ট' সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে নিজের পরিচিতি নিয়েই অলিম্পিক দলে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করলেন। তবে আইএএফ মারিয়ার ব্যাপারে উদারতা দেখালেও আইওসি এখনও সেই সনাতন Y ক্রোমোজম দেখে সেক্স টেস্ট-এর রীতিতে বিশ্বাসী।

মারিয়ার মতো ঘটনাগুলো আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে তৈরি করেছে যেমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতির, তেমনি প্রশ্নবিদ্ধ করেছে 'সেক্স' নিয়ে আমাদের সনাতন ধ্যান ধারণাগুলোকে। এ ধরনের বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমরা অবশেষে বুঝতে শিখেছি যে, শুধু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে এমনকি ক্রোমজোমের গঠন দিয়ে নারী-পুরুষকে সংজ্ঞায়িত করার দিন আর নেই। মানুষের লৈঙ্গিক পরিচিতি তুলে ধরতে হলে বাহ্যিক প্রকৃতির পাশাপাশি গণ্য করতে হবে মানুষের সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকেও। আর এ জন্যই সেক্স জিনিসটার পাশাপাশি জেন্ডারের ধারণা থাকা, এবং জেন্ডার-সচেতনতা থাকা এই একবিংশ শতাব্দীতে খুবই প্রয়োজনীয়।

যৌনতার শরীরবৃত্তীয় বিভাজন মেনে নিয়েও বলা যায়, সামাজিক অবস্থার (চাপের) মধ্য দিয়েই আসলে এখানে একজন নারী 'নারী' হয়ে উঠে, আর পুরুষ হয়ে ওঠে

---

[34] "Sex is much more a matter of hormones than of chromosomes. Indeed, the small Y chromosome, the root of all maleness, seems to do little besides turn on the "master male switch" to start the flow of hormones" see for details, Eve's Rib: Searching for the Biological Roots of Sex Differences, Robert Peel, Publishers, New York, 1994.

[35] বর্তমানে International Association of Athletics Federations নামে পরিচিত।

'পুরুষ'। আমাদের রক্ষণশীল সমাজ নারী আর পুরুষের জন্য জন্মের পর থেকেই দুই ধরনের দাওয়াই বাৎলে দেয়। নানা রকম বিধি-নিষেধ ও অনুশাসন আরোপ করে। পোশাক থেকে শুরু করে কথা বলার স্টাইল পর্যন্ত সবকিছুই এখানে লৈঙ্গিক বৈষম্যে নির্ধারিত হয়। এর বাইরে পা ফেলা মানেই যেন নিজ লিঙ্গের অমর্যাদা। কোনো ছেলে একটু নরমভাবে কথা বললেই তাকে খোঁটা দেওয়া হয় 'মেয়েলি' বলে, আর নারীর উপর হাজারো রকম বিধি-নিষেধ আর নিয়মের পাহাড় তো আছেই। ফলে দুই লিঙ্গকে আশ্রয় করে তৈরি হয় দু'টি ভিন্ন বলয়। কিন্তু সমস্যা হয় রূপান্তরকামী মানুষদের নিয়ে। এরা আরোপিত বলয়কে অতিক্রম করতে চায়। তারা কেবল 'যৌনাঙ্গের গঠন অনুযায়ী' লিঙ্গ নির্ধারনের সনাতনী প্রচলিত ধারণাকে মন থেকে মেনে নিতে পারে না। তারা শারীরিক লিঙ্গকে অস্বীকার করে বিপরীত সাংস্কৃতিক বা মানসিক লিঙ্গের সদস্য হতে চায়। তারা মনে করে দেহ নামক বাহ্যিক কাঠামোটি তাদের জন্য সঠিক লৈঙ্গিক পরিচয় তুলে ধরছে না; মনে করে সেক্স নয়, আসলে জেন্ডার অনুযায়ী তাদের লিঙ্গ নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর পর থেকে (বস্তুত বিগত কয়েক দশকে) পশ্চিমা বিশ্বে জেন্ডার সম্পর্কিত ধারণা যত ঋদ্ধ হয়েছে ততই লৈঙ্গিক বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙে পড়ছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতিতে সেক্সচেঞ্জ অস্ত্রোপ্রচারে এসেছে বিপ্লব[36]। কানাডা, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে রূপান্তরকামী মানুষের চাহিদাকে মূল্য দিয়ে সেক্সচেঞ্জ অপারেশনকে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের মতো সংখ্যাগরিষ্টদের জন্য ব্যাপারটা 'অস্বাভাবিক' কিংবা 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' শোনালেও খোদ প্রকৃতিতেই বহু প্রজাতির মধ্যে সেক্স চেঞ্জ বা রূপান্তরপ্রবণতা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এমনি কিছু উদাহরণ পাঠকদের জন্য হাজির করছিঃ

উত্তর আমেরিকার সমুদ্রোপোকূলে এক ধরনের ক্ষুদ্র প্রাণী খুঁজে পেয়েছেন

---

[36] কারো চাহিদা বা অভিপ্রায়লে মূল্য দিয়ে সেক্স চেঞ্জ অপারেশন সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেলেও পরিণত বয়সে পৌছুনোর পূর্বেই অভিভাবকদের বা ডাক্তারদের ইচ্ছাকে মূল্য দিতে গিয়ে সেক্সচেঞ্জ করে উভলিঙ্গত্ব থেকে শিশুকে 'মুক্তি দেয়ার' চেষ্টা আজকে বিতর্কিত এবং মূল্যবোধের কষ্টিপাথরে প্রশ্নবিদ্ধ। এ নিয়ে পরবর্তী বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা। এরা আটলান্টিক স্লিপার শেল (Atlantic Slipper Shell) নামে পরিচিত। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এদের নাম ক্রিপিডুলা ফরমিক্যাটা (Crepidula Fornicata)। এই প্রজাতির পুরুষেরা একা একা ঘুরে বেড়ায়। তারপর তারা কোনো স্ত্রী সদস্যদের সংস্পর্শে এলে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। যৌন সংসর্গের ঠিক পর পরই পুরুষদের পুরুষাঙ্গ খসে পড়ে এবং এরা রাতারাতি স্ত্রীতে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের পর এরা আর একাকী ঘুরে বেড়ায় না, বরং স্থায়ী হয়ে বসবাস করতে শুরু করে। প্রকৃতিতে পুরুষ থেকে নারীতে পরিণত হবার এ এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ক্রিপিডুলা নিয়ে গবেষণায় বেড়িয়ে এসেছে আরো নানা ধরনের বিচিত্র তথ্য। বিজ্ঞানীরা এই প্রজাতির একটি সদস্যকে খুব ছোট অবস্থায় অন্য সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। এবার পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যায়, এর মধ্যে স্ত্রী জননাঙ্গের বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে। কিন্তু যদি একে কোনো পরিণত ক্রিপিডুলার সাথে রাখা হয়, তবে সে ধীরে ধীরে পুরুষে রূপান্তরিত হতে থাকে।

উত্তর আমেরিকার ওই একই অঞ্চলের ‘ক্লিনার ফিশ’ নামে পরিচিত এক ধরনের মাছের মধ্যে গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা রূপান্তরকামীতার পরিষ্কার প্রমাণ পেয়েছেন। এ মাছগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাবারিডেস ডিমিডিয়াটাস (Laborides dimidiatus)। এ প্রজাতির পুরুষেরা সাধারণত পাঁচ থেকে দশজন স্ত্রী নিয়ে ঘর বাঁধে (নাকি ‘হারেম বাঁধে’ বলা উচিৎ?)। কোনো কারণে পুরুষ মাছটি মারা পড়লে স্ত্রীদের মধ্যে যে কোনো একজন (সম্ভবত সবচেয়ে বলশালী জন) সংসার পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এই দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই ওই স্ত্রীমাছটির মধ্যে দৈহিক পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। দু সপ্তাহের মধ্যে সে পরিপূর্ণ পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যায় (তার গর্ভাশয় ডিম্বাণু উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, এবং নতুন করে পুরুষাঙ্গ গজাতে শুরু করে) এবং এবং অন্যান্য স্ত্রী মাছদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে স্ত্রী থেকে পুরুষে রূপান্তরের এও একটি মজার দৃষ্টান্ত। রূপান্তরকামিতার উদাহরণ আছে এনিমোন (Anemone) বা ‘ক্লাউন মাছ’দের (Clown Fish) মধ্যেও। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সামুদ্রিক প্রবাল প্রাচীরের কাছাকাছি বেড়ে ওঠা মাছদের মধ্যে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি

অনুযায়ী যৌনতার পরিবর্তন অতি স্বাভাবিক ঘটনা[37]।
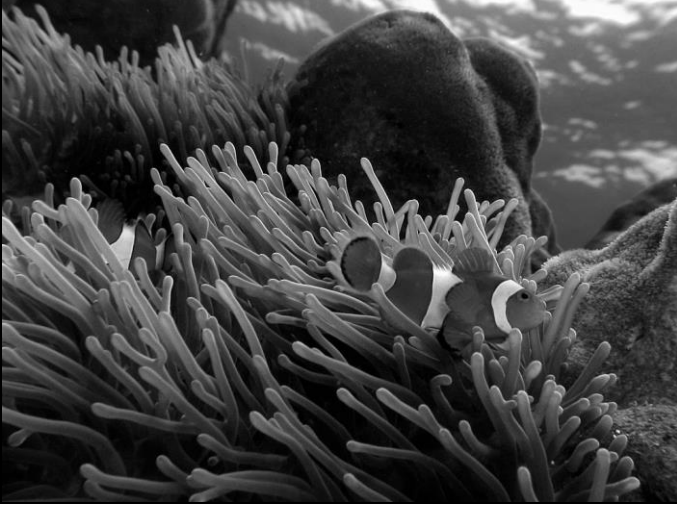
চিত্রঃ এনিমোন বা ক্লাউন মাছদের মধ্যে সেক্স চেঞ্জ অতি সাধারণ একটি ঘটনা। প্রাকৃতিক ট্রান্সেক্সুয়ালিটির বাস্তব উদাহরণ।

ইউরোপিয়ান ফ্লে অয়েস্টার (European Flay Oyster) ও অস্ট্রা এডুলিস (Ostrea edulis) প্রজাতির ঝিনুকেরা যৌনক্রিয়ার সময় পর্যায়ক্রমে স্ত্রী ও পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বস্তুত এদের একই শরীরে স্ত্রী ও পুরুষ জনন অঙ্গের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে, এই প্রজাতির ঝিনুকেরা পুরুষ হিসেবে যৌনজীবন শুরু করার পর ধীরে ধীরে স্ত্রীর ভূমিকায় রূপান্তরিত হয়। ইংল্যান্ডের সমুদ্র উপকূলে এই ধরনের ঝিনুক প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো প্রতিবছর একবার করে তাদের যৌনতার পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু ভূ-মধ্যসাগরীয় উষ্ণ অঞ্চলে ওই একই ঝিনুকের দল প্রতি ঋতুতেই তাদের যৌন রূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। নারী থেকে পুরুষ কিংবা পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরের প্রায়শই প্রমাণ পাওয়া গেছে ইউনো মার্জিনালিস (Uno marginalis) নামের

[37] *Sex change? Something Fishy*, Release from Philadelphia Inquirer.

আরো একটি প্রজাতির ঝিনুকের মধ্যেও। সামুদ্রিক পোকা বলিনিয়ার মধ্যেও এ ধরনের রূপান্তর ঘটে থাকে। যৌনতার পরিবর্তন হরহামেশাই ঘটে চলেছে কিছু মাছি, কেঁচো, মাকড়শা এবং জলজ ফ্লি ডাফনিয়াদের মধ্যেও, এমনকি এদের অনেকেই পরিবেশ ও পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে 'যৌনপ্রজ' থেকে 'অযৌনপ্রজ'তেও রূপান্তরিত হয়[38] ।

তাহলে এখন প্রশ্ন হলো, এই সমস্ত উদাহরণ এখানে দেওয়ার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হলো, প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় জীবজগতের সাথে পরিচিত হওয়া। সেই সাথে এটাও বুঝা যে ব্যাপারগুল এতো সোজাসাপ্টা নয়, যে আমরা হলফ করে বলে দিতে পারব শুধু যৌনপ্রজরাই প্রাকৃতিক, আর বাকিরা সব 'বানের জলে ভেসে এসেছে'। এরকম ভাবার আগে আমাদের বোঝা উচিৎ যে, সাদা-কালো এরকম চরম সীমার মাঝে সবসময়ই কিছু ধুসর এলাকা থাকে। আর সেই ধুসর এলাকায় নির্বিঘ্নে বাস করে সমকামিতা, উভকামিতা, উভকামের সমকামিতা, রূপান্তরকামিতার মতো যৌনপ্রবৃত্তিগুলো।

উভকামিতার জগৎ

মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড অনেক আগেই যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে উভকামিতার অস্তিত্ব স্বীকার করে বলেছিলেন[39] -

> "পৃথিবীর সব মানুষই আসলে উভকামী... এবং তাদের লিবিডো থাকে দুই লিঙ্গের পরিসীমায় বিন্যস্ত ...।'

---

[38] David Crews, Animal Sexuality, Scientific American, January, 1994

[39] ফ্রয়েডের সম্পূর্ণ উক্তিটি ছিল এরকম -

'We have come to learn, that every human being is bisexual in this sense, and that his libido is distributed, either in a manifest or a latent fashion, over objects of both sexes'

(Ref. Steven Angelides , A History of Bisexuality, University Of Chicago Press; 1 edition (September 15, 2001)

আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে যখন কিন্সের স্কেলের সাথে পরিচিত হব তখন দেখব যে, সমকামিতা এবং বিষমকামিতা - মানব জীবনের এই দুই যৌনপ্রবৃত্তি থাকে স্কেলের দুই দিকের দুই প্রান্তসীমায়। মাঝামাঝি অংশটিতে থাকে উভকামিতার অনন্য ভূবন। কোনো ব্যক্তি যখন একই সাথে সমলিঙ্গ ও বিষমলিঙ্গের প্রতি যুগপৎ যৌনাকর্ষণ অনুভব করেন, তখন তাকে উভকামী (Bisexual) বলা হয়। উভকামী ব্যক্তির যৌনজীবন খণ্ডিতভাবে দেখা হলে কখনো তাকে বিষমকামী কখনো বা সমকামী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা উভকামিতাকে আলাদা একটি যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে গণ্য করারই পক্ষপাতি। এটা নিশ্চিত যে, ব্যক্তির যৌনজীবনের সামগ্রিকরূপটি যদি উন্মোচিত হয়, তবে তাকে উভকামিতার পর্যায়ে ফেলাই হবে সঙ্গত। কিন্তু মুশকিল হলো, উভকামিতাকে স্বীকৃতি দিতে গেলে নারী-পুরুষের 'স্বাভাবিক' প্রথাসিদ্ধ জীবন অনেক সময়ই ভেঙে পড়ে। কারণ, উভকামিতা নামক প্রবৃত্তিটি বিষমকামী সম্পর্কের সনাতন 'মনোগামিতার মিথ'টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে খুব স্বাভাবিকভাবেই। অস্কার ওয়াইল্ডের উদাহরনটি এখানে উল্লেখ্য। প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ড ছিলেন উভকামী। তিনি বিবাহিত জীবন যাপনের পরেও একজন পুরুষের সাথে মনোদৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পরেছিলেন। ওয়াইল্ডের এই প্রবৃত্তিকে 'স্বাভাবিক' হিসেবে মেনে নিতে গেলে তার স্ত্রীর বাইরে ওই পুরুষটির সম্পর্কটিকেও মেনে নিতে হয়। ফলে 'বিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানটির ভিত দুর্বল হয়ে যায়। তৎকালীন ব্রিটিশ সমাজ একে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেনি। অস্কার ওয়াইল্ডকে সেজন্য পোহাতে হয় কারাদণ্ড। শুধু ওয়াইল্ড কেন কিছুদিন আগে জেমস ম্যাকগ্রিভি তাঁর নিভৃত সমকামের কথা স্বীকার করে নিউজার্সির গভর্নর পদ থেকে পদত্যাগ করেন ২০০৪ সাল। তিনি বিবাহিত ছিলেন, ছিলেন দুই কন্যার পিতা। তার সমকামিতার প্রবণতার কথা প্রকাশিত হবার আগ পর্যন্ত সবাই তাকে বিষমকামীই ভেবেছিলেন। তাঁর সমকামিতার ঘটনা প্রকাশিত হবার পর স্ত্রীর সাথে

তার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। শুধু তাই নয়, তার স্ত্রী এও বলেন, 'ম্যাকগ্রিভি সমকামী জানলে তাঁকে আমি কখনোই আমার সন্তানের পিতা হতে দিতাম না'। আসলে উভকামীরা অনেক সময়ই শুধু প্রথাগত সমাজ নয়, সমকামী এবং বিষমকামী– দু দল থেকেই বঞ্চনার স্বীকার হয়। বিষমকামী তো বটেই এমনকি সমকামী মানুষদেরও এমন ধারণাই বদ্ধমূল যে, বিষমকামিতার বাইরে 'সমান্তরাল যৌনপ্রবৃত্তি' বলতে কেবল সমকামিতাকেই বোঝায়। সমকামীরা উভকামীদের সমস্যাকে বুঝতে চায় না। তাদের অনেকের কথা হলো– উভকামী বলে কিছু নেই; আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বিখ্যাত উক্তির মতো উক্তি উভকামীদের প্রতিনিয়ত হজম করতে হয় - 'স্টে আইদার উইথ আস অর উইথ দেম'[40]। আর কোনো তৃতীয় সত্তাকে কোনো দলই গ্রহণ করতে চায় না। ব্যাঙ্গালোরের 'পিপলস ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টি'র ক্ষেত্র-সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে সমকামীরা উভকামীদের শুধু প্রত্যাখ্যানই করে না, ঘৃণাও করে[41]। ফলে প্রান্তিকায়িত যৌন প্রবৃত্তির সদস্যদের মধ্যেও উভকামীরা দ্বিতীয়বার প্রান্তিক হিসেবে চিহ্নিত হয়। তারা হয়ে ওঠে সত্যিকার সংখ্যালঘু। এদের জীবন-যন্ত্রণা হয় আরো মর্মান্তিক, এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভয়াবহ।

---

[40] ' You are either with us or against us' , Bush's speech in 20001 for Combating terrorism; http://archives.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror/

[41] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, *সমপ্রেম*, পূর্বোক্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

উভলিঙ্গত্ব

১৮৪৩ সাল। সেলসবুরির অধিবাসী ২৩ বছরের লেভি সুয়েদাম নগর নির্বাচকদের কাছে স্থানীয় নির্বাচনে হুইগের[42] প্রার্থী হিসেবে ভোট দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সাথে সাথেই তিনি বিরোধী দল থেকে ঘোরতর সমালোচনার সম্মুখীন হলেন। সমালোচনার কারণটি আজকের যুগে শুনলে হয়ত অনেকেরই অবাক লাগবে। না সমালোচনার পেছনে লেভি সুয়েদামের কোনো দুর্নীতি, চারিত্রিক দুর্বলতা কিংবা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অযোগ্যতা বা এই ধরনের কিছু ছিল না। বিরোধী দলের প্রধান আপত্তি ছিল – লেভিকে দেখলে যতটা পুরুষসুলভ মনে হয়, তার চেয়ে বেশি নারী সুলভ। আর সে সময় নারীদের কোনো ভোটাধিকার ছিল না। কাজেই লেভি সুয়েদামকে ‘নারী’ প্রমাণ করতে পারলেই হয়ত ‘কম্ম সাবার’। নির্বাচকেরা এই দ্বন্দ্বের সুরাহা করতে একজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসলেন। বিজ্ঞ ডাক্তার উইলিয়াম বেরী সুয়েদামের দেহে লিঙ্গ এবং অণ্ডাশয়ের অস্তিত্ব সনাক্ত করে রায় দিলেন লেভি সুয়েদাম পুরুষ। কাজেই লেভি ভোট দেয়ার যোগ্য। লেভি সুয়েদামের ভোটে হুইগ নির্বাচনে জিতলো এক ভোটের ব্যবধানে।

কিন্তু কিছুদিন পরে ডাক্তার উইলিয়াম বেরী লেভি সুয়েদামকে পরীক্ষা করতে এসে হতভম্ব হয়ে দেখেন তার নিয়মিত মাসিক হয়, এবং তার উন্মুক্ত যোনীদ্বার রয়েছে। তার কাঁধ মেয়েদের কাঁধের মতোই অপ্রশস্ত, নিতম্ব মেয়েদের মতোই ভারী।

---

[42] One of the political party in the United States from about 1829 to 1856, opposed in politics to the Democratic party.

শুধু তাই নয়, লেভি সব সময়ই একটু রঙ চঙ্গা কাপড় চোপড় পছন্দ করতেন, কায়িক শ্রম অপছন্দ করতেন ইত্যাদি। তার এই 'মেয়েলী বৈশিষ্ট্যগুলো'[43] ডাক্তারের চোখে ধরা পড়ে যাবার পরে তিনি আবারো ভোটের অধিকার হারিয়েছিলেন কিনা তা কেউ বলতে পারে না[44]। ফলাফল যাই হোক না কেন লেভি সুয়েদাম কিংবা মারিয়া প্যাতিনোর মতো (পুর্ববর্তী অধ্যায় দ্রঃ) ঘটনাগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে মানুষকে কেবল 'নারী' এবং 'পুরুষ' এই দুইভাগে বিভক্ত করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অনেকক্ষেত্রেই খুব সরল। যেখানে বিভক্তি এত স্পষ্ট নয়, সেখানে জোর করে লিঙ্গ আরোপকরণ সমস্যা হ্রাস করেনি, বরং আরো জটিল করে তুলেছে।

আমি আগের অধ্যায়ে রূপান্তরকামিতা নিয়ে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। বলেছিলাম, সমকামিতা, উভকামিতা, উভকামের সমকামিতা, রূপান্তরকামিতার মতো যৌনপ্রবৃত্তিগুলোকে ঢালাওভাবে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' অভিধায় অভিহিত করার আগে আমাদের আরেকটিবার চোখ মেলে প্রকৃতির দিকে তাকানো উচিৎ। এরপর সামগ্রিকভাবে বোঝা উচিৎ যৌনতার উদ্ভবকে। প্রানীজগতের একেবারে গোড়ার দিকে কিছু পর্ব হলো– প্রটোজোয়া, পরিফেরা, সিলেনটেরেটা, প্লাটিহেলমিনথিস, অ্যানিলিডা, মোলাস্কা ও কর্ডাটা। এই সমস্ত প্রাণীদের বেশিরভাগই উভলিঙ্গ বা হার্মাফ্রোডাইট (Hermaphrodite)[45], কারণ এদের শরীরে স্ত্রী ও পুরুষজননাঙ্গের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। এদের জন্য উভলিঙ্গত্ব কোনো শারীরিক ত্রু টি নয়, বরং এটি পুরোপুরি

---

[43] উল্লেখ্য, ঊনবিংশ শতকের ডাক্তারদের মাথায় 'সেক্স' এবং 'জেন্ডারের' মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না।

[44] Two Sexes Are Not Enough, Anne Fausto-Sterling, NOVA Online, http://www.pbs.org/wgbh/nova/gender/fs.html , Also see Sexing the body, Anne Fausto-Sterling, পুর্বোক্ত।

[45] হার্মাফ্রোডাইট শব্দটি এসেছে গ্রীক উপকথা থেকে। হার্মাফ্রোডিটসও ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের একজন দেবতা। তাঁর বাবার নাম ছিলেন হার্মেস, আর মা ছিলেন আফ্রোডাইট। একদিন প্রস্রবণে স্নানের পর তিনি উভলিংগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। হার্মাফ্রোডিটস থেকেই ইংরেজিতে হার্মাফ্রোডাইট (hermaphrodite) শব্দটি এসেছে। শ্লেষাত্মক হলেও সত্যি যে, পশ্চিমা বিশ্ব গ্রীক মিথলোজির সাথে তাল মিলিয়ে প্রাণিজগতের সমন্বয় করলেও, প্রাণিজগতের উভলিঙ্গত্ব কোনো মিথলজি কিংবা রূপকথা নয়, বরং কঠিন বাস্তবতা।

‘প্রাকৃতিক’। এরা এদের উভলিঙ্গত্ব নিয়েই স্বাভাবিক বংশবিস্তারে সক্ষম[46]। অর্থাৎ, যে যৌনতার বিভাজনের জন্য আমরা যৌনপ্রজরা আজ গর্ববোধ করি, অবলীলায় অন্যদের ‘অ্যাবনরমাল’, ‘আননেচারাল’-এর তকমা এঁটে দেই- গোড়ার দিকে কিন্তু প্রকৃতিতে যৌনতার সেরকম কোনো সুস্পষ্ট বিভেদ ছিল না। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, মানব সমাজেও উভলিঙ্গত্ব বিরল নয়। প্রাচীন গ্রীসে সমকামিতা, প্রাচীন রোমে খোজা প্রহরী (Eunuch), নেটিভ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ‘দ্বৈতসত্তা’ (two-spirits), আরব ও পার্সিয়ায় ‘বার্দাশ’ এবং ভারতবর্ষে ‘হিজড়া’দের অস্তিত্ব সেই সাক্ষ্যই দেয়। এ ছাড়া আছে ভারতের কোতি, ওমানের জানিথ, ইন্দোনেশিয়ার লুডরুক বান্টুট, মাসরি এবং রায়গ, মালয়শিয়ায় আহকুয়া, বাপুক, পোনদান কিংবা নাকনিয়া। তুরস্কে নসঙ্গা, মুস্তাক্নেৎ, আরবের মুখান্নাথুন, নেপালের মেটি, থাইল্যান্ডের কাথোই, চিনের তাংঝি, মালাগাসির তসিকাত্, মিশরের খাওয়াল, অ্যাঙ্গোলার চিবাদোস্, কেনিয়ার ওয়াসোগা, পর্তুগালের জিম্বাদা, পলিনেশিয়ার ফাফাফিনি, মেক্সিকোর জোতো/পুতো, ব্রাজিল এবং ইসরায়েলের ত্রাভেস্তি এবং ত্রান্সফরমিস্তাসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে থাকা রূপান্তরকামী কিংবা উভলিঙ্গ সত্তা[47]। হিন্দুদের পুরাণে আমরা পেয়েছি বৃহন্নলা কিংবা শিখণ্ডীর মতো চরিত্র। আছে শিবের অর্ধনারীশ্বর মুর্তি। পশ্চিমা বিশ্বে শেরিল চেজ, এরিক শেনিগার, জিম সিনক্লায়ারের মতো ইন্টারসেক্স –সেলিব্রিটিরা স্বাভাবিকভাবে জীবন-যাপন করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠরা এদের অনেককেই ‘অস্বাভাবিক’ হিসেবে চিহ্নিত করবেন। আমরা বরং ‘স্বাভাবিক’ মানুষদের কথা বলি।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিবর্তনের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় আমরা গর্বিত ‘স্বাভাবিক’ মানুষেরাও নিজেদের দেহেই উভলিঙ্গত্বের বহু আলামত বহন করে চলেছি – নিজেদের অজান্তেই। যেমন, নারী জননাঙ্গ পুরুষের মতো না হলেও, পুরুষের শিশ্নের অনুরূপ

---

[46] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, পূর্বোক্ত।

[47] বইইয়ের পরিশিষ্টে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি এবং সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা রূপান্তরকামী এবং উভলিঙ্গ সত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একটি ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত সংবেদনশীল অঙ্গের অবস্থান লক্ষ করা যায়, যাকে ভগাঙ্কুর বা ক্লাইটোরিস বলে। আবার অন্যদিকে পুরুষ শরীরে স্ফীত স্তন না থাকলেও স্তন ও স্তনবৃন্তের সুপ্ত উপস্থিতি সব সময়ই লক্ষণীয়। বলাবাহুল্য, বংশবিস্তারে এসমস্ত অংগের কোনো ভূমিকা নেই, তবুও আমরা এসমস্ত 'এবনরমালিটি' বহন করে চলেছি 'প্রাকৃতিক ভাবেই' – বিবর্তনের পথ ধরে। আরো কিছু উদাহরণ দেই। পুরুষ শরীরের থেকে ব্যাপক পরিমাণে অ্যান্ড্রোজেন (Androgen) যেমন নিঃসৃত হয়, তেমনি অল্প পরিমানে হলেও এস্ট্রোজেন (Estrogen) নিঃসৃত হয়ে থাকে। এই এস্ট্রোজেন 'স্ত্রী হরমোন' হিসেবে পরিচিত। ঠিক তেমনি, মেয়েরা স্ত্রী হরমোন নিঃসরণের পাশাপাশি সামান্য পরিমাণে হলেও পুরুষ হরমোনও নিঃসরণ করে থাকে। এইভাবে বিপরীত লিঙ্গের অনেক কিছুই আমরা প্রাণের উৎপত্তির ঊষালগ্ন হতে ধারণ করে চলেছি – এবং তা প্রাকৃতিকভাবেই। শুধু মানুষ কেন অনেক প্রাণীর মধ্যেই এমনটি লক্ষণীয়। আফ্রিকার নিশাচর মাংশাসী হায়নাদের (spotted hyena) কথা বলা যায়, যাদের নারী সম্প্রদায়কে দেখলে পুরুষ বলেই বিভ্রম হবার কথা। সায়েন্টেফিক আমেরিকানে প্রকাশিত প্রবন্ধে অধ্যাপক ডেভিড ক্রুস বলেন[48] – "The large erectile clitoris of a female spotted Hyena closely resembles a male's penis. Much like many male animals, female spotted hyenas use their clitorises in greeting displays and dominance interactions". এ ধরনের 'পুরুষাঙ্গ সদৃশ' দীর্ঘ ভগাঙ্কুর শুধু স্পটেড হায়নাদের মধ্যে নয়, আছে কাঠবিড়ালী সদৃশ নিশাচর প্রাইমেট 'বুশ বেবী' এবং 'স্পাইডার মাঙ্কি' এবং 'উলি মাঙ্কি'র মধ্যেও[49]। আবার বিপরীতটাও (মেয়েদের মতো যৌনাঙ্গ) দুর্লভ নয়। পুরুষ ডলফিন এবং তিমিদের ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মতো কোনো 'বহিস্থ পুরুষাঙ্গ' দেখা যায় না। এই জলজ স্তন্যপায়ীদের (Cetaceans) কোনো অণ্ডাশয়ও নেই[50] ।

---

[48] David Crews, Animal Sexuality, Scientific American, January, 1994

[49] Joan Roughgarden, Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People, University of California Press, May 17, 2004।

[50] Joan Roughgarden, পূর্বোক্ত।

চিত্রঃ আফ্রিকার নিশাচর মাংশাসী স্পটেড হায়নাদের নারী সম্প্রদায়ের পুরুষাংগ সদৃশ দীর্ঘ ক্লাইটোরিস দেখে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন।

এ প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারুদের কথাও একটু বলে নেই। মেয়ে ক্যাঙ্গারুরা পেটের বাইরের দিকে লাগানো একটি থলিতে বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে – এ ধরনের ছবি আমরা বই-পত্র, সিনেমায় প্রায়শই দেখি। পেটের আলগা চামড়া দিয়ে তৈরি থলিটা (ইরেজিতে পাউচ) আসলে ক্যাঙ্গারুদের গর্ভাশয়ের বিকল্প; কারণ মেয়ে ক্যাঙ্গারুদের ওই থলিটা অপরিণত বাচ্চাকে এর মধ্যে রেখে ধীরে ধীরে বড় করে তুলে। অপরিণত বাচ্চাকে অন্য প্রাণীর মায়েরা নিজেদের ইউটেরাসে যেভাবে বড় করে, ঠিক সেভাবেই ক্যাঙ্গারুরা বাচ্চাকে নিজের থলিতে প্রায় নয় মাস রেখে বড় করে তুলে। কাজেই এটা হয়ত ভেবে নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, শুধু মেয়ে ক্যাঙ্গারুদের পেটে ওইরকম থলি

থাকার কথা, ছেলে ক্যাঙ্গারুদের নয়। কিন্তু গোল বাঁধালো ইস্টার্ন গ্রে ক্যাঙ্গারুরা। এদের মধ্যে পুরুষাঙ্গ এবং থলির সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। শুধু তাই নয়, ক্রোমোজম বিশ্লেষণ করেও কিন্তু দেখা গেছে এরা স্ত্রী জননকোষ (XX) এবং পুরুষ জননকোষ (XY)-এর সমন্বয়ে অভিনব ধরনের XXY প্যাটার্ন দিয়ে তৈরি[51]। এধরনের উভলিঙ্গ সত্তা এবং অদ্ভুতুরে ক্রোমজোম প্যাটার্ন আছে ফ্রিমার্টিন নামে এক ধরনের গরুজাতীয় প্রাণীর মধ্যেও। এদের ক্রোমজমের প্যাটার্ন XXY, XXX, XXYY, XO থেকে শুরু করে নানা ধরনের বিন্যাস এবং সজ্জা থাকতে পারে। একেক ধরনের বিন্যাস জন্ম দিতে পারে নারী-পুরুষ সমন্বয়ে একেক ধরনের মিশ্রণের। আবার কিছু কিছু প্রাণী আছে যাদের দেহের অর্ধেকটা পুরুষ আর অর্ধেকটা নারী; আরো স্পষ্ট করে বললে- দেহের ডানদিকটা (সাধারণত) থাকে পুরুষের আর বাম দিকটা থাকে মেয়েদের। কিছু প্রজাপতি, কাকড়া, মাকড়শা, পাখি, ভালুক সহ বেশ কিছু স্তন্যপায়ী প্রানীদের মধ্যে বিজ্ঞানীরা এই "অর্ধনারীশ্বর" প্রতিমূর্তির সন্ধান পেয়েছেন। বিজ্ঞানের ভাষায়, যে সমস্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এরকম প্রজাতির জন্ম হতে পারে সেগুলো হলো চিমারিজম (chimerism), মোজাইক (Mosaic) কিংবা গ্যানাড্রোমরফিজম (Gynandromorphism)। এ ব্যাপারটি শুধু পশু-পাখি নয়, বহু মানুষের মধ্যেও লক্ষণীয়। অনেকেই হয়ত লিডিয়া ফেয়ার চাইল্ড এবং ক্যারেন কিগানের কথা মিডিয়ার দৌলতে জেনে ফেলেছেন। এরা মানুষের মধ্যে 'সিমারিজম'এর বাস্তব উদাহরণ। নিউসায়েন্টিস্ট পত্রিকার ২০০৩ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের মানুষের জন্ম হতে পারে, এবং এখন পর্যন্ত অন্তত ৩০-৪০টি এ ধরনের 'ডকুমেন্টেড কেস' আছে[52]।

---

[51] Bruce Bagemihl, Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity, Stonewall Inn Editions, 2000

[52] The Stranger Within, New Scientist vol 180 issue 2421 - 15 November 2003, p 34, On line: http://www.katewerk.com/chimera.html
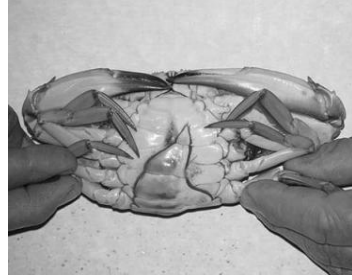
চিত্রঃ বিজ্ঞানীরা প্রজাপতি, কাঁকড়াসহ বহু প্রজাতিতে উভলিঙ্গ সত্তার (গ্যানাড্রোমরফিজম) সন্ধান পেয়েছেন।

শিশু বয়সে সেক্স চেঞ্জই কি উভলিঙ্গ সত্তা থেকে মুক্তির এক মাত্র সমাধান?

কিছুদিন আগেও এমনকি পশ্চিমের হাসপাতালে উভলিঙ্গ মানবশিশু (অর্থাৎ, একই দেহে নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সন্তান) জন্মালে ডাক্তারের একটাই কাজ ছিল– অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের এই 'বার্থ ডিফেক্ট' অবহিত করে 'সেক্স চেঞ্জ' (চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'সেক্স রিএসাইনমেন্ট') অপারেশন[53] করে হয় ছেলে নয়ত মেয়ে বানিয়ে ছেড়ে দেয়া। অভিভাবকেরাও যেহেতু উভলিঙ্গ সন্তান নিয়ে সমাজে ঝামেলা পোহাতে চায়তেন না, তাদের কাছেও এটা একটা সব সময়য়ই খুবই আকর্ষণীয় একটা সমাধান হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু আমেরিকায় ডেভিড রেইমার নামে এক রোগীর বিয়োগান্তক পরিণতি সেক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক সময়ের ধ্যান ধারণা চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকটাই পাল্টে দিয়েছে।

ডেভিড রেইমারকে নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন দুইজন যৌনবিশেষজ্ঞ। এদের একজন হলেন জন মানি, অন্যজন মিল্টন ডায়মন্ড। চিকিৎসাবিদ্যায় এদের বিতর্ক পরিচিত হয়ে আছে 'মানি –ডায়মন্ড'/ 'জন–জোয়ান' বিতর্ক নামে [54]। জন মানি ছিলেন সেসময়কার জগদ্বিখ্যাত যৌন-বিশেষজ্ঞ; অধ্যাপনা করতেন আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষাট এবং সত্তরের দশকে 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' নিয়ে

---

[53] পরিশিষ্টে সেক্সচেঞ্জ অপারেশন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

[54] The Case Of John/Joan; John Colapinto. The Rolling Stone, December 11, 1997; http://www.infocirc.org/rollston.htm

কাজ করার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন সেসময়কার শীর্ষস্থানীয় কাণ্ডারি। তার ধারণা ছিল, মানুষ এ পৃথিবীতে জন্মায় ‘জেন্ডার নিরপেক্ষ’ হিসেবে। জেন্ডার জিনিসটা যেহেতু পুরোটাই সাংস্কৃতিক, এর সাথে শরীরবৃত্তীয় মনস্তত্ত্বের কোনো যোগ নেই। অর্থাৎ জেন্ডার পরিচয় জন্মগত নয়, পুরোপুরি পরিবেশগত। কাজেই জন্মের সময় লৈঙ্গিক জটিলতা সম্পন্ন কোনো শিশুকে যদি খুব কম বয়সেই সেক্স চেঞ্জ অপারেশনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট জেন্ডার প্রদান করা হয়, তাহলে শিশুটির ভবিষ্যত মানসগঠন ওই প্রদত্ত জেন্ডারের সাথে সহজেই খাপ খাইয়ে নিবে কোনো ধরনের অসুবিধা ছাড়াই। তাঁর তত্ত্বের সাপেক্ষে ডঃ মানি ডেভিড রেইমার নামে এক রোগীর দৃষ্টান্ত হাজির করতেন। রেইমারের সত্যিকারের পরিচয় প্রকাশ না করে ‘জন' হিসেবে অভিহিত করে তিনি তাঁর গবেষণাপত্র এবং পাঠ্যবইয়ে বলেছিলেন, জন নামের শিশুটি জীবনের শুরুতেই একটি দুর্ঘটনায় যৌনাঙ্গের একটা বড় অংশ হারিয়ে ফেলে। তাঁর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সেক্স রিএসাইনমেন্ট সার্জারির মাধ্যমে অবশিষ্ট পুরুষাঙ্গটি ছেদন করে তাকে নারীতে রূপান্তরিত করে ফেলা হয়েছিল। অভিভাবকদেরকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল তাকে ‘জোয়ান’ হিসেবে যেন বড় করা হয়। জোয়ানের অভিভাবকেরা জন মানির কথামতো তাইই করে যাচ্ছিলেন। আর ডঃ জন মানিও তাঁর এই সাফল্য ফলাও করে বৈজ্ঞানিক সাময়িকীগুলোতে প্রচার করে যাচ্ছিলেন। মানি তাঁর পেপার আর বইগুলোতে দেখিয়েছিলেন - জোয়ান হিসেবে বড় হতে জনের কোনো অসুবিধেই হচ্ছে না। কাজেই ডঃ মানি তর্কাতীতভাবে সবার সামনে প্রমাণ করেছিলেন – ‘মানুষের জেন্ডার নির্ধারণে প্রকৃতির কোনো প্রভাব নেই, প্রভাব পুরোটুকুই পরিবেশ সঞ্জাত’। জন মানি তার তত্ত্বের ‘প্রমাণের’ জন্য বহু পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছিলেন।
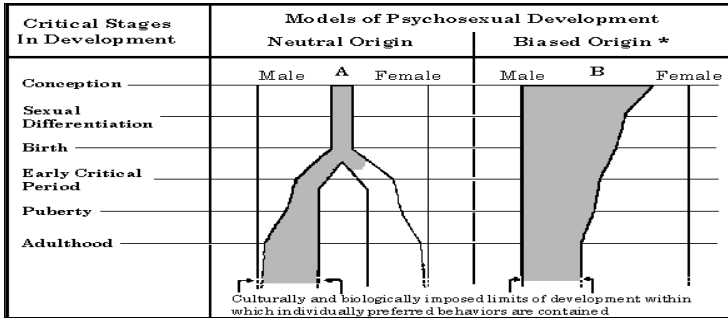
চিত্রঃ বা দিকের গ্রাফটি জন মানির 'জেন্ডার নিরপেক্ষ' মডেল, এবং ডানদিকের মডেলটি ডায়মন্ডের অনিরপেক্ষ বা ঝোঁকযুক্ত মডেল।

তবে সবাই যে জন মানির কথা চোখ বুজে বিশ্বাস করছিলেন তা নয়। এমনি একজন সংশয়ী ছিলেন মিল্টন ডায়মন্ড। তিনি সে সময় কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছিলেন। তিনি এবং তার অধীক্ষক (supervisor) গবেষণার মাধ্যমে দেখালেন যে মানুষের মধ্যকার যৌনতার পার্থক্য আসলে পরিবেশ দ্বারা সূচিত হয় না, সূচিত হয় 'হরমোন' দিয়ে। অর্থাৎ, ডায়মন্ড দাবি করলেন, জন মানি যেভাবে জন্মের সময় 'জেন্ডার নিরপেক্ষ' থাকে বলে মনে করছেন, তা মোটেই ঠিক নয়। ছেলে মেয়ের পার্থক্যসূচিত ব্যাপারগুলো অনেক আগেই গর্ভকালীন (Prenatal) হরমোনের প্রভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। নীচের ছবির মাধ্যমে মানি-ডায়মন্ডের মতাদর্শগত পার্থক্যকে তুলে ধরা যায়। বা দিকের গ্রাফটি মানির 'জেন্ডার নিরপেক্ষ' মডেলকে নির্দেশ করছে, আর ডানদিকের মডেলটি ডায়মন্ডের অনিরপেক্ষ বা ঝোঁকযুক্ত মডেলকে (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

শুধু ডায়মন্ডই নন, তখন ডঃ বার্নাড জুগার্ড নামে আরেক মনোবিজ্ঞানীও তাঁর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা থেকে দেখাচ্ছিলেন যে, ডঃ মানির অনুমান মোটেও সত্য নয়।

কিন্তু ডঃ মানি ডায়মন্ড কিংবা জুগার্ডের গবেষণাকে গ্রাহ্য না করে নিজের প্রচারণা চালিয়েই যাচ্ছিলেন। এমনকি **১৯৮২** সালের পেপারেও তিনি জন/জোয়ান কেসের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন – 'to support the connection that sex roles and sexual identity are basically learned'। জন মানির এই দৃষ্টিভঙ্গি সেসময় প্রগতিশীল মহলে দারুন সমর্থন পেয়েছিল, এমনকি নিউইয়র্ক টাইমসের মতো পত্রিকা প্রায়ই জন মানিকে উদ্ধৃত করে পাঠকদের বিশ্বাস করাতে চাইতো যে আমাদের প্রবৃত্তির সবকিছুই পরিবেশগত, জন্মগত কিছু নেই।

এ সময় বিবিসি থেকে জন-জোয়ান কেসের উপর ফিচার করে একটি ডকুমেন্টরি করার পরিকল্পনা করা হয়। বিবিসির মূল লক্ষ্য আসলে ছিল জন মানির কাজকে তুলে ধরা, এবং সামান্য সময়ের জন্য বিপরীত ধারণা হিসেবে ডায়মন্ডের কথাবার্তা হাল্কাভাবে দেখানো। কিন্তু ফিচার করতে গিয়ে বিবিসির অনুসন্ধিৎসু দল এক অদ্ভুত জিনিস আবিস্কার করলেন। জন মানি তাঁর তত্ত্বের স্বপক্ষে ডেভিড রেইমারের যে কেসকে 'সফল' হিসেবে প্রতিপন্ন করে এসেছেন, সেটা মোটেই সফল নয়। তারা লক্ষ্য করলেন 'ব্রেন্ডা রেইমার' নামে বড় হওয়া মেয়েটি হাটে ছেলেদের মতো, গলার স্বরও মেয়েলী নয়। অভিভাবকের সাথে কথা বলে জানা গেল, মেয়ে হিসেবে বড় হতে গিয়ে তাকে নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কখনই সে মেয়েদের পুতুল পছন্দ করতো না, মেয়েদের ড্রেস দু'চোখে দেখতে পারতো না, এমনকি বাথরুমে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে চাইতো। একটা সময় 'মেয়েলি' সমস্ত কিছু করার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়লো সে। দু তিন বার আত্মহত্যার প্রচেষ্টাও নিয়েছিল সে। জন মানিকে এ বিষয়ে বিবিসি-র সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে জন মানি সাংবাদিকদের সাথে এ নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনা করা থেকে বিরত থাকলেন।

এর পরের ঘটনা আরো নাটকীয়। একটা সময় পর ব্রেন্ডার অভিভাবকেরা তাঁর

মানসিক অস্থিরতা সহ্য না করতে পেরে তাঁর শিশু বয়সে সেক্স চেঞ্জ সংক্রান্ত অপারেশনের কথা বলে দিলেন। সেটা শুনে ব্রেডা বুঝতে পারলো – কেন তাঁর মেয়ে হিসেবে খাপ খাইয়ে নিতে বরাবরই সমস্যা হচ্ছিলো। সে আসলে মানসিকভাবে ছেলেই ছিল–। বাবা মার কাছ থেকে আসল ঘটনা শোনামাত্র সে তৎক্ষণাৎ তাঁর ব্রেডা নাম পরিত্যাগ করে পুনরায় ডেভিড হয়ে গেল। চুল ছেটে ফেলল প্রথমেই। সার্জিকাল অপারেশন করে স্তনের আকার কমিয়ে আনলো। পরে তাঁর অনুরোধে ডাক্তারেরা তাঁর দেহে নতুন করে পুরুষাঙ্গ পুনঃস্থাপিত করলো, এমনকি পরবর্তীতে জেন নামে চমৎকার একটি মেয়ের সাথে পরিণয়সূত্রে পর্যন্ত আবদ্ধ হয়ে পড়লেন ডেভিড।

চিত্রঃ ক) মেয়ে হিসেবে বড় হতে থাকা ডেভিড রেইমার খ) বড় হয়ে পুনরায় ডেভিডে প্রত্যাবর্তন

এদিকে মিল্টন ডায়মন্ড এই ঘটনা লোকমুখে জানতে পেরে তাঁর সাথে একসময় দেখা করেন, এবং সব কিছু নিজের চোখে দেখে হতভম্ব হয়ে যান। তিনি ডেভিডকে অনুরোধ করেন ভবিষ্যত রোগীদের কথা ভেবে তিনি যেন তাঁর ঘটনা মিডিয়ায় প্রকাশ করেন। ডেভিড প্রথমদিকে অস্বীকৃতি জানালেও পরবর্তীতে রাজি হন এবং **১৯৯৭** সালে মিল্টন ডায়মন্ড ডেভিড রেইমারের সুপারভাইজিং সাইক্রিয়াট্রিস্ট কেইথ সিগ্মুন্ডসনের সাথে মিলে একটি পেপার প্রকাশ করলে ডেভিডকে নিয়ে সমস্ত

জারিজুরি জনসম্মুক্ষে ফাঁস হয়ে যায়। ঠিক একই সময়ে বিজ্ঞান লেখক জন কলাপিন্টো রোলিংস্টোন ম্যাগাজিনে ডেভিড রেইমারকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ[55] লিখেন এবং পরবর্তীতে সেটিকে আরো বিবর্ধিত করে একটি বই রচনা করেন – 'As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl' শিরোনামে[56]।

ডেভিডের এই ঘটনা একাডেমিক জগত শুধু নয়, সাধারণ মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ে চিন্তাভাবনা বদলে দারুনভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ডায়মন্ড জন মানি'র তত্ত্বের মূল ভিত্তি পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দেন আর প্রমাণ করেন যে, কারো মনোযৌনতার ক্যানভাস 'নিরপেক্ষ' হয়ে জন্মায় না[57]। শুধু তাই নয়, পুরুষাঙ্গ কিংবা ক্লাইটোরিসের কিংবা আকার, আকৃতি কিংবা 'বিকৃতি' দেখে চিকিৎসকদের তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্তে 'সেক্স চেঞ্জ' রোগীর পরবর্তী জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। তবে অনেকেই মনে করেন যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ে মানি এবং অন্যান্য 'বিশেষজ্ঞ'দের ভুলের পেছনে প্রধান কারণ ছিল বিজ্ঞানমনস্ক যৌনসচেতনতার অভাব। তারা সজ্ঞাতভাবে ধরেই নিয়েছিলেন –

১। প্রকৃতিতে শুধুমাত্র দুইটি সেক্স থাকবে – নারী এবং পুরুষ।

২। প্রকৃতিতে শুধুমাত্র 'হেটারোসেক্সুয়ালিটি' বা বিষমকামীতাই 'স্বাভাবিক'।

৩। জন্ম মূহূর্তেই হার্মাফ্রোডাইট বা মিশ্রিত যৌনতা সম্পন্ন শিশুর জেন্ডার পরিবর্তিত করে দিয়ে মানসিক এবং শারীরিকভাবে সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানুষ তৈরি করা যায়।

ডেভিড রেইমারের বিয়োগান্তক পরিণতি[58] ডাক্তারদের এই সনাতন

---

[55] "The True Story of John/Joan", Colapinto, John, Rolling Stone, 1997, pp. 54-97.

[56] As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl, John Colapinto, Harper Perennial. ISBN 0-06-092959-6. Revised in 2006

[57] According to Dr. Diamond, far from being sexually neutral, the brain was infact prenatally generated. For Details, check, Clinical implications of the organizational and activational effects of hormones, Milton Diamond, Hormones and Behavior 55 (2009) 621–632.

[58] ডেভিড রেইমার পরবর্তীতে ভাইয়ের মৃত্যু, নিজের বিবাহ বিচ্ছেদ এবং চাকরিগত সমস্যাসহ নানা কারণে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যা করেন। ডেভিডের অভিভাবকেরা ডেভিডের এই বিয়োগান্তক পরিণতির জন্য জন মানির সারা জীবনের ভুল চিকিৎসাকে দায়ী করেছেন।

মনমানসিকতাগুলো বদলানোর পেছনে ভীষণভাবে প্রভাব ফেলেছে। আগে মনে করা হতো, মানুষের প্রবৃত্তি কিংবা জেন্ডার গঠনে জিন কিংবা হরমোনের কোনো প্রভাব নেই, পুরোটাই পরিবেশ নির্ভর। কিন্তু রেইমারের ঘটনার পর এই সংক্রান্ত চিন্তাধারা অনেকটাই বদলে গেছে[59]। এর প্রভাব পড়েছে নারীবাদী, সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামীদের আন্দোলনেও। নর্থ আমেরিকান ইন্টারসেক্স সোসাইটি শিশু বয়সে সেক্স চেঞ্জ অপারেশনের তীব্র বিরোধিতা করে মতামত ব্যক্ত করে যে, ডেভিড রেইমারের বিয়োগান্তক দৃষ্টান্ত থেকে সামাজিক জটিলতাগুলো বুঝতে ডাক্তারদের শিক্ষা নেয়া উচিৎ। তাদের মতে, একটি শিশু বড় হয়ে যখন নিজের জেন্ডার আইডেন্টিটি সচেতন হয়ে উঠে, তাঁর আগে 'সেক্স অপারেশন' করা আসলে শিশু নিপীড়নের সমতুল্য। যৌনতা পরিবর্তনের চেয়ে যেটা আরো বেশি দরকার সেটা হলো - নারী-পুরুষের বাইরেও অন্যান্য লৈঙ্গিক পরিচয় এবং যৌনতাগুলো সম্পর্কে জনসচেতনা এবং এগুলোর সামাজিক স্বীকৃতি। এটাই এখন যুগের দাবি।

কেমন আছে বাংলাদেশের উভলিঙ্গ মানবেরা?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা আর কলমজীবী বুদ্ধিজীবীরা যেমন যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে সমকামিতার স্বীকৃতি নিয়ে ভাবিত নয়, তেমনি ভাবিত নয় 'হিজড়া'[60] নামে কথিত বাংলাদেশের উভলিঙ্গ মানবদের সমস্যা কিংবা তাদের অধিকার নিয়ে। উভলিঙ্গ মানবরা সমাজে অপাংক্তেয়, পরিত্যক্ত। বাংলাদেশে উভলিঙ্গ মানবদের সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ বলে অনুমিত হয়[61]। তবে এই সংখ্যাটি নিয়ে বিতর্ক আছে। কারণ অপ্রকাশিত উভলিঙ্গ মানবদের সংখ্যা বের করা কঠিন। আর্থিক সঙ্গতি যে সমস্ত পরিবারে আছে

---

[59] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট: মানব প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিগুলো কি জন্মগত নাকি আচরণগত?

[60] 'হিজড়া' শব্দটি আমাদের দেশে খুব তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয় বলে আমি তাদের বোঝাতে এই বইয়ে 'উভলিঙ্গ মানব' শব্দটি চয়ন করেছি। তারপরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূল শব্দটিই বহাল রেখেছি বাস্তবতা বিবেচনায়। যেমন হিজড়া-পল্লী, হিজড়া সমাজ ইত্যাদি। তবে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, হিজড়াদের সবাই বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে 'উভলিঙ্গ' নাও হতে পারে, অনেকেই হয়ত কেবল মানসিকভাবে রূপান্তরকামী।

[61] হিজড়া: প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালের এক দুর্ভাগা শিকার, রণদীপম বসু, মুক্তমনা।

তাদের অনেকেই বিভিন্ন উপায়ে এই পরিচিতি সযত্নে ঢেকে রাখতে পারেন বলে বাইরের মানুষ তা অনেক সময়ই জানতে পারে না। যে সমস্ত জায়গায় লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে পরিচিতি আর ঢেকে রাখা যায় না কিংবা বাইরে থেকে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তখন তাদের সামনে আর কোনো উপায় খোলা থাকে না। কেবল তখনই তারা 'হিজড়া' হিসেবে সমাজে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হয় এবং পরিবার থেকে বের হয়ে যেতে হয়। রাজধানী ঢাকাতে উভলিঙ্গ মানবের সংখ্যা প্রায় পনের হাজার বলে মনে করা হয়[62]।

কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার হলেও বেঁচে থাকার তাগিদে উভলিঙ্গ মানবরা তৈরি করেছে নিজেদের এক নিজস্ব জগৎ। সেখানেই তারা যায়, যেখানে তাদের নিজস্ব জগতটা নিজেদের মতো করেই সাজায়, অব্যক্ত বেদনাগুলো ভাগাভাগি করে নেয় নিজেদের মধ্যেই। তারা নিজেরা বসবাসের জন্য বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করে হিজড়া পল্লী। 'পল্লী' মানে হচ্ছে আসলে 'হিজড়াদের বস্তি' যেখানে সংঘবদ্ধ হয়ে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করতে পারে উভলিঙ্গ মানবরা। যেখানে তাদের নিজস্ব সমাজ, নিজস্ব নিয়ম, নিজস্ব শাসন পদ্ধতি, সবই ভিন্ন প্রকৃতির। কোথাও কোনো বাড়িতে কোনো উভলিঙ্গ সন্তান জন্মের খবর পেলেই তারা দল বেধে চলে যায়, বাড়ির সামনে নাচ গান করে, তারা শিশুটিকে নিজেদের পল্লীতে নিয়ে আসতে চায়। অনেক সময় পরিণত বয়সেও অনেকে হিজড়া-পল্লীতে যোগদান করে। দেখা গেছে যে অসচ্ছল নিম্নশ্রেণীর পরিবার থেকেই বাইরে বেরিয়ে যাবার প্রবণতা বেশি। তবে যে সময়ই বা যেখান থেকেই যোগদান করুক না কেন, তাদের সাদরে হিজড়া সমাজে অভ্যর্থনা জানানো হয়। অন্যান্য উভলিঙ্গ মানবেরা আগামী দিনের সহচরী তাদের বরণ করে নেয়। এরা নতুন সাথীকে কখনোই ভুলে না, বরং উৎফুল্ল হয় আরেকজন সঙ্গী বাড়ছে বলে। অনেক সময় নানা কারণে পল্লীতে যোগদান করতে ইচ্ছুক রূপান্তরকামী কিংবা উভলিঙ্গ মানবদের পথ দেখিয়ে তারাই নিয়ে যায় তাদের নিজেদের পল্লীতে, শেখায় তাদের নিয়ম কানুন। যে সমস্ত উভলিঙ্গ মানবরা

---

[62] পূর্বোক্ত।

শারীরিকভাবে পুরুষ, কিন্তু মানসিকভাবে নারী স্বভাবের সে সমস্ত উভলিঙ্গ মানবদেরকে পল্লীতে ডাকা হয় ‘অকুয়া’ হিসেবে। অন্য দিকে যে সমস্ত উভলিঙ্গ মানবরা শারীরিকভাবে নারী, কিন্তু মানসিকভাবে পুরুষ, তাদের বলা হয় ‘জেনানা’। এছাড়া সামাজিক প্রথার শিকার হওয়া মনুষ্যসৃষ্ট উভলিঙ্গ মানবদেরকে (এরা আসলে রূপান্তরকামী) বলা হয় ‘চিন্নি’।

হিজড়া বলে কথিত বাংলাদেশের উভলিঙ্গ মানবদের সামাজিক নিয়মকানুনগুলো ভিন্ন প্রকৃতির। রাজধানীর প্রতিটি এলাকায় একজন করে সর্দার থাকে। তারা সাধারণ উভলিঙ্গ মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করে। রাজধানীতে পাঁচ গুরুমার আওতায় প্রায় পনের হাজার 'হিজড়া' রয়েছে। একজন উভলিঙ্গ মানবের কাছে তাঁর রক্তের সম্পর্ক বড় নয়। রক্তের চেয়ে অনেক বড় হচ্ছে গুরু শিষ্য সম্পর্ক। শিষ্যের কাছে গুরুমাই সব। দলে ভিড়ে যাবার পর সে গ্রহণ করে তাঁর পছন্দমতো কোনো বয়স্ক উভলিঙ্গ মানবের শিষ্যত্ব। সর্দারের বা গুরুমার আদেশ ছাড়া কোনো দোকানে কিংবা কারও কাছে হাত পেতে টাকা চাইতে পারবে না। গুরুমাই শিষ্যদের এলাকা ভাগ করে দেয়। প্রতিটি গুরুমার অধীনে ৮/১০টি দল থাকে। একটি দলে ৫/৬ জন থাকে। প্রতিদিন সকালে গুরুর সঙ্গে দেখা করে দিক-নির্দেশনা শুনে প্রতিটি দল টাকা তোলার জন্য বের হয়ে পড়ে। বিকাল পর্যন্ত যে টাকা তোলা হয়। প্রতিটি দল ওই টাকা সর্দারের সামনে এনে রেখে দেয়। গুরু ওই টাকার অর্ধেক নিয়ে নেয় আর বাকি টাকা শিষ্যরা ভাগ করে নেয়। প্রতি সপ্তাহে উভলিঙ্গ মানবদের সালিশি বৈঠক হয়। ১৫/২০ সদস্যের সালিশি বৈঠকে গুরুমার নির্দেশ অমান্যকারী উভলিঙ্গ মানবদের কঠোর শাস্তি পর্যন্ত দেওয়া হয়। বেত দিয়ে পেটানোসহ বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নির্যাতন এবং কয়েক সপ্তাহের জন্য টাকা তোলার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। জরিমানা হয় অপরাধের ধরন অনুযায়ী ৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। দণ্ডিত উভলিঙ্গ মানবকে তাঁর নির্ধারিত এলাকা থেকে তুলে এই টাকা পরিশোধ করতে হয়। গুরুমার এ শাস্তি উভলিঙ্গ শিষ্যরা সাধারণত মাথা

পেতে মেনে নেয়[63]।

উভলিঙ্গত্ব - আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা

উভলিঙ্গ মানবদের ইংরেজিতে অভিহিত করা হয় হার্মফ্রোডাইট হিসেবে। সোজা বাংলায় উভলিঙ্গ। উভলিঙ্গত্বকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় - প্রকৃত উভলিঙ্গত্ব (True-hermaphrodite) এবং অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব (Pseudo-hermaphrodite)। প্রকৃত উভলিঙ্গ হচ্ছে যখন একই শরীরে স্ত্রী এবং পুরুষ যৌনাঙ্গের সহাবস্থান থাকে। তবে প্রকৃতিতে প্রকৃত উভলিঙ্গত্বের সংখ্যা খুবই কম। বেশি দেখা যায় অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব। সাধারণত ছয় ধরনের অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব দৃশ্যমান[64] – কনজেনিটাল এড্রেনাল হাইপারপ্লাসিয়া (CAH), এন্ড্রোজেন ইসেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম (AIS), গোনাডাল ডিসজেনেসিস, হাইপোস্পাডিয়াস, টার্নার সিন্ড্রোম (XO) এবং ক্লাইনেফেল্টার সিন্ড্রোম (XXY)। উভলিঙ্গত্বের বিভিন্ন প্রপঞ্চের উদ্ভব বিভিন্ন কারণে হয়। যেমন, মারিয়ার ক্ষেত্রে হয়েছে এন্ড্রোজেন ইসেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম - শিশু বয়সে তাঁর দেহকোষ এন্ড্রোজেন সনাক্ত করতে পারেনি। এ ছাড়া ক্রোমজমের বৈসাদৃশ্যতার কারণেও উভলিঙ্গত্ব প্রকাশ পেতে পারে। যেমন ক্লেইনফ্লেয়ার সিন্ড্রোমের ক্ষেত্রে পুরুষ শিশু একটি বাড়তি ক্রোমোজম নিয়ে জন্মায় (অর্থাৎ, XY এর বদলে XXY))। টার্নার সিন্ড্রোমে আবার মেয়ে শিশুর একটি এক্স ক্রোমোজম কম থাকে (XO)। এ গুলো ছাড়াও বিশেষ কিছু হরমোনের অভাবে উভলিঙ্গত্ব প্রকাশ পেতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে জীবন ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকলেও অধিকাংশ প্রকরণগুলোই চিকিসাবিজ্ঞানের মাপকাঠিতে ক্ষতিকর কিছু নয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে সত্যিকার জীবন ঝুঁকি তৈরি হয়, সেগুলোতে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী চিকিৎসা করা অপরিহার্য,

---

[63] হিজড়া সম্প্রদায় তৃতীয় লিঙ্গ নয় কেন?, ঝর্না রায়, সাপ্তাহিক ২০০০ বিশেষ প্রতিবেদন, নভেম্বর ১৪, ২০০৮।

[64] সারণী ৩.১ দ্রষ্টব্য।

অন্যগুলো নিতান্তই কসমেটিক। প্রচলিত দৃষ্টিকোণ থেকে উভলিঙ্গত্বকে অস্বাভাবিক বলে মনে করা হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রাণিজগতের একেবারে গোড়ার দিকে কিছু পর্ব হলো - প্রটোজোয়া, পরিফেরা, সিলেনটেরেটা, প্লাটিহেলমিনথিস, অ্যানিলিডা, মোলাস্কা ও কর্ডাটা। এই সমস্ত প্রাণীদের বেশিরভাগই উভলিঙ্গ বা হার্মাফ্রোডাইট (Hermaphrodite), কারণ এদের শরীরে স্ত্রী ও পুরুষ জননাঙ্গের সহবস্থান লক্ষ করা যায়। এদের জন্য উভলিঙ্গত্ব কোনো শারীরিক ত্রুটি নয়, বরং এটি পুরোপুরি 'প্রাকৃতিক'। প্রকৃতিতে এখনো পালমোনেট, স্নেইল এবং স্লাগেদের অধিকাংশই হার্মাফ্রোডাইট। তবে মানুষের সমাজে যেহেতু জেন্ডার ইস্যু খুব প্রবল সেহেতু উভলিঙ্গ মানবদের নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তারপরেও ধ্যান ধারণা সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা পাল্টেছে। পশ্চিমা বিশ্বের বহু জায়গায় ইতোমধ্যেই কেবল নারী-পুরুষ – এই দ্বিলিঙ্গভিত্তিক সমাজ ঘুচিয়ে দিয়ে বহুলিঙ্গভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে [65]। পশ্চিমে শেরিল চেজ, এরিক শেনিগার, জিম সিনক্লায়ারের মতো ইন্টারসেক্স -সেলিব্রিটিরা নিজ পরিচয়ই বাস করেন। ভারতেও 'শবনম মৌসি' নির্বাচিত প্রতিনিধি হতে পেরেছেন। বাংলাদেশেই বা উভলিঙ্গ মানবরা তৃতীয় লিঙ্গ বলে বিবেচিতা হবে না কেন - যুগের দাবির প্রেক্ষাপটে এ অতি স্বাভাবিক প্রশ্ন আজ।

[65] উদাহরণ স্বরূপ, সম্প্রতি জীববিজ্ঞানী Anne Fausto-Sterling 'নারী' এবং 'পুরুষ' এই দুই লিঙ্গের পাশাপাশি *হার্মস* (ট্রু হার্মাফ্রোডাইট), *নার্মস* (মেল সুডো হার্মাফ্রোডাইট) এবং *ফার্মস* (ফিমেল সুডো হার্মাফ্রোডাইট) -এর প্রস্তাব করেছেন। A. Fausto-Sterling (1993). "The Five Sexes: Why male and female are not enough". The Sciences (May/April 1993): 20–24. এ ছাড়া অনলাইনে দেখুন, Two Sexes Are Not Enough, Nova Online.

সারণী ৩.১ *প্রকৃতিতে ঘটা উভলিঙ্গত্বের সবচেয়ে সাধারণ প্রকরণগুলোঃ*

নাম	কারণ	বৈশিষ্ট
কনজেনিটাল এড্রেনাল হাইপারপ্লাসিয়া (CAH)	সাধারনত CYP_{21} জিনের অনুপস্থিতি কিংবা বাধা জনিত কারণে দেহে এড্রোজেনের তারতম্য ঘটে।	মেয়েদের (XX সন্তানের) ক্ষেত্রে 'পুরুষত্ব' বৃদ্ধির লক্ষণ যেমন -দীর্ঘ ভগাঙ্কুর দৃশ্যমান থাকে। কিছু ক্ষেত্রে দেহে লবন স্বল্পতা দেখা দিতে পারে এবং জীবন মৃত্যু ঝুঁকির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সাধারণত স্ট্রেস হরমোন কর্টিসোন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।
এন্ড্রোজেন ইসেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম (AIS)	দেহস্থ কোষে 'এন্ড্রোজেন গ্রাহক'-জনিত সমস্যার ফলে উদ্ভুত।	XY সন্তানের মেয়েলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বয়োসন্ধিকালে স্তন বৃদ্ধি পায়, নারী কাঠামোর আদলে দেহ বৃদ্ধি পায়।
গোনাডাল ডিসজেনেসিস	বিভিন্ন কারণে ঘটে, কিছু ক্ষেত্রে জেনেটিক।	XY সন্তানের জননতন্ত্র সঠিকভাবে বিবর্ধিত হয় না।
হাইপোস্পাডিয়াস	এটিও বিভিন্ন কারণে ঘটে, এর মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হলো এন্ড্রোজেনের তারতম্য।	মুত্রনালীর দ্বার লিঙ্গের মুখে না হয়ে নীচে গঠিত হয়। চরম কিছু ক্ষেত্রে মুত্রদ্বার লিঙ্গের একদম গোড়ায় তৈরি হতে পারে।
টার্নার সিন্ড্রোম	জন্মানোর সময় মেয়ে শিশুর একটি ক্রোমোজম কম থাকে (XO)।	মেয়েদের জননতন্ত্রের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। ডিম্বাশয় সঠিক আকারে গঠিত হয় না। গৌন জননগত বৈশিষ্ট্যগুলো

নাম	কারণ	বৈশিষ্ট
		অনুপস্থিত থাকে। সাধারনত এস্ট্রোজেন এবং অন্যান্য বৃদ্ধিসূচক হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।
ক্লাইনেফেল্টার সিন্ড্রোম	পুরুষ শিশুর একটি X ক্রোমোজম বেশি থাকে (XXY)।	জননতন্ত্রের সমস্যা থেকে বন্ধ্যাত্ব সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি হতে পারে। বয়োসন্ধিকালের পর স্তনের বৃদ্ধি ঘটে। টেস্টোস্টেরোন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

তবে এত কিছুর মধ্যেও আশার কথা যে, বিগত নির্বাচনের (২০০৯) ভোটার তালিকায় এই প্রথম উভলিঙ্গ মানবদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রশংসনীয় একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগ বিবেকবান মানুষের সমর্থনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থারও প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই উদ্যোগ অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবু প্রায় এক লাখ উভলিঙ্গ মানবকে এবারের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বেশ কিছু জটিলতা এখনো রয়ে গেছে বলে জানা যায়। কেননা,

- তাদেরকে তাদের নিজের পরিচয় উভলিঙ্গ মানব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি বা করা যায়নি; হয়েছে ছেলে বা মেয়ের লৈঙ্গিক পরিচয়ে, যেখানে যেটা সুবিধাজনক মনে হয়েছে সেভাবেই। ফলে সবকিছু থেকে বঞ্চিত এই সম্প্রদায়ের আদতে কোনো সামাজিক স্বীকৃতি মেলেনি।

এ ছাড়াও প্রাসঙ্গিক যে ব্যাপারগুলো আছে, তার মধ্যে [66]

- বাংলাদেশে নারীর তুলনায় পুরুষের অনুপাত বেশি হবার কারণে

[66] মাহবুব লীলেন, রণদীপম বসুর প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, সচলয়ায়তন।

মানবশুমারিতে বেশিরভাগ উভলিঙ্গ মানবকেই দেখানো হয় পুরুষ হিসেবে।

- এদের নিয়ে বিদেশ ভ্রমণে নানা জটিলতা। ভিসা ফর্মগুলোতে এদের জন্য কোনো ঘর বরাদ্দ করা হয়নি। এদেরকে হয় পুরুষ কিংবা নারীর ঘরে টিক দিতে হয়, ইমিগ্রেশনে গিয়ে পড়তে হয় অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি।
- বাংলাদেশে এদের জন্য পাসপোর্ট করতে হলেও পরিচয় দিতে হয় পুরুষ অথবা নারী হিসেবে।
- ভাসমান জীবনে অভ্যস্ত হওয়ায় আর স্থায়ী ঠিকানা না থাকায় অনেকেই আবার পাসপোর্টও পায় না।

এই জটিলতার কারণ হচ্ছে 'নারী' 'পুরুষ' ছাড়া আর কোনো লৈঙ্গিক পরিচয় আমাদের সমাজে গ্রহণযোগ্য না হওয়া বা স্বাভাবিক না মনে করার প্রবণতা। আসলে নারী-পুরুষের বাইরে অন্য লিঙ্গগুলোও সমাজে পরিচিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আজ। পশ্চিমে সনাতন লিঙ্গের বাইরে অন্যান্য লৈঙ্গিক স্বীকৃতি অল্প হলেও কিছুটা আদায় করা গেছে। বহু ইন্টারসেক্স সেলিব্রিটি সেখানে নিজ পরিচয়েই সমাজে বাস করেন। এমনকি ভারতেও উভলিঙ্গ সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি (শবনম মৌসি) আমরা দেখেছি। আমাদের দেশে উভলিঙ্গ মানবদের প্রাপ্য অধিকার ও মানুষ হিসেবে পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ আইনের দরকার হয়ে পড়েছে আজ, প্রয়োজন হয়েছে সনাতন লৈঙ্গিক বলয় ভাঙ্গার। এজন্যেই আজ অনিবার্য হয়ে উঠেছে 'হিজড়া'দেরকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার মানবিক দাবিটাও।

কয়েকটি সংগঠন খুব ছোট্ট পরিসরে হলেও বাংলাদেশের উভলিঙ্গ মানব সমাজের জন্য কাজ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এদের মধ্যে বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, সুস্থ জীবন, বাঁধন হিজড়া সংঘ, লাইট হাউস, দিনের আলো ইত্যাদি সংগঠনের নাম উল্লেখ্য। এদের কার্যক্রম ততোটা প্রচারের আলোতে না এলেও এইডস প্রতিরোধসহ কিছু উন্নয়ন কার্যক্রমে এরা যুক্ত রয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু এদের কাজকর্মের পেছনে রাষ্ট্রের কোনো অনুদান নেই। আসলে উভলিঙ্গ মানবদের

সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তা এবং সমাধান করার জন্য কোনো রাষ্ট্রীয় বাজেটও বরাদ্দ নেই। তাই রাষ্ট্রের কাছে উভলিঙ্গ মানবদের প্রধান দাবি আজ, তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি। কেননা এই লিঙ্গস্বীকৃতি না পেলে কোনো মানবাধিকার অর্জনের সুযোগই তারা পাবে না বলে অনেকে মনে করেন। শুধু বাংলাদেশ নয়, সাড়া বিশ্ব জুড়েই এই দাবি কার্যকর হওয়া প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়

বিবর্তনের দৃষ্টিতে সমকামিতা

প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং সমকামিতা

এ অধ্যায়ে আমরা আবারো যৌনপ্রজ এবং অযৌনপ্রজদের গল্পে ফিরে যাব। বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে যৌনপ্রজদের যাবতীয় কাজ-কর্ম যে বিধ্বংসী রকমের অপচয়ী তা আগেই উল্লেখ করেছি (প্রথম অধ্যায় দ্রঃ)। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী প্রফেসর রিচার্ড ডকিন্স এই অপচয়ী প্রক্রিয়ার 'তাণ্ডব' দেখে এক সময় মন্তব্য করেছিলেন, কোনো প্রজাতি যদি একবার কোনোভাবে যৌনপ্রজ থেকে অযৌনপ্রজয় রূপান্তরিত হয়ে যায়, তবে সে প্রজাতিতে আর মনে হয় না সেক্স আবার কখনো ফেরৎ আসবে- 'স্ট্যাটিস্টিকালি ইম্প্রোবাবেল'। ফরাসি ফসিলবিদ লুইস ডোল্লোর অনুকল্প যদি সঠিক হয়ে থাকে (বিবর্তনের কোনো ধারা যদি একবার ভেঙ্গে যায়, তা আর নতুন করে কখনো গজাবে না), তবে অপচয়বপ্রবণ সেক্সের আবার সেই প্রজাতিতে ফেরৎ না আসারই কথা। এখন, যৌনপ্রজদের যৌনতার ব্যাপারটা যদি এত নিকৃষ্ট এবং অপচয়প্রবনই হয়ে থাকে তবে তারা এত ঢালাওভাবে প্রকৃতিতে টিকে আছে কি করে? যৌনপ্রজদের নামে এত গীবৎ গাওয়ার আর অযৌনপ্রজদের এত গুণগান করার পরও দেখা যাচ্ছে প্রকৃতির উচ্চশ্রেণীর জীবজগতের শতকরা নিরানব্বই ভাগই 'অযৌনপ্রজ' নয়, বরং 'যৌনপ্রজ'। কেন এমন হলো? ব্যাপারটা জীববিজ্ঞানীদের কাছে অনেকটা ধাঁধার মতো। ধাঁধার উত্তর বহু গবেষক অনেকভাবে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। কেউ বলেছেন, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে খারাপ দেখালেও হয়ত যৌনতার ব্যাপারটা দলগতভাবে সেরকম খারাপ নয়, বরং টিকে থাকার ক্ষেত্রে

এটি কোনো বাড়তি সুবিধা দেয়। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, সেক্স জিনিসটা জীবজগতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জেনেটিক প্রকারণ (Variation) বা ভিন্নতা তৈরি করে, যা বিবর্তনের অন্যতম চালিকাশক্তি। কথাটার মাঝে যে কিছুটা হলেও সত্যতা নেই তা নয়। এটা ঠিক পার্থেনোজেনেসিস নামধারী অযৌনপ্রজদের প্রাকৃতিক ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় কোনো রকম বংশগত ভিন্নতা বা বৈচিত্র থাকে না, কারণ, এরা কেবলমাত্র মায়ের একই জেনেটিক বৈশিষ্ট নিয়েই জন্মায়। যার ফলে জন্মানো সবাই - ছেলে, নাতি, পুতি, জ্ঞাতিগোষ্ঠী - বংশগতভাবে একই হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে কোনো মিউটেশন না ঘটে এবং তা বংশ পরপম্পরায় চালিত না হয়। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, জেনেটিক প্রকারণ না থাকায়, হঠাৎ করে পরিবেশে কোনো পরিবর্তন ঘটলে তারা এর সাথে সহজে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেমন খাদ্যাভাব বা রোগবালাইয়ের আগমনে এরা নিজেদের সহজে রক্ষা করতে নাও পারতে পারে যা হতে পারে প্রজাতির বিলুপ্তির কারণ। আবার, কখনো কোনো কারণে এদের বংশধারার মধ্যে একবার কোনো ক্ষতিকর মিউটেশনের জন্ম হলে, (জেনেটিক প্রকারণ না থাকায়) তারা এই ক্ষতিকর মিউটেশনটি বহন করে যাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। কিন্তু তারপরও শুধুমাত্র 'জেনেটিক ভ্যারিয়েশনের' ধুয়া তুলে নিতান্ত অপচয়ী এই মাধ্যমের টিকে থাকার ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করাকে আনেক গবেষকই মেনে নিতে পারেননি। সাসেক্স ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক *জন মায়নার্ড স্মিথ* , সেই ১৯৭৮ সালে একটি বই লিখেছিলেন –'ইভল্যুশন অব সেক্স'[67] নামে। সেখানে তিনি সেক্স বা যৌনতার ব্যাপারে জীববিজ্ঞানের চিরায়ত ব্যাখ্যাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন এই বলে যে, শুধু জেনেটিক প্রকারণ যৌনতার টিকে জন্য উপযুক্ত ব্যাখ্যা হতে পারে না। মায়নার্ড স্মিথের মতো ইউনিভার্সিটি অব অ্যারিজোনার বিবর্তনীয় জীববিদ্যার অধ্যাপক রিচার্ড মিকন্ডও মনে করেন, শুধু জেনিটিক প্রকারণ দিয়ে সেক্সকে ব্যাখ্যা করার সনাতন প্রচেষ্টা সঠিক নয়[68]। তাহলে সেক্সের উদ্দেশ্য কী?

---

[67] John Maynard Smith, *The Evolution of Sex*, Cambridge University Press; 1978।

[68] Richard E. Michod, *Eros and Evolution: A Natural Philosophy of Sex*, Perseus Books, 1996

হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অব সেক্স? সত্যি বলতে কি ব্যাপারটি এখনো জীববিজ্ঞানীদের কাছে ধাঁধা হয়েই রয়েছে, কিন্তু সেখানে যাবার আগে সেক্স বা যৌনতার অপচয়ী মনোবৃত্তির নমুনাটা আমরা আরেকবার দেখি, এবার একটু অন্যভাবে।

মানুষের কথাই ধরা যাক। একটি সুস্থ 'যৌনপ্রজ' দম্পতি তাদের দীর্ঘ জীবনে গড়ে প্রতি সপ্তাহে একবার করে তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে সঙ্গম করে থাকে। কিন্তু সে হিসেবে তাদের বাচ্চা কাচ্চার সংখ্যা থাকে নিতান্তই নগন্য – দুইটি কি তিনটি। উন্নত বিশ্বে এখন এমন দম্পতিও আছে যারা বাচ্চা কাচ্চা একেবারেই নেয় না। সে সব বহু দেশেই জন্মহার এখন পড়তির দিকে। বুঝলাম, আজকাল কৃত্রিম জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে সন্তানের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চাশ বা একশ বছর আগের উদাহরণ দেখলেও দেখা যায় যে, কোনো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছাড়া ও কোনো মানব দম্পতির খুব বেশি হলে ১২-১৪টা ছেলেমেয়ে হতো। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার বড় হওয়ার আগেই বিভিন্ন রোগে মৃত্যুবরণ করতো। কাজেই যৌনতার 'একমাত্র' উদ্দেশ্য যদি কেবল পরবর্তী প্রজন্মে 'জিন সঞ্চালন' হয়ে থাকে, তবে বলতেই হয় এই আনাড়ি পদ্ধতিটি নিসন্দেহে একটি 'অকর্মার ধাড়ি'। শুধু মানুষ নয়, হাতি, গরিলা, শূকর, ঘোড়াদের ক্ষেত্রেও লক্ষ করলে দেখা যাবে, তারা যৌন সংসর্গে যে পরিমাণে সময় ও শক্তি ব্যয় করে সে তুলনায় ভবিষ্যত প্রজন্ম তৈরি করতে পারে একদমই কম। বিজ্ঞানীরা বলেন, সারা জীবনের নব্বইভাগ যৌনসংসর্গেই কোনো ধরনের অযাচিত গর্ভধারণের ভয় থাকে না। আর সমকামিতার উদাহরণ হাজির করলে তো সেক্সের মূল উদ্দেশ্যকেই প্রশ্নবিদ্ধ করতে হয়। সেক্সের একমাত্র উদ্দেশ্য যদি কেবল ভবিষ্যত প্রজন্ম টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে 'জিন সঞ্চালন' হয়ে থাকে, তবে সমকামীরা নিঃসন্দেহে "বায়োলজিকাল ডেড এন্ড"-এ। আর অনেক বিবর্তনবাদীরাই সেজন্য খুব যান্ত্রিকভাবে ডারউইনবাদকে সমকামিতার বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। আর এমন 'যুক্তি' উপস্থাপন করা শুরু করেন যখন

মনে হয় তাদের জায়গা ওই ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের সাথে একই জায়গায়! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই 'যান্ত্রিক' ডারউইনবাদীরা সেক্সুয়াল সিলেকশন বা যৌন-নির্বাচনের ধুঁয়া তুলে সমকামিতাকে অস্বীকার করেন, কিংবা বলার চেষ্টা করেন এরা প্রকৃতির এক ধরনের বিচ্যুতি (Aberration)। ভাবখানা যেন, ওই দু'চারটা সমকামীদের নিয়ে অতটা চিন্তা আমাদের না করলেও চলবে!

কিন্তু সত্যই কি তাই? তারা সমকামীদের সংখ্যা 'দু-চারটি' বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেও বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী আলফ্রেড কিন্সের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি দশ জন ব্যক্তির একজন সমকামী[69]। অর্থাৎ, জনসংখ্যার শতকরা প্রায় দশভাগই ওই যান্ত্রিক ডারউইনবাদীদের আভিলাসে ছাই দিয়ে অর্থাৎ জিন সঞ্চালনের 'মহৎ' প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করে টিকে আছে। কিন্সের গবেষণা ছিল সেই চল্লিশের দশকে। সাম্প্রতিককালে (১৯৯০) ম্যাকহটার, স্টেফানি স্যান্ডার্স এবং জুন ম্যাকহোভারের গবেষণা থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে শতকরা প্রায় চোদ্দ ভাগের মতো সমকামী রয়েছে[70]। ১৯৯৩ সালের 'জেনাস রিপোর্ট অন সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার' থেকে জানা যায়, পুরুষদের মধ্যে প্রায় শতকরা নয় ভাগ এবং নারীদের মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ সমকামী রয়েছে[71]। কাজেই সংখ্যা হিসেবে সমকামীদের সংখ্যাটা কিন্তু এ পৃথিবীতে খুব একটা কম নয়। সায়েন্টিফিক আমেরিকান মাইণ্ড-এর ২০০৬ এর একটি ইস্যুতে সমকামীদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার ৩ থেকে ৭ ভাগ উল্লেখ করা হয়েছে[72]। কিন্তু এ কথা বলতেই হবে, পরিসংখ্যানগুলোর পরিসীমা একে অন্যের খুব কাছাকাছি (মোটামুটি ৫-১৫ ভাগ) হলেও কোনোটাই হয়ত প্রকৃত অবস্থা

---

[69] Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin, Alfred C. Kinsey Paul H. Gebhard , *Sexual Behavior in the Human Female, AND Sexual Behavior in the Human Male*, W. B. Saunders Company , 1953
[70] David P. McWhirter, Stephanie A. Sanders and June Machover Reinisch, *Homosexuality/Heterosexuality: Concepts of Sexual Orientation*, Oxford University Press, USA, 1990
[71] Samuel S. Janus and Cynthia L. Janus, *The Janus Report on Sexual Behavior*, Wiley, March 1994.

[72] Robert Epstein, *Do Gays Have a Choice? Science offers a clear and surprising answer to a controversial question*, Scientific American Mind, February 2006।

নির্দেশ করছে না। কারণ সামাজিক একটা চাপ সবসময়ই থেকে যায় সমকামিতাকে নিরুৎসাহিত করে বিষমকামিতাকে উৎসাহিত করার। রক্ষণশীল সমাজে এই চাপ আরো প্রবল। ফলে অনেক সময়ই দেখা যায় সমাজের চাপে একজন প্রকৃত সমকামী বিষমকামী হয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। স্বামী কিংবা বউ বাচ্চা নিয়ে সংসার করছেন। এদের বলা হয় নিভৃত সমকামী (closet gay)। বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত মানবাধিকারকর্মীর কথা জানি যিনি নিভৃত সমকামী হয়ে তাঁর স্ত্রীর সাথে বিবাহিত জীবন যাপন করছেন।

আরেকজন 'বিবাহিত সমকামীর' কথা পড়েছিলাম একটি কেস স্টাডিতে। উনি দিল্লিতে বসবাসরত দন্ত চিকিৎসক। নাম রমেশ মণ্ডল। নিজে সমকামী। কিন্তু পারিবারিক চাপে পড়ে তাঁকে একসময় বিয়ে করতে হয়। কিন্তু স্ত্রীর সাথে তাঁর সম্পর্ক স্রেফ যান্ত্রিক। তিনি তাঁর যৌনচাহিদা নিরসন করেন গোপনে তাঁর এক সমকামী বন্ধুর সাথে। কখন জব্বলপুর, কোলাপুরেও চলে যান। তাঁর স্ত্রী আজও এ ব্যাপারটি জানেন না। সম্পূর্ণ মিথ্যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে রমেশের দাম্পত্য জীবন। আরেক সমকামী ভদ্রলোক নীতিন দেশাই স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে প্রায়ই চলে যান মুম্বই-এর চৌপাট্টির সমুদ্র সৈকতে। কারণ সহজেই অনুমেয়।
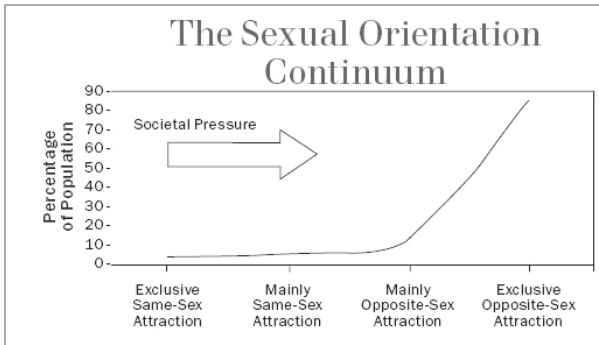
চিত্র: আমাদের সমাজে সবসময়ই একটা চাপ থাকে সমকামীদের নিরুৎসাহিত করে বিষমকামের দিকে ঠেলে দেওয়ার।

অনেক পাঠক হয়ত পাকিস্তানি সমকামী কবি ইফতি নাসিমের[73] ব্যক্তিগত জীবনের সমপ্রেমের মর্মন্তুদ কাহিনী জানেন। কবি নাসিম ছোটবেলা থেকেই তাঁর সমবয়সী একটি ছেলের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তারপর দুই কিশোর কৈশোরকাল অতিক্রম করে বড় হলো। পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে তারা তখন প্রতিষ্ঠিত হবার পথে। তখন স্বাভাবিকভাবেই বাসা থেকে এলো বিয়ের চাপ। এমন কি ইফতির বন্ধুটির বাসার লোকজন মেয়ে দেখে তাঁর বিয়ে পর্যন্ত ঠিক করে ফেলল। ইফতির বন্ধু সেদিন তাঁর সমকামী মানসিকতার কথা বাসায় খুলে বলতে পারেননি। আর তাছাড়া পাকিস্তানি গোড়া মুসলিম সমাজে বড় হবার কারণে কোরানের সমকামীদের প্রতি ঘৃণা-উদ্রেককারী আয়াতগুলোর কথাও তাঁর ভালোই জানা ছিল। ফলে যা হবার তাই হলো। বেশ ধূম ধাম করে বিয়ে হলো ওই বন্ধুর। সে বিয়েতে ইফতিও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং হাজিরও ছিলেন। ফুল শয্যার রাতে বন্ধুর বাড়িতে ইফতি ছিলেন। যে মানুষটির সাথে তাঁর এতদিনের প্রেমের সম্পর্ক, সে মানুষটি সমাজের চাপে পড়ে এক অচেনা নারীর বাহুলগ্ন হবেন, এ চিন্তা তাকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলল – 'আজকে রাতে তুমি অন্যের হবে, ভাবতেই চোখ জলে ভিজে যায়'! সারা রাত তিনি ঘুমাতে পারলেন না। এপাশ ওপাশ করে কাটালেন। শেষ রাতে হঠাৎ দরজায় ধাক্কা। হুড়মুড় করে বিছানায় উঠে বসলেন ইফতি। দরজা খুলে ইফতি দেখলেন- অসহায়ভাবে বাইরে তাঁর বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই নির্বাক।

নাসের আকবর নামে আরেকজন বাংলাদেশী ভদ্রলোকের কথা জানি। উনি আমেরিকার একটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। আমেরিকায় সাফল্যের সাথে আইটিতে কাজ করেছেন প্রায় পনর-বিশ বছর। আমেরিকায় থাকাকালীন সময় প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে প্রকাশ্যে গে ম্যারেজ করে সংবাদের শিরোনাম হন। বিয়ে করেন পল গুস্তাভসন নামের এক মিউজিশিয়ানকে। তাদের এই বিয়ে এবং দাম্পত্য

---

[73] পাকিস্তানী কবি, নরমানসহ অন্যান্য কাব্যপুস্তক প্রণেতা। এই বইয়ের নবম অধ্যায়ে ইফতি নাসিমের কবিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া দেখুন, http://www.glhalloffame.org/index.pl?todo=view_item&item=91

জীবনকে ফিচার করে এলেন লিউয়িন একটি গ্রন্থ রচনা করেন – 'Recognizing Ourselves' নামে। আমাদের "জনপ্রিয় কথাশিল্পী' হুমায়ূন আহমেদ 'হোটেল গ্রেভার ইন'-এ ঐ ভদ্রলোকের উদাহরণ হাজির করে কটাক্ষ করে লিখে দিলেন- হুমম, 'বাংলাদেশীরা ভালোই এগুচ্ছে বটে! সমকামী বিয়ে করা আর প্লে বয় ম্যাগাজিনের মডেল হওয়া ছাড়া বাংলাদেশ আর বিদেশে গিয়ে করতে পেরেছে কী!'

হারুণ নামে (আসল নাম নয়) আমাদের খুব কাছের একজন মুক্তমনা সদস্য সমকামী। খুব ছোটবেলায় পাড়ার এক সমকামী হুজুরের পাল্লায় পড়েন। কিছুদিন পরে সে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এলেও পরে কৈশোরোত্তীর্ণ যুবক বয়সে তাঁর খুব কাছের এক বন্ধুর সাথে সমকামিতার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু বাংলাদেশের পরিবেশ পরিস্থিতি এবং সামাজিক আইন কানুনের কথা বিবেচনা করে তাঁরা এক সাথে থাকতে পারেননি। সেই বন্ধু তারপর তাঁর বোনকে বিয়ে করেন। বিয়ের কারণ হিসেবে বন্ধুটি হারুণকে বোঝান যে, এর ফলে তারা 'বৈধভাবেই' সম্পর্ক তৈরি করে বাসায় থাকতে পারবেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই সম্পর্কও টেকেনি। বন্ধুটি তারপর থেকেই হয়ে ওঠেন চরম প্রতিহিংসাপরায়ণ। হারুণ হয়ে ওঠেন প্রতিহিংসার প্রধানতম টার্গেট। খুনের হুমকি, সম্পত্তি দখলসহ নানা জিঘাংসার স্বীকার হন তিনি। শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগ। আজকে তিনি ইউরোপের একটি দেশে বসবাস করছেন তাঁর এক সমকামী সাথীর সাথে।

শুধু বাংলাদেশ, ভারত বা পাকিস্তানে কেন, খোদ আমেরিকাতেও একই অবস্থা। অনেক পাঠকই হয়ত ২০০৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'মিল্ক' ছবিটি দেখেছেন। ছবিটি আমেরিকার প্রথম নির্বাচিত সমকামী রাজনীতিবিদ হার্ভে মিল্কের (১৯৩০-১৯৭৮) জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত। এ ছবিটি দেখলে বোঝা যায়, কত প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে মিল্ককে সে সময় নির্বাচিত হতে হয়েছিল; কিন্তু নির্বাচিত হতে গিয়ে তিনি আপোস করেননি, সমকামিতাকে 'নিভৃত কক্ষে' আটকে রাখেননি, বরং

মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে একে আন্দোলনের এক হাতিয়ারে পরিণত করেছেন[74]। 'মিল্ক' চরিত্রে অভিনয় করে শন পেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে অস্কার পেয়েছেন। সমাজে ইফতি নাসিম বা মিল্কের মতো লোকদের 'কামিং আউট অব ক্লোসেট' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মানুষের কথা বাদ দেই, প্রাণিজগতেও কিন্তু সমকামীদের সংখ্যা নেহাৎ মন্দ নয়। গবেষকরা অনেকদিন ধরেই এ নিয়ে গবেষণা করছেন। প্রসঙ্গত লু হুজি, কর্ণেল লক, জিউনার, জুরের, হাবাক, উইলিয়ামস, শের জং, জেন গুডোয়ল প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ গবেষণার কথা উল্লেখ করা যায়[75]। এদের গবেষণার মধ্য দিয়ে উঠে আসতে থাকে প্রাণিজগতের নানা অজানা তথ্য। আবার অন্যদিকে অ্যালেন, প্রেনটিস, অ্যালেন লিস, জেমসন, মারফি প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রাণিজগতের যৌনতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছেন। তাদের গবেষণায় প্রাণিজগতে সমকামিতার সুস্পষ্ট নিদর্শন ধরা পরে। সে নিদর্শনগুলোর নমুনা জানতে চাইলে পাঠকেরা জীববিজ্ঞানী ব্রুস ব্যাগমিলের লেখা '*বায়োলজিকাল এক্সুবারেন্স: এনিমেল হোমোসেক্সুয়ালিটি এন্ড ন্যাচারাল ডাইভার্সিটি*[76] বইটি পড়ে দেখতে পারেন। বইটিতে ব্রুস ব্যাগমিল প্রকৃতিতে যে সমস্ত প্রজাতিতে সমকামিতা এবং রূপান্তরকামিতার অস্তিত্ব সনাক্ত করেছেন, সেগুলো নীচে দেওয়া হলো:

সারণী ৪.১ *প্রকৃতিজগতের সমকামী এবং রূপান্তরকামী প্রজাতির আংশিক তালিকা*

Homosexual / Transgender Species					
1.	Acanthocephalan Worms	161. 162.	Gorilla Grant's Gazelle	322.	Przewalski's Horse

---

[74] হার্ভে মিল্ক সম্প্রতি (২০০৯ সালে) মরণোত্তর প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডমে ভূষিত হয়েছেন।

[75] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, সমপ্রেম, পূর্বোক্ত।

[76] Bruce Bagemihl, *Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity*, Stonewall Inn Editions, 2000

2. Acorn Woodpecker
3. Adelie Penguin
4. African Buffalo
5. African Elephant
6. Agile Wallaby
7. Alfalfa Weevil
8. Amazon Molly
9. Amazon River Dolphin
10. American Bison
11. Anna's Humminbird
12. Anole sp.
13. Aoudad
14. Aperea
15. Appalachian Woodland Salamander
16. Asiatic Elephant
17. Asiatic Mouflon
18. Atlantic Spotted Dolphin
19. Australian Parasitic Wasp sp.
20. Australian Sea Lion
21. Australian Shelduck
22. Aztec Parakeet
23. Bank Swallow
24. Barasingha
25. Barbary Sheep
26. Barn Owl
27. Bean Weevil sp.
28. Bedbug and other Bug spp.
29. Beluga
30. Bangalese Finch (Domestic)
31. Bezoar
32. Bharal
33. Bicolored Antbird
34. Bighorn Sheep
35. Black Bear
36. Black-billed Magpie
37. Blackbuck
38. Black-crowned Night Heron
163. Grape Berry Moth
164. Grape Borer
165. Gray-breasted Jay
166. Gray-capped Social Weaver
167. Gray-headed Flying Fox
168. Gray Heron
169. Grayling
170. Gray Seal
171. Gray Squirrel
172. Gray Whale
173. Great Cormorant
174. Greater Bird of Paradise
175. Greater Rhea
176. Green Anole
177. Green Lacewing
178. Green Sandpiper
179. Greenshank
180. Green Swordtail
181. Greylag Goose
182. Griffon Vulture
183. Grizzly Bear
184. Guiana Leaffish
185. Guianan Cock-of-the-Rock
186. Guillemot
187. Guinea Pig (Domestic)
188. Hamadryas Baboon
189. Hammerhead
190. Hamster (Domestic)
191. Hanuman Lanur
192. Harbor Porpoise
193. Harbor Seal
194. Harvest Spider sp.
195. Hawaiin Orb-Weaver
196. Hen Flea
197. Herring Gull
198. Himalayan
323. Pukeko
324. Puku
325. Purple Swamphen
326. Pygmy Chimpanzee
327. Queen Butterfly
328. Quokka
329. Rabbit (Domestic)
330. Raccoon Dog
331. Raggiana's Bird of Paradise
332. Rat (Domestic)
333. Raven
334. Razorbill
335. Red Ant sp.
336. Red-backed Shrike
337. Red Bishop Bird
338. Red Deer
339. Red Diamond Rattlesnake
340. Red-faced Lovebird
341. Red Flour Beetle
342. Red Fox
343. Red Kangaroo
344. Red-necked Wallaby
345. Redshank
346. Red-shouldered Widowbird
347. Red Squirrel
348. Red-tailed Skink
349. Reeve's Muntjac
350. Regent Bowerbird
351. Reindeer
352. Reindeer Warble Fly
353. Rhesus Macaque
354. Right Whale
355. Ring-billed Gull
356. Ring Dove
357. Rock Cavy

No.	Name
39.	Black-footed Rock Wallaby
40.	Black-headed Gull
41.	Black-rumped Flameback
42.	Black-spotted Frog
43.	Black Stilt
44.	Blackstripe Topminnow
45.	Black Swan
46.	Black-tailed Deer
47.	Black-winged Stilt
48.	Blister Beetle spp.
49.	Blowfly
50.	Blue-backed Manakin
51.	Blue-bellied Roller
52.	Bluegill Sunfish
53.	Blue Sheep
54.	Blue Tit
55.	Blue-winged Teal
56.	Bonnet Macaque
57.	Bonobo
58.	Boto
59.	Bottlenose Dolphin
60.	Bowhead Whale
61.	Box Crab
62.	Bridled Dolphin
63.	Broad-headed Skink
64.	Broadwinged Damselfly sp.
65.	Brown Bear
66.	Brown Capuchin
67.	Brown-headed Cowbird
68.	Brown Long-eared Bat
69.	Brown Rat
70.	Budgeriger (Domestic)
71.	Buff-breasted Sandpiper
72.	Rush Dog
73.	Cabbage (Small)
	Tahr
199.	Hoary-headed Grebe
200.	Hoary Marmot
201.	Hooded Warbler
202.	Horse (Domestic)
203.	House Fly
204.	House Sparrow
205.	Houting Whitefish
206.	Humboldt Penguin
207.	Ichneumon Wasp sp.
208.	Incirrate Octopus spp.
209.	Inagua Curlytail Lizard
210.	Indian Fruit Bat
211.	Indian Mantjac
212.	Indian Rhinoceros
213.	Ivory Gull
214.	Jackdaw
215.	Jamaican Giant Anole
216.	Japanese Scarab Beetle
217.	Japanese Macaque
218.	Javelina
219.	Jewel Fish
220.	Jumping Spider sp.
221.	Kangaroo Rat
222.	Kestrel
223.	Killer Whale
224.	King Penquin
225.	Kittiwake
226.	Koala
227.	Kob
228.	Larch Bud Moth
229.	Laredo Striped Whiptail Lizard
230.	Larga Seal
231.	Largehead Anole
232.	Large Milkweed
358.	Rock Dove
359.	Rodrigues Fruit Bat
360.	Roe Deer
361.	Roseate Cockatoo
362.	Roseate Tern
363.	Rosechafer
364.	Rose-ringed Parakeet
365.	Rove Beetle spp.
366.	Ruff
367.	Ruffed Grouse
368.	Rufous Bettong
369.	Rufous-naped Tamarin
370.	Rufous Rat Kangaroo
371.	Saddle-back Tamarin
372.	Sage Grouse
373.	Salmon spp.
374.	San Blas Jay
375.	Sand Martin
376.	Satin Bowerbird
377.	Savanna Baboon
378.	Scarab Beetle, Melolonthine
379.	Scarlet Ibis
380.	Scottish Crossbill
381.	Screwworm Fly
382.	Sea Otter
383.	Senegal Parrot
384.	Serotine Bat
385.	Sharp-tailed Sparrow
386.	Sheep (Domestic)
387.	Siamang
388.	Side-blotched Lizard
389.	Sika Deer
390.	Silkworm Moth
391.	Silver Gull
392.	Silvery Grebe
393.	Slender Tree Shrew
394.	Snow Goose
395.	Sociable

White
74. Calfbird
75. California Gull
76. Canada Goose
77. Canary-winged Parakeet
78. Caribou
79. Caspian Tern
80. Cat (Domestic)
81. Cattle (Domestic)
82. Cattle Egret
83. Chaffinch
84. Char
85. Checkered Whiptail Lizard
86. Checkerspot Butterfly
87. Cheetah
88. Chicken (Domestic)
89. Chihuahuan Spotted Whiptail Lizard
90. Chiloe Wigeon
91. Cliff Swallow
92. Clubtail Dragonfly spp.
93. Cockroach spp.
94. Collared Peccary
95. Cammerson's Dolphin
96. Common Ameiva
97. Common Brushtail Possum
98. Common Chimpanzee
99. Common Dolphin
100. Common Garter Snake
101. Common Gull
102. Common Marmoset
103. Common Murre
104. Common Pipistrelle
105. Common Racoon
106. Common Shelduck
107. Common

Bug
233. Large White
234. Laughing Gull
235. Laysan Albatross
236. Least Chipmunk
237. Least Darter
238. Lechwe
239. Lesser Bushbaby
240. Lesser Flamingo
241. Lesser Scaup Duck
242. Lion
243. Lion-tailed Macaque
244. Lion Tamarin
245. Little Blue Heron
246. Little Brown Bat
247. Little Egret
248. Livingstone's Fruit Bat
249. Long-eared Hedgehog
250. Long-footed Tree Shrew
251. Long-legged Fly spp.
252. Long-tailed Hermit Hummingbird
253. Mallard Duck
254. Markhor
255. Marten
256. Masked Lovebird
257. Matschie's Tree Kangaroo
258. Mazarine Blue
259. Mealy Amazon Parrot
260. Mediterranean Fruit Fly
261. Mew Gull
262. Mexican Jay
263. Mexican White
264. Midge sp.
265. Migratory

Weaver
396. Sooty Mangabey
397. Southeastern Blueberry Bee
398. Southern Green Stink Bug
399. Southern Masked Chafer
400. Southern One-Year Canegrub
401. Southern Platyfish
402. Speckled Rattlesnake
403. Sperm Whale
404. Spinifex Hopping Mouse
405. Spinner Dolphin
406. Spotted Hyena
407. Spotted Seal
408. Spreadwinged Damselfly spp.
409. Spruce Budworm Moth
410. Squirrel Monkey
411. Stable Fly sp.
412. Stag Beetle spp.
413. Steller's Sea Eagle
414. Striped Dolphin
415. Stuart's Marsupial Mouse
416. Stumptail Macaque
417. Superb Lyrebird
418. Swallow-tailed Manakin
419. Swamp Deer
420. Swamp Wallaby
421. Takhi
422. Talapoin
423. Tammar Wallaby
424. Tasmanian Devil
425. Tasmanian

Skimmer Dragonfly spp.
108. Common Tree Shrew
109. Cotton-top Tamarin
110. Crab-eating Macaque
111. Crane spp.
112. Creeping Water Bug sp.
113. Crested Black Macaque
114. Cuban Green Anole
115. Cui
116. Dall's Sheep
117. Daubenton's Bat
118. Desert Grassland Whiptail Lizard
119. Desert Tortoise
120. Digger Bee
121. Dog (Domestic)
122. Doria's Tree Kangaroo
123. Dragonfly spp.
124. Dugong
125. Dusky Moorhen
126. Dwarf Cavy
127. Dwarf Mongoose
128. Eastern Bluebird
129. Eastern Cottontail Rabbit
130. Eastern Giant Ichneumon
131. Eastern Gray Kangaroo
132. Egyptian Goose
133. Elegant Parrot
134. Elk
135. Emu
136. Eucalyptus Longhorned Borer
137. Euro
138. European Bison
139. European Bitterling
140. European Jay
141. European Shag
142. Fallow Deer
143. False Killer Whale

Locust
266. Mite sp.
267. Moco
268. Mohol Galago
269. Monarch Butterfly
270. Moor Macaque
271. Moose
272. Mountain Dusky Salamander
273. Mountain Goat
274. Mountain Tree Shrew
275. Mountain Zebra
276. Mourning Gecko
277. Mouse (Domestic)
278. Mouthbreeding Fish sp.
279. Mule Deer
280. Mustached Tamarin
281. Musk Duck
282. Musk-ox
283. Mute Swan
284. Narrow-winged Damselfly spp.
285. Natterer's Bat
286. New Zealand Sea Lion
287. Nilgiri Langur
288. Noctule
289. North American Porcupine
290. Northern Elephant Seal
291. Northern Fur Seal
292. Northern Quoll
293. Ocellated Antbird
294. Ocher-bellied Flycatcher
295. Olympic Marmot
296. Orange Bishop Bird
297. Orange-footed

Native Hen
426. Tasmanian Rat Kangaroo
427. Tengger Desert Toad
428. Ten-spined Stickleback
429. Thinhorn Sheep
430. Thomson's Gazelle
431. Three-spined Stickleback
432. Tonkean Macaque
433. Tree Swallow
434. Trumpeter Swan
435. Tsetse Fly
436. Tucuxi
437. Turkey (Domestic)
438. Urial
439. Vampire Bat
440. Verreaux's Sifaka
441. Vervet
442. Victoria's Riflebird
443. Vicuna
444. Walrus
445. Wapiti
446. Warthog
447. Water Boatman Bug
448. Waterbuck
449. Water Buffalo
450. Water Moccasin
451. Water Strider spp.
452. Wattled Starling
453. Weeper Capuchin
454. Western Gray Kangaroo
455. Western Gull
456. Western Rattlesnake
457. West Indian Manatee

144.	Fat-tailed Dunnart		Parakeet	458.	Western Banded Gecko
145.	Fence Lizard	298.	Orangutan	459.	Whiptail Lizard spp.
146.	Field Cricket sp.	299.	Orca	460.	Whiptail Wallaby
147.	Fin Whale	300.	Ornate Lorikeet	461.	White-faced Capuchin
148.	Five-lined Skink	301.	Ostrich	462.	White-fronted Amazon Parrot
149.	Flamingo	302.	Oystercatcher	463.	White-fronted Capuchin
150.	Fruit Fly spp.	303.	Pacific Striped Dolphin	464.	White-handed Gibbon
151.	Galah	304.	Parsnip Leaf Miner	465.	White-lipped Peccary
152.	Gelada Baboon	305.	Patas Monkey	466.	White Stork
153.	Gentoo Penguin	306.	Peach-faced Lovebird	467.	White-tailed Deer
154.	Giraffe	307.	Pere David's Deer	468.	Wild Cavy
155.	Glasswing Butterfly	308.	Pied Flycatcher	469.	Wild Goat
156.	Goat (Domestic)	309.	Pied Kingfisher	470.	Wisent
157.	Golden Bishop Bird	310.	Pig (Domestic)	471.	Wolf
158.	Golden Monkey	311.	Pigeon (Domestic)	472.	Wood Duck
159.	Golden Plover	312.	Pig-tailed Macaque	473.	Wood Turtle
160.	Gopher (Pine) Snake	313.	Plains Zebra	474.	Yellow-backed (Chattering) Lorikeet
		314.	Plateau Striped Whiptail Lizard	475.	Yello-footed Rock Wallaby
		315.	Polar Bear	476.	Yellow-rumped Cacique
		316.	Pomace Fly	477.	Yellow-toothed Cavy
		317.	Powerful Owl	478.	Zebra Finch (Domestic)
		318.	Prea		
		319.	Pretty-faced Wallaby		
		320.	Proboscis Monkey		
		321.	Pronghorn		

ভেড়ার জীবন যাত্রা খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা সমকামী প্রবণতার প্রচুর উদাহরণ পেয়েছেন। তবে মেষপালকেরা ভেড়ার এই প্রবণতার কথা অনেক আগে থেকেই জানতেন। এই ধরনের ভেড়ার পাল সবসময়ই মেষপালকদের জন্য হতাশা বয়ে আনে। কারণ এরা বংশবিস্তারে কোনো সাহায্য করে না। তারা প্রথম থেকেই ভেড়ীদের প্রতি থাকে একেবারেই অনাগ্রহী। এদের আগ্রহের পুরোটা জুড়েই থাকে আরেকটি পুরুষ ভেড়া বা মেষ। অরেগন হেলথ এন্ড সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের

চার্লস রসেলির মতে শতকরা ৮ ভাগ ভেড়া এরকম সমকামী প্রবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে[77]। এই ধরনের সমকামী ভেড়া সঙ্গমের সময় আরেকটি পুরুষ ভেড়ার দিকে অগ্রসর হয় তাদের আদর সোহাগ জানাতে থাকে আর যৌনাঙ্গ শুঁকতে থাকে। অবশেষে পেছন দিক থেকে ভেড়ার উপর আরোহন করে ভেড়ার উলের উপর বীর্য নিক্ষেপ করে (এরা কখনোই পায়ুকামে প্রবৃত্ত হয় না)। চার্লস রসেলি এ সমস্ত ভেড়ার মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে দেখান যে এদের মস্তিষ্কের কিছু অংশের আকার 'স্বাভাবিক' ভেড়াদের থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন। তিনি 'সেক্সুয়ালি ডাইমরফিক নিউক্লিয়াস' বলে মাথার হাইপোথ্যালমাসের একটা অংশে উল্লেখ করার মতো পার্থক্য পান[78]। একই ধরনের পার্থক্য আরেক গবেষক সিমন লেভি লক্ষ করেছেন সমকামী মানুষের মস্তিষ্কেও (সিমন লেভির গবেষণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে)।

ভেড়া ছাড়াও সমকামী আচরণ লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রেও। এদের মধ্যে হাতি, সিংহ, চিতাবাঘ, হায়না, ক্যাঙ্গারু, হরিণ, জিরাফ, আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার মোষ, জেব্রা উল্লেখযোগ্য। পাখিদের মধ্যে পেঙ্গুইন, ধুসর পাতিহাঁস, কানাডা পাতিহাঁস, কালো রজহাঁস, বরফী পাতিহাঁস, মিউট রাজহাঁস, শকুন সহ অনেক প্রাণীর মধ্যে সমকামিতার সুস্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। সরীসৃপের মধ্যে সমকামিতার আলামত আছে কমন অ্যামিভা, অ্যানোল, গিরগিটি, স্কিনক, গেকো মাউরিং, কচ্ছপ, রাটেল স্নেক প্রভৃতিতে। সমকামিতার অস্তিত্ব আছে বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাঙ, স্যালাম্যান্ডারের মতো উভচর এবং বিভিন্ন মাছেও।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন প্রাইমেট বর্গের মধ্যে সাধারণ শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে প্রজননহীন

---

[77] John Schwartz, Of Gay Sheep, Modern Science and Bad Publicity, NY Times, January 25, 2007

[78] Roselli C, Stadelman H, Reeve R, Bishop C, Stormshak F (2007). "The ovine sexually dimorphic nucleus of the medial preoptic area is organized prenatally by testosterone". Endocrinology 148 (9): 4450–4457; এছাড়া দেখুন, Faye Flam, The Score: How The Quest For Sex Has Shaped The Modern Man, Avery, 2008

যৌনতা (non-reproductive sex) খুবই প্রকট। মানুষের মতোই তারা কেবল 'জিন সঞ্চালনের' জন্য সঙ্গম করে না, সঙ্গম করে আনন্দের জন্যও। কাজেই তাদের মধ্যে মুখ-মৈথুন, পায়ু মৈথুন থেকে শুরু করে চুম্বন, দংশন সব কিছুই প্রবলভাবে লক্ষ্যনীয়। তারা খুব সচেতনভাবেই সমকাম, উভকাম এবং বিষমকামে লিপ্ত হয়। শিম্পাঞ্জীদের আরেকটি প্রজাতি বনোবো শিম্পাঞ্জী (প্রচলিত নাম পিগমী শিম্পাঞ্জী)দের মধ্যে সমকামী প্রবণতা এতই বেশি যে, ব্যাগমিল বলেন, এই প্রজাতিটির ক্ষেত্রে 'সমকামী যৌনসংসর্গ, বিষমকামিতার মতোই স্বাভাবিক। এককেটি গোত্রে এমনকি শতকরা ৩০ ভাগ সদস্য সমকামিতা এবং উভকামিতার সাথে যুক্ত থাকে এবং দেখা গেছে ৭৫ ভাগ যৌনসংসর্গই প্রজননহীন। এদের মধ্যে প্রবলভাবে আছে নারী সমকামিতাও। এমনকি শিশুদেরও তারা রেহাই দেয় না[79]। কেউ যদি এ ধরনের সমকামে অনীহা প্রকাশ করে তবে, তাহলে বনোবো সমাজে সে 'অচ্ছুৎ' বলে পরিগণিত হয়, অন্যান্য সদস্যরা তাকে এড়িয়ে চলে[80]। বিভিন্ন রকমের সমকামী এবং উভকামী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে গরিলা, ওরাং-ওটান, গিবন, সিয়ামাং, লঙ্গুর হনুমান, নীলগিরি লঙ্গুর, স্বর্ণ হনুমান, প্রবোসিক্স মাঙ্কি, সাভানা বেবুন ইত্যাদি প্রাইমেটদের মধ্যেও।

চিত্র : বনোবো শিম্পাঞ্জীদের মধ্যে সমকামী প্রবণতা খুবই বেশি। বিজ্ঞানীরা এরকম ৪৫০টিরও বেশি প্রজাতিতে সমকামিতার উপস্থিতি লক্ষ করেছেন।

---

[79] Frans de Waal, author of Bonobo: The Forgotten Ape, calls the bonobo species a "make love, not war" primate.

[80] Faye Flam, পূর্বোক্ত

১৯৭২ সালে লিন্ডা উলফি নামের এর তরুণ গবেষক ল্যাবরেটরিতে জাপানি ম্যাকুয়ি নামের একধরনের প্রাইমেট নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন, তাদের মধ্যে নারী সমকামিতার ব্যাপারটি প্রকটভাবে দৃশ্যমান। লিন্ডা ভাবলেন নিশ্চয়ই ল্যাবরেটরির বন্দি পরিবেশে থাকার ফলে তাদের যৌনতার পরিবর্তন ঘটেছে (জেলখানায় থাকার ফলে আসামীদের মধ্যে যে ধরনের সমকামী মনোবৃত্তি জেগে উঠে অনেকটা সেরকম)। তিনি আসল ব্যাপারটি বুঝতে জাপানে গিয়ে বন্য পরিবেশে ম্যাকুয়ি পর্যবেক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। গিয়ে তিনি কী দেখলেন? সেখানেও নারী সমকামিতা রাজত্ব করে চলেছে। শুধু লিন্ডা উলফি নয় পল ভ্যাসি নামে আরেক গবেষকও জাপানি ম্যাকুয়িদের উপর দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন। তিনিও ম্যাকুয়িদের মধ্যকার সমকামী প্রবণতা অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন এবং বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। অনেক গবেষক আগে ভেবেছিলেন, ম্যাকুয়ি সমাজে নারীতে-নারীতে প্রেম আসলে পুরুষদের আকর্ষণের জন্য। নিশ্চয়ই চোখের সামনে এই 'লেসবিয়ন পর্ন' দেখে পুরুষ ম্যাকুয়িরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং নারী ম্যাকুয়িদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। কিন্তু পল ভ্যাসি তাঁর গবেষণায় পরিষ্কার ভাবেই দেখালেন নারী ম্যাকুয়িরা যখন সমকামে মত্ত থাকে তখন তারা কোনো পুরুষ ম্যাকুয়ির প্রতি কোনো রকম আগ্রহই দেখায় না। তাদের জন্য সমকামিতার ব্যাপারটি 'হট বাথ'[81] নেওয়ার মতন কেবলই আনন্দের।

যৌনতার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটি যেহেতু বিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি, সেহেতু বহু বিজ্ঞানীই প্রাণিজগতের মাঝে বিদ্যমান সমকামিতাকে প্রথমদিকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেননি। তারা যে প্রকৃতিতে সমকামিতা দেখেননি তা নয়, অনেকবারই দেখেছেন – কিন্তু অবধারিতভাবে ভেবে নিয়েছিলেন এটি বিবর্তনের বিচ্যুতি, এ নিয়ে গবেষণার কোনো দরকার নেই। যেমন, ল্যারিএস গিস্ট নামের এক বিজ্ঞানী ক্যানাডিয়ান রকি পর্বতমালায় পাহাড়ি মেষদের মধ্যকার সমকামিতা পর্যবেক্ষণ করেও

---

[81] হট বাথের ব্যাপারটি কিন্তু উপমা বা রূপক নয়। এই ম্যাকুয়িগুলো উষ্ণ প্রস্রবণে গা ডুবিয়ে আরাম করতে বড়ই পছন্দ করে।

সেটা গুরুত্ব দিয়ে গবেষণায় লিপিবদ্ধ করেননি। আজ তিনি সেই 'ব্যর্থতার' জন্য প্রকাশ্যেই দুঃখ প্রকাশ করেন। আসলে কিন্তু ব্রুস ব্যাগমিলের 'বায়োলজিকাল এক্সুবেরেন্স' বইটি প্রকাশিত হবার পর বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা অনেকটাই বদলে গেছে। তারা সমকামিতাকে গুরুত্ব দিয়েই জীববিজ্ঞানে গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেন। ব্রুস ব্যাগমিলের গবেষণার পর অন্যান্য গবেষকেরাও বিষয়টি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে গেছেন। বিজ্ঞানীরা এখন মনে করেন, পৃথিবীতে এমন কোনো প্রজাতি নেই যেখানে সমকামিতা দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে জীববিজ্ঞানী পিটার বকম্যানের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য [82] -

> "No species has been found in which homosexual behaviour has not been shown to exist, with the exception of species that never have sex at all, such as sea urchins and aphids. Moreover, a part of the animal kingdom is hermaphroditic, truly bisexual. For them, homosexuality is not an issue."

২০০৬ সালের হিসেব অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা প্রাণিজগতে ১৫০০'রও বেশি প্রজাতিতে সমকামিতার সন্ধান পেয়েছেন[83]। আর মেরুদণ্ডী প্রাণীর তিনশ'রও বেশি প্রজাতিতে সমকামিতার অস্তিত্ব খুব ভালোভাবেই নথিবদ্ধ[84]। সংখ্যাগুলো কিন্তু প্রতিদিনই বাড়ছে [85]।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে সম্প্রতি 'Out in Nature: Homosexual Behavior in the Animal Kingdom' নামের একটি ডকুমেন্ট্রিতে প্রাণিজগতের অসংখ্য সমকামিতার উদাহরণ তুলে ধরা হয়[86]। ব্রুস ব্যাগমিল এবং জোয়ান রাফগার্ডেনের কাজের উপর

---

[82] a b c News-medical.net (2006)

[83] 1500 animal species practice homosexuality, www.news-medical.net/news/2006/10/23/20718.aspx

[84] Joan Roughgarden, The Genial Gene: Deconstructing Darwinian Selfishness, University of California Press, 2009

[85] এই বইয়ের পরিশিষ্টে উইকিপেডিয়া থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেয়া তালিকা লিপিবদ্ধ করা আছে।

[86] ইউটিউবে পুরো ফিল্মটি ছয় পর্বে রাখা আছে। http://www.youtube.com/watch? v=LFeXwKnCUNI

ভিত্তি করে অসলোর ন্যাচারাল হিস্ট্রি যাদুঘরে 'এগেইনস্ট নেচার?' নামে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রদর্শনীটি ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়ে আগস্টের ২০০৭ সাল পর্যন্ত চলে। এতে জীবজগতের সমকামিতা, উভকামিতা সহ প্রকৃতির নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় উদাহরণ হাজির করে ব্যাতিক্রমধর্মী উপস্থাপনার ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনীটি সাড়া বছর জুড়ে দেশ বিদেশের অসংখ্য দর্শকের আগ্রহ এবং মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়[87]।

চিত্রঃ নরওয়ের অসলো ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউসিয়ামে 'এগেইনস্ট নেচার?' নামে একটি প্রদর্শনী দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে।

এত কিছুর পরও সমকামিতার পুরো ব্যাপারটিকে 'প্রাকৃতিক' বলে মেনে নিতে অনেকেরই প্রবল অনীহা আছে। প্রানীজগতের অসংখ্য উদাহরণ হাজির করা হলেও মানুষকে এগুলো থেকে আলাদা রাখতেই পছন্দ করেন সবাই। কিন্তু যতই আলাদা করে রাখি না কেন, আমরা 'সৃষ্টির সেরা জীব' বলে কথিত গর্বিত মানুষেরাও কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই প্রকৃতিরই (আরো ভালোভাবে বললে প্রাইমেটদের) অংশ। ইংল্যান্ডের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবিন ডানবার এ প্রসঙ্গে বলেন -

[87] Oslo gay animal show draws crowds, BBC News, Thursday, 19 October 2006.

> সব কথার শেষ কথা হলো, অন্যান্য প্রাইমেটদের মধ্যে বিশেষতঃ এপদের মধ্যে কোনো কিছু ঘটলে, এর একটা বিবর্তনীয় ধারাবাহিকতা হয়ত মানুষের মধ্যেও থাকবে বলে ভেবে নিলে হয়ত সেটা অযৌক্তিক হবে না।

আমরা বনোবো শিম্পাঞ্জী কিংবা জাপানি ম্যাকাকুয়ি প্রজাতিতে সমকামিতার প্রকাশ দেখেছি। বিবর্তনের চোখ দিয়ে দেখতে শুরু করলে মানুষের অবস্থানও কিন্তু হবে এদের খুব কাছেপিঠেই। তাহলে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সমকামিতার কি ব্যাখ্যা? ওয়েল - হয়ত আসলে কোনো গূঢ় কারণ নেই। ম্যাকুয়ি প্রাইমেটদের কাছে ব্যাপারটা যেমন ‘স্রেফ আনন্দের’[88], মানুষদের মধ্যেও তা যে সেরকম কিছু নয়, তা কে বলবে? আর আনন্দের ব্যাপারটা অনেকাংশেই মুখ্য বলেই মানব সমাজেও প্রজননহীন যৌনতা খুব ভালোভাবেই দৃশ্যমান[89]। অবাঞ্ছিত গর্ভকে দূরে রাখতে মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণেরও কৃত্রিম নানা পন্থা আবিস্কার করে নিয়েছে, কিন্তু যৌনতার আনন্দ উপভোগ করাকে কখনোই বাদ দেয়নি। সমকামিতা হয়ত কারো কারো মধ্যে সেই আনন্দ প্রকাশ এবং উদযাপনেরই একটি উদগ্র রূপ বই কিছু নয়। কিন্তু তারপরেও আমাদের ডারউইনীয় পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করতে হবে যে, এই হারে প্রজননহীন যৌনতা সম্পন্ন সমকামীরা পৃথিবীতে টিকে থাকল কি করে।

ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব কি সমকামিতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে?

ডারউইনীয় বিবর্তনের দিক থেকে চিন্তা করলে সমকামিতার ব্যাপারটি জীববিজ্ঞানীদের জন্য সব সময়ই একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। কারণ ‘ওটা বায়োলজিকাল ডেড এন্ড’ - অন্তত এভাবেই ভাবা হতো কিছুদিন আগেও। বিবর্তনের কথা ভাবলে প্রথমেই প্রজননের মাধ্যমে বংশ বিস্তারের কথাটিই মাথায় সবার আগে চলে আসে।

---

[88] According to Paul Vasey, "Japanese macaques're engaging in the behavior because it's gratifying sexually or it's sexually pleasurable," he says. "They just like it. It doesn't have any sort of adaptive payoff".
Matthew Grober, biology professor at Georgia State University, agrees, saying, "If [sex] wasn't fun, we wouldn't have any kids around. So I think that maybe Japanese macaques have taken the fun aspect of sex and really run with it."
[89] Jared Diamond, Why Is Sex Fun?: The Evolution Of Human Sexuality, Basic Books, 1998

সে দিক দিয়ে চিন্তা করলে সমকামিতার লক্ষ্য যে বংশবিস্তার নয় - তা যে কেউ বুঝবে। তাহলে জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামিতার উদ্দেশ্য কি? আগে এমনকি জীববিজ্ঞানীদের মধ্যেও সমকামিতাকে ঢালাওভাবে 'অস্বাভাবিকতা' কিংবা 'ব্যতিক্রম' ভেবে নেওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক,তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই ধ্যান ধারণা অনেকটা বদলেছে।

প্রথম কথা হচ্ছে, সমকামিতার ব্যাপারটি কিন্তু নিখাঁদ বাস্তবতা। শুধু মানুষের ক্ষেত্রে নয়, পুরো প্রাণিজগতের ক্ষেত্রেই। জীববিজ্ঞানী ব্রুস ব্যাগমিল তাঁর ‘বায়োলজিকাল এক্সুবারেন্স: এনিমেল হোমোসেক্সুয়ালিটি এন্ড ন্যাচারাল ডাইভার্সিটি’ বইয়ে প্রায় পাঁচশ প্রজাতিতে সমকামিতার অস্তিত্বের উদাহরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। সামগ্রিকভাবে জীবজগতে ১৫০০-রও বেশি প্রজাতিতে সমকামিতার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। মানুষের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫ ভাগ থেকে ১২ ভাগ সমকামিতার সাথে যুক্ত বলে পরিসংখ্যানে পাওয়া গেছে। কাজেই সমকামিতার এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার চেষ্টা বোকামি। এখন মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন হলো, সমকামিতাকে ব্যাখ্যা করার সঠিক বৈজ্ঞানিক মডেল জীববিজ্ঞানে আছে কিনা, নাকি কেবল ‘সমাকামিতা অস্বাভাবিক’ কিংবা ‘ব্যতিক্রম’ ইত্যাদি বলেই ছেড়ে দেয়া হবে? এ প্রসঙ্গে জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক জোয়ান রাফগার্ডেনের উক্তিটি খুবই প্রাসঙ্গিক –

> ‘My discipline teaches that homosexuality is some sort of anomaly. But if the purpose of sexual contact is just reproduction, then why do all these gay people exist? A lot of biologists assume that they are somehow defective, that some development error or environment influence has misdirected their sexual orientation. If so, gay and lesbian people are mistake that should have been corrected a long time ago (thru Natural selection), but this hasn't happened. That's when I had my epiphany. When a scientific theory says something wrong with so many people, perhaps the theory is wrong, not the people’.

সমকামিতাকে যদি বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তবে আমাদের বের করতে হবে - ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপযোগিতা কী। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে কঠিন। তবে কঠিন বলে কেউ হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন প্রতিদিনই। কিছু যোগসুত্র পাওয়া গেছে প্রাণিজগতে 'স্টেরাইল ওয়ার্কার' বা 'বন্ধ্যা সৈন্যের'-এর উদাহরণ থেকে। পিঁপড়ে, মৌমাছি, উইপোকা কিংবা বোলতার মতো প্রজাতিতে এই ধরনের 'বন্ধ্যা সৈন্যের' উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এরা বংশবৃদ্ধিতে কোনো ভূমিকা রাখে না। কিন্তু নিজেদের গোত্রকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে জনপুঞ্জ টিকিয়ে রাখে। মানুষের জন্যও কি এটা খাটে? বিবর্তনীয় মনোবিদ্যার আলোকে একটু চিন্তা করা যাক। এমন কি হতে পারে যে, সমকামী পুরুষেরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই আদিম শিকারি-সংগ্রাহক সমাজে (hunter gatherer societies) বাচ্চা লালন পালনে কোনো বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল? নিজেদের মধ্যে মারামারি না করে যখন একাধিক পুরুষ দলবদ্ধ হয়ে গোত্রের দায়িত্ব নিতো আর শিকারের সন্ধান করত, সেই গোত্র হয়ত অনেক বেশি খাবারের যোগান পেত, কিংবা হয়ত বহিঃশত্রু র হাত থেকেও রক্ষা পেতো অন্যদের চেয়ে বেশি। ফলে টিকে থাকার প্রেরণাতেই হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষে পুরুষে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল –যা গোত্রে এনে দিয়েছিল বাড়তি নিরাপত্তা। কিংবা হয়ত এমনও হতে পারে - যখন শক্তিশালী পুরুষ শিকারে যেত, হয়ত সেই গোত্রের কোনো 'গে চাচা' রক্ষা করার দায়িত্ব নিতো ছোট ছোট ছেলেপিলেদের। আর পুরুষটিও শিকারে বের হয়ে স্ত্রীর 'পরকীয়া'র আশঙ্কায় ভাবিত থাকতো না! ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায়, বহু রাজা বাদশাহরা তাদের হারেম সুরক্ষিত রাখতে 'খোঁজা প্রহরী'দের নিয়োগ দিতো। আরো সমীক্ষায় দেখা গেছে পশ্চিমে মেয়েরা অফিসে সমকামী পুরুষদের সাথে কাজ করতে অনেক নিরাপত্তা অনুভব করে। এটার কারণও অবোধ্য নয়। হয়ত জিন সঞ্চালন ছাড়াও অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আমাদের প্রজাতিটিকে টিকিয়ে রাখতে সমকামী সদস্যদের একটা ভূমিকা ছিল। সেজন্য এডয়ার্ড ও উইলসন 'কিন সিলেকশন'-এর মাধ্যমে হোমোসেক্সুয়ালিটিকে ব্যাখ্যা করার

চেষ্টা করেছিলেন সেই ১৯৭৮ সালেই[90]।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক চিন্তা করা যেতে পারে। সমকামী প্রবৃত্তিটি হয়ত বিবর্তন প্রক্রিয়ার উপজাত বা সাইড ইফেক্ট। বিবর্তনের অনেক কিছুর কথাই আমরা জানি যেগুলো কোনো বাড়তি উপযোগিতা তৈরি করে না। কিন্তু এগুলো উৎপন্ন হয়েছে বিবর্তনের উপজাত হিসেবে। এই বৈশিষ্টগুলো যদি টিকে থাকার ক্ষেত্রে বাড়তি কোনো অসুবিধা তৈরি না করে তাহলে তারা উপজাত হিসেবে রয়ে যেতে পারে বংশ পরম্পরায়। বিজ্ঞানী স্টিফেন যে গুল্ড এটি বোঝাতে আমাদের বাড়ির উদাহরণ হাজির করতেন। যে কোনো বড় বাড়ি কিংবা ইমারতের দিকে দেখলে দেখা যাবে – এর ধনুকাকৃতির দু'টি খিলানের মাঝে স্থান করে নিয়েছে ইংরেজি 'ভি' আকৃতির স্প্যান্ড্রেল বা মাঝখানের একটা খোলা জায়গা। বাড়ির ইমারত বানাতে খিলান থাকা অত্যাবশক, কিন্তু খিলান বানাতে গেলে বাড়তি উপজাত হিসেবে স্প্যান্ড্রেল এমনিতেই তৈরি হয়ে যায়, যা ইমারতটির ভিত্তির জন্য অত্যাবশকীয় কোনো কিছু হয়ত নয়, কিন্তু এটি এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আমাদের শরীরের হাড্ডির সাদা রঙের কথা ধরা যেতে পারে। এই সাদা রঙ বিবর্তনে কোনো বাড়তি উপযোগিতা দেয় না। এই সাদা রঙ তৈরি হয়েছে হাড়ে ক্যালসিয়াম থাকার উপজাত হিসেবে। তেমনি কারো কারো চোখের নীল কিংবা বাদামী রঙও হয়ত আমাদের কোনো বাড়তি উপযোগিতা দেয়া না - এটা প্রকৃতিতে আছে বিবর্তনের সাইড ইফেক্ট হিসেবে। সমকামিতাও বিবর্তনের সেরকম কোনো উপজাত হতে পারে[91]।

ইতালির একটি সমীক্ষায় (২০০৪) দেখা গেছে, যে পরিবারে সমকামী পুরুষ

---

[90] Michael Abrams, The Real Story on Gay Genes, Discover Magazine, June, 2007

[91] যেমন, ইংল্যান্ডের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক রবিন ডানবার মনে করেন, মানুষের মধ্যে সম্ভবত বিবর্তনের বাই-প্রোডাক্ট। তিনি বলেন, 'homosexuality doesn't necessarily have to have a function. It could be a spin-off or by-product of something else and in itself carries no evolutionary weight'।

আছে সে সমস্ত পরিবারে মেয়েদের উর্বরতা (fertility) বিষমকামী পরিবারের চেয়ে বেশি থাকে। আন্দ্রিয়া ক্যাম্পেরিও-সিয়ানির ওই গবেষণা[92] থেকে জানা যায়, বিষমকামী পরিবারে যেখানে গড় সন্তান সংখ্যা ২.৩ সেখানে গে সন্তানবিশিষ্ট পরিবারে সন্তানের সংখ্যা ২.৭। তাঁর মানে যে জেনেটিক প্রভাব মেয়েদের উর্বরা শক্তি বাড়ায় - সেই একই জিন আবার হয়ত ছেলেদের মধ্যে সমকামী প্রবণতা ছড়িয়ে দেয় - বিবর্তনের উপজাত হিসেবে। সেজন্যই ডঃ ক্যাম্পেরিও ক্যানি বলেন [93] –

> "We have finally solved the paradox ... the same factor that influence sexual orientation in males promotes higher fecundity in females'

বিজ্ঞানী ডীন হ্যামারও প্রায় একই কথা বলেছেন একটু অন্যভাবে[94] –

> 'The answer is remarkably simple: the same gene that causes men to like men, also causes women to like men, and as a result to have more children'

বিবর্তন তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে সামাজিক নির্বাচন। আমরা দেখেছি প্রাণিজগতে সমকামিতার প্রবৃত্তি একটি বাস্তবতা। শুধু মানুষের ক্ষেত্রে সমকামিতা নেই, ছড়িয়ে আছে প্রাণিজগতের সকল প্রজাতির মধ্যেই। আসলে প্রকৃতিতে সবসময়ই খুব ছোট হলেও একটা অংশ ছিল এবং থাকবে যারা যৌনপ্রবৃত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের চেয়ে ভিন্ন। কিন্তু কেন এই ভিন্নতা? এর একটি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনীয় ইকোলজিস্ট জোয়ান রাফগার্ডেন রোথসবর্গ তাঁর "Evolution's Rainbow: Diversity, Gender and

---

[92] Corna, F., A. Camperio-Ciani and C. Capiluppi, 2004. Evidence for maternally inherited factors favouring male homosexuality and promoting female fecundity. Proceedings: Biological Sciences 271: 2217-2221.

[93] How Sex Works: Why We Look, Smell, Taste, Feel, and Act the Way We Do, Sharon Moalem, Harper; First Edition, April 28, 2009

[94] পূর্বোক্ত।

Sexuality in Nature and People.” বইয়ে[95]। তিনি বলেন, যৌনতার উদ্দেশ্য সনাতনভাবে যে কেবল ‘জিন সঞ্চালন করে বংশ টিকিয়ে রাখা’ বলে ভাবা হয়, তা ঠিক নয়। যৌনতার উদ্দেশ্য হতে পারে যোগাযোগ এবং সামাজিকীকরণ। তিনি বলেন:

> ‘যদি আপনি সেক্স বা যৌনতাকে যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে দেখেন, তাহলে আপানার কাছে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে, যেমন সমকামিতার মতো ব্যাপারগুলো– যা জীব বিজ্ঞানীদের বছরের পর বছর ধরে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। বনোবো শিম্পাঞ্জীদের মধ্যে সমকামী সংশ্রব বিষমকামীদের মতোই দেদারসে ঘটতে দেখা যায়। আর বনোবোরা কিন্তু প্রকটভাবেই যৌনাভিলাসী। তাদের কাছে যৌনসংযোগের (Genital contact) ব্যাপারটা আমাদের ‘হ্যালো’ বলার মতোই সাধারণ। এভাবেই তারা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। এটি শুধু দলগতভাবে তাদের নিরাপত্তাই দেয় না, সেই সাথে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য আহরণ এবং সন্তানদের লালন পালনও সহজ করে তুলে’।

শুধু বনোবো শিম্পাঞ্জীদের কথাই বা বলি কেন, বাংলাদেশেই আমরা যেভাবে বড় হয়েছি সেখানে ছেলেদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হলে একজন আরেকজনকে স্পর্শ করে, হাতে হাত ধরে কিংবা ঘারে হাত দিয়ে ঘোরাঘুরি করে। ঝগড়া-ঝাটি হলে বুকে জড়িয়ে ধরে আস্থা পুনর্প্রতিষ্ঠিত করে। মেয়েরাও তাই। এই আচরণ একটু প্যাসিভ তবে এ ধরনের প্রেরণা কিন্তু মনের ভেতর থেকেই আসে। বলা বাহুল্য, এই প্রেরণার মধ্যে কোনো জিন সঞ্চালনজনিত কোনো উদ্দেশ্য নেই, পুরোটাই যোগাযোগ এবং সামাজিকীকরণের প্রকাশ।

---

[95] Joan Roughgarden, *Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People*, University of California Press, May 17, 2004।

যোগাযোগ আর সামাজিকীকরণের কথা মাথায় রেখেই জোয়ান রাফগার্ডেন তাঁর বিবর্তনবিদ্যা সংক্রান্ত 'ইভ্যলুশনস রেইনবো' (পূর্বে উল্লিখিত) বইয়ে 'যৌনতার নির্বাচন' (sexual selection)-এর বদলে 'সামাজিক নির্বাচন' (social selection)– এর প্রচলন ঘটানোর প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেন, প্রাণিজগতের সাংগঠনিক ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে তাদের খাবার, সঙ্গী প্রভৃতির সঠিক নির্বাচনের উপর। প্রাণিজগতের এই নির্বাচনই কখনো রূপ নেয় সহযোগিতায়, কখনো বা প্রতিযোগিতায়। এবং এটাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত পারিবারিক বিবিধ সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করে। কোনো কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই সম্পর্ক একগামিতা বা মনোগামিতে রূপ নিতে পারে (মানুষ ছাড়াও কিছু রাজহাঁস, খেঁকশিয়াল, কিছু পাখির মধ্যে একগামী সম্পর্ক আছে), কখনো বা রূপ নেয় বহু(স্ত্রী)গামিতা বা পলিগামিতা (সিংহ, বহু প্রজাতির বনের মধ্যে এরকম হারেম তৈরি করে ঘোরার প্রবণতা আছে), কখনোবা বহু(পুরুষ)গামিতা বা পলিঅ্যান্ড্রি (কিছু সিংহ, হরিণ এবং প্রাইমেটদের মধ্যে)তে। এমনকি অনেকসময় দলে একাধিক 'জেন্ডারের' মধ্যেও সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমন, ব্লু গ্রীন সানফিশ নামের একপ্রজাতির মাছ আছে যেখানে এক একটি ঝাঁকে দুই পুরুষ মাছের মধ্যে সমধর্মীযৌনতার বন্ধন (same-sex courtship) গড়ে উঠে। এখানে মুখ্য পুরুষ মাছটি (এদের 'আলফা মেল' বলা হয়) একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলে আর তারপর অপর পুরুষ মাছটিকে সাথে নিয়ে তাদের যৌথ সাম্রাজ্যে স্ত্রীমাছগুলোকে ডিম পাড়তে আমন্ত্রণ জানায়। অনেকসময় দ্বিতীয় পুরুষ মাছটি স্ত্রী মাছের অনুকরণ করে স্ত্রী মাছের ঝাকের সাথে মিশে যায়- যা অনেকটা আমাদের সমাজে বিদ্যমান ক্রস-জেন্ডার প্রতিনিধিদের মতোই। ড. রাফগার্ডেনের মতে, যৌন-প্রকারণ এবং সমধর্মী যৌনতা এভাবে প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে, যা অনেক সময়ই মোটাদাগে কেবল শুক্রাণুর স্থানান্তর নয়। সামাজিক নির্বাচন হচ্ছে সেই বিবর্তন যা সামাজিক সম্পর্কগুলোকে টিকিয়ে রাখে। ড. রাফগার্ডেনের মতো সামাজিক নির্বাচনের ধারণাকে সমর্থন করেন ব্রুস ব্যাগমিল এবং পল ভ্যাসিসহ অনেক বিজ্ঞানীই।

তবে বেশিরভাগ জীববিজ্ঞানীই এখনই 'যৌনতার নির্বাচনকে' সরিয়ে দিয়ে 'সামাজিক নির্বাচন'কে গ্রহণ করার পক্ষপাতি নন, কারণ প্রকৃতিজগতের বেশিরভাগ ঘটনাকেই 'যৌনতার নির্বাচন' দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনবাদী জীববিদ জেরি কয়েন রাফগার্ডেনের সমালোচনা করে বলেন[96]:

> 'She ignores the much larger number of species that do conform to sexual selection theory, focusing entirely on the exceptions. It is as if she denies the generalization that Americans are profligate in their use of petrol by describing my few diehard countrymen who bicycle to work.'।

নেচার পত্রিকায় রাফগার্ডেনের বইটির ভূয়সী প্রশংসা করার পরও তাঁর 'সামাজিক নির্বাচন' তত্ত্বের সমালোচনা করে নৃতত্ত্ববিদ সারাহ হর্ডি বলেন[97] – '(তাঁর) এ (উদাহরণ) গুলো যৌনতার নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য উপযুক্ত কারণ নয়, বরং এগুলো হতে পারে জীব-বৈচিত্রকে (সামাজিকভাবে) গ্রহণযোগ্য করার অনুপ্রেরণা'। এর কারণ আছে। অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন, যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমেই হোমসেক্সুয়ালিটিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সমকামিতার জিন (যদি থেকে থাকে) যোগাযোগ ও সামাজিকতার উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে উপযোগী তা বনোবো শিম্পাঞ্জীদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রেও এটি সত্য হতেই পারে[98]। আবার এমনো হতে পারে মানুষের মধ্যে 'গে জিন'-এর ভূমিকা পুরুষ এবং স্ত্রীতে ভিন্ন হয়। ইতালির একটি সমীক্ষার (২০০৪) কথা আমরা আগেই জেনেছি – যা থেকে বেরিয়ে এসেছে, যে ব্যাপারটি পুরুষদের মধ্যে সমকামিতা ছড়ায় সেটাই হয়ত মেয়েদের ক্ষেত্রে উর্বরাশক্তি বাড়ায়। এছাড়া 'কিন সিলেকশন'-তত্ত্বের সাহায্যেও সমকামিতাকে বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন। ইন্টারনেটের বহুল-প্রচারিত টক-অরিজিনের[99] একটি

---

[96] A Review by Jerry Coyne, http://www.powells.com/review/2004_08_15.html

[97] Sarah Blaffer Hrdy, Sexual diversity and the gender agenda, Nature 429, pp 19 – 21, 06 May 2004

[98] The evolution of human homosexual behavior. Current Anthropololgy 39(1): 385-413.

[99] Talk.Origins is a moderated Internet discussion forum concerning the origins of life and evolution. The group includes detailed and reasoned rebuttals to creationist claims. There is an expectation that any claim

লিঙ্কেও[100] বিবর্তনের আধুনিক তত্ত্বের মাধ্যমে সমকামিতার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কাজেই যে কারনণই সমাজে হোমোসেক্সুয়ালিটির অস্তিত্ব থাকুক না কেন, এবং সেগুলোকে উপস্থাপনের সঠিক মডেল নিয়ে বিবর্তনবাদীদের মধ্যে যত বিতর্কই থাকুক না কেন (বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানে এধরনের বিতর্ক খুবই স্বাভাবিক), এটি এখন মোটামুটি সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সমকামিতার মতো যৌন-প্রবৃত্তিগুলো 'অস্বাভাবিক' বা 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' নয়, বরং বৈজ্ঞানিক উপাত্ত ও তত্ত্বের সাহায্যেই এই ধরনের যৌন-প্রবৃত্তিগুলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; জীববিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা কিন্তু সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। আজ আমি যখন এ বইটি লিখতে বসেছি তখন সারা পৃথিবী জুড়ে চারশ'রও বেশি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে 'গে জিন' নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। কাজেই সমকামিতার ব্যাপারটি জীববিজ্ঞানীদের জন্য গবেষণার সজীব একটি বিষয়–এ যে কোনো সম্ভাবনার এক অবারিত দুয়ার!

is to be backed up by actual evidence, preferably in the form of a peer-reviewed publication in a reputable journal.

[100] Index to Creationist Claims Claim CB403: Evolution does not explain homosexuality: Response: http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB403.html

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণার রুদ্ধ দুয়ার খুললেন যারা

যৌনতা মানব-সমাজের অত্যন্ত গোপনীয় দিক। মানুষের ‘প্রাইভেট-লাইফ’-এর সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক। ফলে প্রকাশ্যে যৌনতা নিয়ে আমরা আলোচনা করি না। নানাভাবে ব্যাপারটা এড়িয়ে চলি। কখনো বোধ করি অস্বস্তি। সেজন্য যৌনতা নিয়ে ভালো কোনো গবেষণা আঠারো শতকের আগে শুরুই হয়নি, যদিও রগরগে ‘সেক্স ম্যানুয়াল’-এর অভাব সমাজে কখনোই ছিল না। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের কথা তো আমরা সবাই জানি। এটি লেখা হয়েছিল বোধ হয় সেই দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দে। তাঁরও আগে ছিল রোমান কবি অভিডের (Ovid) লেখা ‘আরস আমাতোরিয়া’ বা ‘Arts of Love’। এছাড়া ১১৭২ খ্রিষ্টাব্দে লেখা ভারতীয় লাভ ম্যানুয়াল ‘অনঙ্গ রাঙ্গা’ কিঙ্গা গ্রীক ‘এলিফান্তিস’-এর কথাও হয়ত অনেকে জানেন। এগুলোতে নানাপদের আশন-কুশন আর ‘ক্যামনে স্ত্রীকে বশে রাখা যায়’ - এ নিয়ে রগরগে উপাদান আছে ঢের, কিন্তু এগুলোর কোনোটিতেই যৌনতা বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়নি।

যৌনতার উপর প্রাথমিক গবেষণা বলতে আমরা অনেকে ফ্রয়েডের গবেষণাই বুঝে থাকি, যদিও ফ্রয়েডেরও আগে রিচার্ড ফ্রেইহার ভন ক্রাফট ইবিং এ নিয়ে বেশ কিছু কাজ করেছিলেন। রিচার্ড ফ্রেইহার মানবজীবনে যৌনতার বিভিন্নরূপকে লিপিবদ্ধ করে ১৮৮৬ সালে ‘সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস’ (Psychopathia Sexualis) নামে ল্যাটিন ভাষায় একটি যুগান্তকারী বই লিখেছিলেন। বইটিতে তিনি সমকামী

প্রবণতাকে এক ধরনের 'মানসিক রোগ' বলে আখ্যায়িত করেন। সমকামিতা ছিল তাঁর চোখে উত্তরাধিকারের অধঃপতন[101]। তিনি আরো মনে করতেন হস্তমৈথুনের প্রভাবে মানব জীবনে সমকামিতার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বইটি সে সময় শুধু চিকিৎসক কিংবা সার্জনদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, সাধারণ মানুষদের মাঝেও এটি বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। রিচার্ড ফ্রেইহারের জীবদ্দশাতেই এই বইটির প্রায় ডজন খানেক মুদ্রণ প্রকাশিত হয়, অনুদিত হয় পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়। এই বইটি লেখার আগে বিশ্বে ইবিং-এর তেমন কোনো পরিচিতি ছিল না। কিন্তু এই একটি বই-ই তাকে নিয়ে আসে একেবারে খ্যাতির উজ্জ্বল আলোয়। অখ্যাত এক জার্মান নিউরোলজিস্ট রাতারাতি পরিণত হন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধানে। আর তাঁর বই 'সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস' দেশ বিদেশে মুড়ি মুরকির মতোই বিক্রি হতে থাকে। এই বইটিই মূলত প্রথম বারের মতো 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ' থেকে সমকামিতাকে সর্বসাধারণের কাছে এক ধরনের 'মানসিক রোগ' এবং 'অসুস্থতা' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, যার প্রভাব বজায় ছিল পরবর্তী একশ বছর পর্যন্ত[102]। আর তাঁর বইয়ের সূত্রেই বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন 'পাগল সারাবার' নানা চিকিৎসা; অন্য দিকে ধর্মের ধ্বজাধারী চার্চ খুঁজে পেল সমকামীদের হেনস্থা করার সুদৃঢ় 'বৈজ্ঞানিক ভিত্তি'। যদিও সেসময়ের জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে সমকামিতার কোনো জৈববৈজ্ঞানিক ভিত্তি রিচার্ড ইবিং-এর জানা ছিল না, কিন্তু 'নিঃসংশয়ী এবং প্রত্যয়ী'

---

[101] অধঃপতন তত্ত্বের ("Degeneracy" theory) মূল উদ্ভব ঘটেছিল আঠারো শতকে,কিন্তু উনিশ শতকে এটি পূর্ণতা পায়। মানুষের যে কোনো অস্বাভাবিকতা - তা সে নির্বুদ্ধিতাই হোক, কিংবা মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব কিংবা হোক না খুন খারাবির মতো কোনো অপরাধ - সবই এই 'অধঃপতন' তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা হতো । চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে এই তত্ত্ব প্রবেশ করে ১৮৫৭ সালে বি.এ মোরেল নামে এক 'বিশেষজ্ঞের'হাত দিয়ে।তিনি কিছু বিশেষ শারীরিক অবস্থা - যেমন ক্ষয়রোগ (যক্ষা) এবং ক্রেটিনিজম (এক ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব) সহ বিভিন্ন রোগের উৎস হিসেবে এই অধঃপতন তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটান। তখন যেহেতু চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান এত উন্নত পর্যায়ের ছিল না,ডাক্তাররা এই অদ্ভুতুরে তত্ত্বটিকে গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করেছিল বলা যায়। রিচার্ড ভন ক্রাফট ইবিং মোরেলের এই তত্ত্ব তাঁর যৌনতার তত্ত্ব ব্যাখ্যার কাজে ব্যবহার করেন এবং সমকামিতাকে এক ধরনের 'অধঃপতনের প্রকাশ'হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

[102] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press; 1 edition, 1996

ইবিং ঢালাওভাবে তাঁর বইয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সমকামীরা বিকৃত মনোভাবাপন্ন, কারো সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে অক্ষম এবং তারা মনোরোগী[103]। বলা বাহুল্য, সমকামী প্রবৃত্তি নিয়ে ইবিং-এর গৎবাঁধা বুলিগুলো আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে পরিত্যক্ত হয়েছে অনেক আগেই[104]। কিন্তু তিনি প্রথম অপ্রচলিত 'হোমোসেক্সুয়ালিটি' শব্দটিকে (যা কার্ল মারিয়া কার্টবেরি অনেক আগে ১৮৬৯ সালে একটি প্যাম্ফ্লেটে ব্যবহার করেছিলেন) একাডেমিয়ায় শুধু নয়, সর্বসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং এ সংক্রান্ত গবেষণার দুয়ার উন্মোচন করেন। ইবিং-এর এ ধরনের গবেষণায় অনুপ্রাণিত হন আরেক বিখ্যাত যৌনগবেষক - যার নাম আমরা সবাই জানি - বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড এস. ফ্রয়েড।

বিশ শতকের প্রথম দিকে সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর বিভিন্ন মক্কেলদের সাথে কথোপকথোন এবং তাদের যৌন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অধ্যয়নের ভিত্তিতে যৌনতার যে তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন তাঁর প্রভাব পরবর্তী কয়েক দশক ধরে বজায় ছিল। তবে পরবর্তীতে ফ্রয়েডের অনেক গবেষণাই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। যেমন, কোনো আবদ্ধ পরিবারে বাবার দূরে থাকার কারণে কোনো ছেলে কেন সমকামী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে দিয়ে ফ্রয়েড বলেন, ছেলেটি 'ইডিপাস কম্পলেক্স' থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছে। আবার একই পরিস্থিতিতে একটি মেয়েশিশু কেন সমকামী হয়ে উঠতে পারে তা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা হলো, এতে থাকে তাঁর প্রতি তাঁর মার অবচেতন ঘৃণা (unconscious hatred of their mothers) কিংবা তাঁর ভাইয়ের লিঙ্গের প্রতি ঈর্ষা (envy of a brother's penis)। ফ্রয়েডের এ ধরনের ব্যাখ্যাকে 'বৈজ্ঞানিক' না বলে এখন 'ফ্রয়েডীয় কুসংস্কার' বলাই শ্রেয়। ড. হুমায়ুন

---

[103] Krafft-Ebing, R. [1886] 1999. Psychopathia Sexualis. Reprinted by Bloat Books.

[104] Today, most contemporary psychiatrists no longer consider homosexual practices as pathological (as Krafft-Ebing did in his first studies): partly due to new conceptions, and partly due to Krafft-Ebing's own self-correction. From Wikipedia.
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Richard_Freiherr_von_Krafft-Ebing

আজাদ তাঁর ‘নারী’ গ্রন্থে এধরনের ফ্রয়েডীয় কুসংস্কার সম্বন্ধে বলেছেন[105],

> ‘... ফ্রয়েডের সমস্ত সিদ্ধান্ত এখন গণ্য হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক বলে; শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়, চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীলও: একরাশ পিতৃতান্ত্রিক, গোত্রীয় ও ব্যক্তিগত কুসংস্কার পেশ করেছিলেন মনোবিশ্লেষনরূপে। ফ্রয়েড যখন উদ্ঘাটন ও প্রকাশ করে চলেছিলেন মনের ‘অদৃশ্য’ সূত্র, শোনাচ্ছিলেন লিবিডো, অহম, অবচেতনা, ইডিপাস-ইলেক্ট্রা গূঢ়ৈষা, শিশ্নাসূয়ার পূরাণ; কামকে করে তুলেছিলেন বিশ শতকের আল্লা... ফ্রয়েডের মানুষধারণাকেই ভুল মনে হয় আজ; পিতৃতন্ত্রের, গোত্রের ও নিজের দুঃস্বপ্ন মানুষ নামে তিনি উপস্থিত করেছিলেন বিজ্ঞানের মুখোশ পরিয়ে।’

ড. হুমায়ুন আজাদের কথায় আবেগের আতিশয্য থাকলেও অতিশয়োক্তি নেই কোথাও। তবে তারপরও বলতে হয়, ফ্রয়েডর গুরুত্ব এখানেই যে তিনিই প্রথম যৌনতা নিয়ে প্রথাগত গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছিলেন। আরো একটা ব্যাপার সেই সাথে গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রয়েড তার পূর্বসুরী গবেষক ইবিং এর মতো সমকামিতাকে কোনো ‘রোগ’ বলে মনে করতেন না। তিনি ভেনিসের Die Zeit পত্রিকায় সমকামিতা সম্বন্ধে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন সরাসরি – ‘সমকামী ব্যক্তিরা অসুস্থ নয়’[106]। একবার এক আমেরিকান মহিলা তার ছেলের সমকামিতা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে ফ্রয়েডের সাহায্য কামনা করলে, ফ্রয়েড তাকে চিঠিতে জানান-

> ‘আমি আপনার চিঠি থেকে যা বুঝলাম তা হলো আপনার সন্তান সমকামী। কিন্তু আপনি সেই কথা আপনার চিঠিতে সরাসরি কোথাও উল্লেখ করেননি। আমি কি জানতে পারি কেন আপনি এটা এড়িয়ে গেলেন? সমকামিতার হয়ত কোনো উপকারিতা নেই, কিন্তু এতে লজ্জিত হবারও কিছু নেই। এটি কোনো অসুস্থতা নয়, কিংবা নয় কোনো ধরনের অধঃপতন। এটাকে কোনো

---

[105] হুমায়ুন আজাদ, নারী, আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০২

[106] His exact comment was – “Homosexual persons are not sick”. (Ref. Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press; 1 edition, 1996)

রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না, বরং আমরা একে যৌনতার এক প্রকারণ (variation) হিসেবে দেখি, যা কোনো ব্যক্তি সত্ত্বার মধ্যে বিভিন্ন কারণে জন্ম নিতে পারে। প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের বহু জ্ঞানী গুনী এবং শ্রদ্ধেয় মানুষজন সমকামী ছিলেন (যেমন প্লেটো, মাইকেলএঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি প্রমুখ)। সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে এর উপর নিষ্ঠুর হওয়া নিঃসন্দেহে অনৈতিক হবে'।

তবে ফ্রয়েডের এ ধরনের 'প্রথাগত' গবেষনার অনেক আগেই আঠারো শতক থেকেই– কিছু দার্শনিক সমকামিতার ব্যাপারে নিজেদের ব্যক্তিগত অভিমত জানিয়েছিলেন। যেমন দার্শনিক ভলটেয়ারের (১৬৯৪ -১৭৭৮) কথা বলা যায়। ভলটেয়ার ১৭৬৪ সালে লেখা একটি বইয়ে সমকামিতাকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ অনৈতিক প্রবৃত্তি বলে অভিহিত করেছিলেন; কিন্তু আবার এই আচরণের ব্যাপক প্রসার দেখে বিস্মিতও হয়েছিলেন[107]। তিনি মনে করতেন, এই মানসিকতার উপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কিংবা 'গরম বেশি পড়লে' সমকামিতার প্রকোপ বৃদ্ধি পায় বলে তিনি ভাবতেন। আরেক ফরাসী দার্শনিক রুশো (১৭১২ - ১৭৭৮) মনে করতেন সমকামিতা মূলত এসেছে আরব দেশগুলো থেকে। তবে যেহেতু সারা পৃথিবীর সকল দেশেই সমকামিতা ছড়িয়ে গেছে, তাই এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়াই সঙ্গত।

ইবিং-এর 'সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস' প্রকাশিত হবার আগে ১৮৬২ সালে জার্মানির মনোবিজ্ঞানী কার্ল হেনরিখ উলরিচস 'উরানিসম'[108] নামের একটি ধারণার জন্ম দেন। সমকামিতার ইতিহাসে উলরিচসের নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ; তিনি ছিলেন সমকামী মানবাধিকারের প্রাথমিক প্রবক্তা এবং একজন বিদ্রোহী লেখক। প্রথম দিকে

---

107 অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, সমপ্রেম, দীপপ্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।

108 উরানিজম উনবিংশশতকের একটি মতবাদ। এই মতবাদে মনে করা হত সমকামী পুরুষেরা আসলে পুরুষ দেহে বন্দি নারী আত্মার অতৃপ্ত প্রকাশ। এরা উলরিচসের চোখে ছিল তৃতীয় লিঙ্গ।

তিনি Numa Numantius নামের ছদ্মনামে লিখলেও পরবর্তীতে নিজ নামেই আত্মপ্রকাশ করেন, এবং প্রকাশ্যে নিজেকে 'উরানিয়ান' হিসেবে অভিহিত করতেন (তাঁকে এখন ইতিহাসের প্রথম 'আউট অব ক্লোজেট' বলে মনে করা হয়)। তিনি আইনের যাতাকলে পিষ্ট সমকামী ব্যক্তিদের অধিকার সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে তুলেন এবং সমকামিতার প্রতি বিদ্বেষমূলক সমস্ত আইনকানুন লোপ করার আহ্বান জানান। সমকামিতা তাঁর কাছে কোনো 'অপরাধ' ছিল না, বরং তাঁর চোখে একেবারেই 'প্রাকৃতিক' এবং খুবই 'স্বাভাবিক' একটি প্রবৃত্তি। তিনি তাঁর লেখায় সেজন্যই বলেন, "There is no such thing as unnatural love. Where true love is, there nature is also"

সমকামিতা সম্বন্ধে সরাসরি কিছু না বললেও ফরাসি চিন্তাবিদ দিদেরোর (১৭১৩-১৭৮৪) দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীতে সমকামীদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে সাহায্য করেছিল। তিনি মানুষের যৌন প্রবৃত্তি নিয়ে অহেতুক নীতি কপচানোর ব্যাপারে চার্চের ভূমিকার সমালোচনা করেন। দিদেরোর মতামতকে গ্রহণ করে নিয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও দার্শনিক চার্চের অসহিষ্ণু মনোভাবের নিন্দা করেছেন। এর মধ্যে ফরাসি সাহিত্যিক মার্কুইস দে সাদ এবং এমিল জোলার কথা আলাদা করে বলা যায়। এরা সমকামী মনোবৃত্তিকে জন্মগত বলে মত দিয়েছেন, এবং এও বলেছেন, এই মানসিকতাকে পরিত্যাগ করা যায় না।

এখন একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বলা যায় যে, সমকামিতা নিয়ে শরীরবৃত্তীয় এবং মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা শুরু হয়েছে অনেকদিন ধরেই। শুধু সমকামিতা নয়, পাশাপাশি রূপান্তরকামিতা, উভকামিতা এবং অপরাপর যৌনপ্রবৃত্তি নিয়েও সামগ্রিকভাবে গবেষণা হচ্ছে ঢের। এর ফলে যে যৌন-প্রবৃত্তিগুলো একসময় নিকষ অন্ধকারের কালো চাঁদরে ঢাকা ছিল, তা ধীরে ধীরে উঠে আসছে দিনের আলোতে। সমকামিতা বিষয়ে লিখতে গিয়ে যাদের কথা না বললেই নয়, তাঁরা হলেন ব্রিটিশ

ডাক্তার হেনরি হ্যাভলক এলিস (১৮৫৯-১৯৩৯), জন এডিংটন সিমন্ডস (১৮৪০-১৮৯৩) এবং জার্মান মনোবিজ্ঞানী ম্যাগনাস হার্চফিল্ড (১৮৬৪ - ১৯৩৫)। এরা সকলেই ছিলেন ইবিং এর প্রায় সমসাময়িক কিন্তু ইবিং-এর মতামতের সাথে তাঁরা একমত ছিলেন না।

জন এডিংটন সিমন্ডস বিজ্ঞানের কোনো গবেষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন উনবিংশ শতকের অন্যতম প্রধান ইংরেজ কবি। সাত খণ্ডে প্রকাশিত 'ইতালির রেনেঁসা' (Renaissance in Italy) বইটি তাঁর প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন। তিনি শুধু কবিতাই লেখেননি, শেলি এবং সিডনির মতো ইংরেজ কবি, নাট্যকার বেন জনসন এবং মাইকেল এঞ্জেলোর মতো শিল্পীদের জীবনীও লিখেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন সাহিত্যের এক উঁচুমানের সমালোচক।

কিন্তু যত বিখ্যাত মানুষের জীবনীই তিনি লিখুন না কেন নিজের জীবনী কিন্তু তিনি আমৃত্যু প্রকাশিত হতে দেননি। তাঁর মৃত্যুর দু'বছর পরে ১৮৯৫ সালে তাঁর প্রকাশক এইচ. এফ. ব্রাউন তাঁর স্মৃতিকথার ভিত্তিতে সিমন্ডসের একটি জীবনী প্রকাশ করেন, কিন্তু সিমন্ডসের মূল পাণ্ডুলিপিটি তিনি কাউকে দেখতে দেননি। ব্রাউন সাহেব 'যক্ষের ধনের' মতো সিমন্ডসের পাণ্ডুলিপিটি নিজের কাছে আমৃত্যু আগলে রাখেন, শুধু তাই নয় ১৯২৬ সালে মৃত্যুর সময় তিনি পাণ্ডুলিপিটি লন্ডন লাইব্রেরিকে দান করে দিয়ে নির্দেশ দিয়ে যান যে মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যেন পাণ্ডুলিপিটি খোলা না হয় – সেটিকে যেন নিভৃত একটি জায়গায় আবদ্ধ করে রেখে দেয়া হয়।

লন্ডন লাইব্রেরি তাই করলো; ব্রাউন সাহেবের প্যাকেটটিকে একেবারে সিল গালা করে লাইব্রেরির সিন্দুকে তুলে রাখল। এর ২৩ বছর পরে ১৯৪৯ সালে সিমন্ডসের কন্যা ডেম ক্যাথেরিন তাঁর পিতার পাণ্ডুলিপিটি পড়তে চাইলে লন্ডন লাইব্রেরি 'বিশেষ বিবেচনায়' ক্যাথেরিনের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। ক্যাথেরিনের সামনে উন্মোচিত হলো

সবুজ এক বাক্সে রাখা ৬ বাই ১২ বাই ১৮ ইঞ্চি এক খাতা, যার উপরের পৃষ্ঠায় লেখা ছিল – 'J A Symond's papers'[109]। কিন্তু ডেম ক্যাথেরিন লাইব্রেরি থেকে ফিরে এসে এ বিষয়ে কাউকে কিছু বললেন না, বাবার পাণ্ডুলিপি নিয়ে কোনো ধরনের উচ্চবাচ্য পর্যন্ত করলেন না। ফলে সিমন্ডসের পাণ্ডুলিপি রহস্য হয়েই রইলো আমজনতার কাছে।

১৯৫৪ সালে লাইব্রেরির উপকমিটি একটি মিটিং করে বাছাই করা কিছু বিশেষজ্ঞকে (বোনাফাইড স্কলার) পাণ্ডুলিপি পড়বার অনুমতি দিলেন, তাও বিশেষ প্রহরায়। কি ছিল সেই পাণ্ডুলিপিতে? কেন এই সতর্কতা? কেনই বা এত লুকোচুরি? লুকোচুরির কারণ বোঝা গেল পাণ্ডুলিপিটার 'ইমোশোনাল ডেভেলপমেন্ট' নামে একটা অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ পড়েই[110] –

> 'আমি যখন কারো জীবনী লিখি, তখন চেষ্টা করি সততার সাথে আর অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে। আমি মনে করিনা আমার নিজের জীবনীর ক্ষেত্রেও সেটা কোনো ব্যতিক্রম হবে। কিন্তু বিভিন্ন বোধগম্য কারণে আমার জীবনের সবগুলো ব্যাপার আমার পক্ষে আগে ঠিক মতো বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। আমি ভবিষ্যত মনোবিজ্ঞানী এবং সাইকোলজির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এমন একটি উপকরণ রেখে যেতে চাইছিলাম যেটা পড়ে তারা বুঝতে পারে, এমন মানুষও আছে যার কোনো অস্বাভাবিকতা কিংবা মনোবৈকল্য ছিল না, আগাগোড়া একটি সুস্থ, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর জীবন উপভোগ করেছে, কিন্তু এমন একটি অনুভূতিময় কামনায় মত্ত ছিল – যা বর্তমান সমাজের চোখে আপত্তিকর। আর সেই অনুভূতির নাম – পুরুষে পুরুষে প্রেম – সমকামিতা!'

---

[109] John Addington Symonds, The Memoirs of John Addington Symonds, Univ of Chicago Pr, 1986

[110] পূর্বোক্ত।

জন এডিংটন সিমন্ডস বড় হয়েছিলেন ইংল্যান্ডের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হিসেবে। আর দশটা ছাত্রের মতোই স্কুলে গিয়েছিলেন, বন্ধু বান্ধবেরও অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি ছোটবেলায় খেলাধূলা তেমন পছন্দ করতেন না, তাঁর চেয়ে ঢের বেশি পছন্দ করতেন বই পড়তে। পরে অক্সফোর্ডে গিয়ে গ্রীক সাহিত্যের সাথে পরিচয় ঘটে। গ্রীক সাহিত্য এবং ইতিহাস পড়েই সিমন্ডস বুঝতে পারেন সমকামিতা পৃথিবীর ইতিহাসে সবসময়ই ছিল, কখনো প্রকাশ্যে, কখনোবা অপ্রকাশ্যে। বিশেষত হোমারের *ইলিয়াড* পড়ে তিনি অভিভূত হন। গ্রীক দেবতা হার্মেসের কাহিনীও তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছিল দারুণভাবে, উপন্যাসে বর্ণিত হার্মেসের সৌন্দর্য তাঁর গভীরে তৈরি করলো 'ফোয়ারার এক অবিনাশী ফল্গুধারা'[111]। সব মিলিয়ে গ্রীক সাহিত্য সিমন্ডসের সামনে খুলে দিলো প্রবৃত্তির এক অজানা দুয়ার।

এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটিকালীন একটা সময়ে নিজের বাড়িতে যান অবসর কাটাতে। সেখানে তিনি তাঁর চেয়ে বছর তিনেকের ছোট এক ছেলের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু অচিরেই বুঝলেন এই সম্পর্ককে তিনি স্থায়ী করতে পারবেন না। তিনি যতই গ্রীক সাহিত্য পড়ুন না কেন, তিনি জানেন গ্রীক সমাজের সাথে ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের বিস্তর ফারাক। ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডে সমকামিতা শুধু অস্বীকৃত নয়, দণ্ডনীয় অপরাধ। তিনি লিখলেন -

> I could not marry him; modern society provided no bond of comradeship whereby we might have been united. So my first love flowed to waste...

১৮৬১ সালে সিমন্ডস আরেকটি সমকামিতার সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন, আলফ্রেড ব্রুক নামের একুশ বছরের এক যুবকের সাথে- কিন্তু সে সম্পর্কও স্থায়ী হয়নি। এ সময় বিভিন্ন মানসিক দ্বন্দ্বে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে থাকে। যৌন হতাশায়

---

[111] জন এডিংটন তার জীবনীতে এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন - 'Hermes, in his prime and bloom beauty, unlocked some deeper fountains ... in my soul' (source: The Memoirs of John Addington Symonds, পূর্বোক্ত)

ভুগতে থাকেন সিমন্ডস। এর মধ্যে তিনি বেশ কয়েকজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। এদের মধ্যে একজন 'রক্ষিতা' রাখারও পরামর্শ দেন, কিন্তু সিমন্ডসের তা মনঃপূত হয়নি।

১৮৮৪ সালে বাবার চাপে পড়ে জ্যানেট ক্যাথেরিন নামের এক নারীকে বিয়ে করেন সিমন্ডস। ভাবলেন এর ফলে তিনি 'অস্বাভাবিকতা' থেকে মুক্তি পাবেন। বছর খানেকের মধ্যেই তিনি চার সন্তানের পিতা হন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর উপলব্ধি হতে শুরু করল যে, বিয়ে করাটা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। তিনি তাঁর জীবনীতে লিখলেন - 'Perhaps the great crime of my life was my marriage.'।

ধীরে ধীরে আবারো একাকী হয়ে উঠলেন সিমন্ডস। রোগ শোক প্রায়শঃই হানা দিতে থাকে আগের মতোই। তাঁর ডাক্তার পিতা সিমন্ডসের রোগ সনাক্ত করে বললেন তাঁর টিবি হয়েছে। বায়ু পরিবর্তন করে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বেশিরভাগ সময়ই তিনি ইতালি এবং সুইজারল্যান্ডে কাটাতে থাকেন। তিনি নিজেকে নিয়ে দুটো স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি করে ফেললেন - একটা নিজের স্ত্রী-কন্যাদের জন্য, আর অন্যটি তাঁর বন্ধু জগৎ নিয়ে। তাঁর ফুসফুসের অবস্থার আরো অবনতি ঘটলে তিনি স্ত্রীকে বলেন যে, তাদের একসাথে আর থাকা উচিৎ নয় - এতো রোগ-শোক নিয়ে ঘর সংসার করে বউকে বিপদে ফেলা খুবই অনৈতিক। বলাবাহুল্য সমকামিতার ইতিহাসে সিমন্ডসই প্রথম কিংবা সর্বশেষ ব্যক্তি নন- যাকে 'সংসার' নামক এই দ্বিচারিতার সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়েছে। এখনো সমাজের চাপে বহু সমকামীদেরই 'সংসার ধর্ম'পালন করতে হয়, অভিনয় চলতে হয় সমাজের আর দশটি 'স্বাভাবিক' মানুষের মতোই। সমকামীদের জীবনের এ এক নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা।

এ সময় সিমন্ডস আবারো গ্রীক সাহিত্য এবং সংস্কৃতি নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। তিনি প্লেটো, অ্যারিস্টোফেন, জেনোফন এবং অন্যান্যদের নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে যেতে থাকেন। এ সময়েই তিনি নীরবে, নিভৃতে রচনা করেন ৮৮ পৃষ্ঠার

একটা পুস্তিকা- 'A Problem in Greek Ethics'। ১৮৮৩ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পুস্তিকাটির মাত্র দশ কপি ছাপিয়েছিলেন আর বিতরণ করেছিলেন তাঁর খুব কাছের বন্ধুমহলে। এ বইয়ে তিনি গ্রীক সংস্কৃতির পাইদারেস্তিয়া বা কিশোর প্রেম, ইরোমেনোস - ইরাস্তেসসহ বহু হারিয়ে যাওয়া বিষয় আশয় অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় তুলে আনেন। তিনি তাঁর বইয়ে স্পষ্ট করে লেখেন -

> বহু মেডিকেল ডাক্তার এবং আইনি লেখকেরা মোটেও অবগত নন যে,ইতিহাসের পাতায় বহু মহান এবং উন্নত জাতির অস্তিত্ব আছে যারা সমকামিতার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো না, বরং ছিল পুরোপুরি সহানুভূতিশীল। এমনকি, তাঁরা সমকামিতার চর্চা করে আত্মিক এবং সামাজিকভাবে লাভবান হয়েছিল।

বছর খানেক পরে তিনি আরেকটি বই লেখেন - The problem in Modern Ethics (১৮৯১)। তিনি এ বইয়ে সমকামিতার তৎকালীন ধ্যান ধারণা এবং বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক কারণ লিপিবদ্ধ করেন। এই বইয়ে তিনি প্রস্তাব করেন যে, সমকামিতা সম্পর্কে নিবর্তনমূলক ধ্যান-ধারণা আর আইন-কানুন রহিত করা প্রয়োজন। এই বইটি পঞ্চাশ কপি ছাপিয়েছিলেন সিমন্ডস এবং খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের মাঝে বিতরণ করেন। তাদের বলে দেয়া হয় যে, তারা বইটি পড়ার সময় বইয়ের পাশে নোট লিখে যেন লেখককে আবার ফেরৎ দেন। ঠিক এ সময়ই বিখ্যাত ইংরেজ কবি অস্কার ওয়াইল্ডকে সমকামিতার অপরাধে দুই বছরের দণ্ড পোহাতে হয়।

সমকামিতার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে 'এ প্রবলেম অব গ্রীক এথিক্স' এবং 'প্রবলেম অব মডার্ণ এথিক্স' – বই দুটোর গুরুত্ব অপরিসীম। এ দুটো বইকে বর্তমানে ইংরেজি সাহিত্যের জগতে প্রথম দিককার পুস্তক হিসেবে বিবেচনা করা হয় যেখানে পুরুষে-পুরুষে প্রেমের সরাসরি তথ্যসূত্র বিশ্বস্তভাবে সন্নিবেশিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সিমন্ডসের মনে হয়েছিল সমকামিতা সম্বন্ধে মানুষজনকে বৈজ্ঞানিকভাবে সচেতন

করতে হলে চিকিৎসাশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারগুলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু সিমন্ডস নিজে চিকিৎসাশাস্ত্রের কোনো বিশেষজ্ঞ না হওয়ায় এদিক থেকে সন্তুষ্টি পাচ্ছিলেন না। ঠিক এসময়ই ১৮৯০ সালে তাঁর সাথে পরিচয় ঘটে ব্রিটিশ ডাক্তার হ্যাভলক এলিসের সাথে। এ যেন ছিল সঠিক সময়ে সত্যিকার মনি-কাঞ্চন যোগ।

এ প্রসঙ্গে পাঠকদের জন্য হ্যাভলক এলিস সম্বন্ধেও কিছু বলে নিতে হয়। সে সময় এলিস ছিলেন সিমন্ডসের চেয়ে প্রায় বছর বিশেক ছোট। নিজে সমকামী না হলেও হ্যাভলক এলিসের স্ত্রী ছিলেন সমকামী[112]। ফলে তিনি খুব কাছ থেকে সমকামীদের জীবন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমকামিতার আইনি স্বীকৃতির আগে এই প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া দরকার। ১৮৯৭ সালে তিনি প্রকাশ করেন 'Sexual Inversion' নামের একটি অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। গ্রন্থটি এলিসের বলা হলেও আসলে গ্রন্থটি লিখেছিলেন এলিস এবং সিমন্ডস দু'জনে মিলে। হ্যাভলক এলিস লিখেছিলেন বইটির মূল অংশ - চিকিৎসাশাস্ত্র এবং জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, আর ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক তথ্য সরবরাহ করেছিলেন জন এডিংটন সিমন্ডস। এ ছাড়াও সিমন্ডস 'উলরিচসের দৃষ্টিভঙ্গি' নামে একটি অধ্যায় বইটিতে নিজের নামেই সংযুক্ত করেন এবং তাঁর পুর্বেকার লেখা 'প্রবলেম ইন গ্রিক এথিক্স' সন্নিবেশিত করেন বইয়ের পরিশিষ্টে। বইটির প্রথম মুদ্রণ দু'জনের নামেই প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। কিন্তু বইটি প্রকাশের পর সিমন্ডেসের পরিবারের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হলো - প্রকাশকের কাছে দাবি করা হলো যেন, বইটি থেকে সিমন্ডসের নাম এবং সমস্ত রেফারেন্স তুলে নেয়া হয়। সিমন্ডসের বইয়ের সম্পাদক হোরাশিও ব্রাউন সব জায়গা খুঁজে খুঁজে বইটির কপি সংগ্রহ করে বাজার থেকে তুলে নেয়ার প্রচেষ্টা চালান, যদিও

---

[112] যে কোনো বিচারে হ্যাভলক এলিস এবং তাঁর স্ত্রী এডিথ লীজের বিয়ে ছিল সে সময়ের প্রেক্ষাপটে খুবই ব্যতিক্রমী। এলিসের স্ত্রী এডিথ লীজ ছিলেন নারীবাদী কবি (তাঁর অন্য চার বোনেরা ছিলেন আবার সবাই অবিবাহিত)। তাঁরা পারস্পরিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও দু'জনেই সাড়াজীবন মুক্ত সম্পর্কে (Open relationship) আস্থাশীল ছিলেন, এবং একে অন্যের যৌনস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেন না । যৌনতার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন সমস্ত সামাজিক সংস্কারের ঊর্ধ্বে।

কিছু কপি তাঁর হাত গলে ঠিকই পাঠকদের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল। এই চাপ সামলাতে গিয়ে এলিসকে মহাবিপদে পড়তে হয়। অবশেষে, বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশের সময় এলিস সিমন্ডসের নাম তুলে নেন, 'প্রবলেম ইন গ্রীক এথিক্স' অংশটি পরিশিষ্ট থেকে বাদ দেন 'উলরিচসের দৃষ্টিভঙ্গি' অধ্যায়টির লেখক হিসেবে অজ্ঞাত 'Z' অন্তর্ভুক্ত করেন; এবং সিমন্ডসের দেওয়া তথ্যসূত্রকে 'বিশ্বস্ত সূত্রে' পাওয়া বলে উল্লিখিত করেন[113]। বইটির এই পরিবর্তিত মুদ্রণটি চিকিৎসকদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল, যেটা ছিল আসলে তাঁদের বইটি লেখার পেছনে মূল প্রেরণা।

এই বইয়েই প্রথমবারের মতো ইবিং-এর সমকামিতাকে 'বিকৃতি' বা 'ব্যাধি' হিসেবে প্রচার করার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হয়- বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এলিস বইটিতে ইবিং-এর 'অধঃপতন' তত্ত্বের বিপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি হাজির করেন, তিনি বইটিতে হস্তমৈথুনের সাথে সমকামিতার সম্পর্ক সম্বন্ধে ইবিং-এর ধ্যান-ধারণাও বাতিল করে দেন। আর তারপর ১৯১৫ সালে এলিস প্রকাশ করেন আরেকটি গ্রন্থ 'Psychology of Sex'। এলিস যে সময় এ ধরনের গবেষণা শুরু করেছিলেন সে সময়টায় ইংল্যান্ড ছিল পুরোমাত্রায় রক্ষণশীল। ফলে গবেষণা করতে গিয়ে এলিসকে দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তাঁর প্রথম বই প্রকাশের পর বইয়ের সবগুলো কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়। প্রকাশককে পেতে হয় কঠিন শাস্তি। পরে তাঁর গবেষণাকাজের অধিকাংশই আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল[114]।

সমকামিতার গবেষণায় আরেকজন গবেষক -যার গুরুত্ব অপরিসীম; তিনি হলেন

---

[113] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, পূর্বোক্ত।

[114] কথিত আছে, এক পুলিশের গোয়েন্দা ১৮৯৮ সালের ২৭ শে মে লন্ডনের একটি বইয়ের দোকান থেকে দশ শিলিং দিয়ে 'সেক্সুয়াল ইনভারশন' নামে একটি বই ক্রয় করেন। এর চারদিন পরে পুলিশ দোকানে এসে জর্জ বেডব্রাউ নামে দোকানের এক কর্মচারীকে গ্রেফতার করেন দোকানে 'অশ্লীল' বইপত্র রাখার অজুহাতে। এলিসকে গ্রেফতার করা না হলেও এলিস এবং প্রকাশকের উপর দিয়ে রীতিমতো ঝড় বয়ে যায় সে সময়। পত্র-পত্রিকাতেও নানা রকমের রং-বেরঙের কেচ্ছা কাহিনী লেখা হতে থাকে। বেডব্রাউকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং শাস্তি দেয়া হয়। এলিস সব কিছু দেখে এতই ক্ষুব্ধ হন যে তিনি তাঁর পরবর্তী বই আর ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশ করবেন না বলে মনস্থ করেন।

জার্মানির মনোবিজ্ঞানী ম্যাগনাস হার্চফিল্ড। তিনি সমকামীদের 'তৃতীয় লিঙ্গ' নামে অভিহিত করে সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ সংক্রান্ত সনাতন ধারণা খণ্ডন করতে প্রয়াসী হন। শুধু গবেষণাই নয়, তিনি সে সময় 'সায়েন্টিফিক এন্ড হিউম্যানিটেরিয়ান কমিটি' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। হার্চফিল্ড ছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ একজন মানুষ। তিনি যুক্তিনির্ভর কথা বলতেন এবং সব ধরনের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা এবং বক্তব্যকে স্বাগত জানাতেন। সমকামিতার নানান দিক বিশ্লেষণ করার জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, মনোবিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক এবং আইনজ্ঞদের তাঁর সংস্থায় স্থান করে দিয়েছিলেন। তাঁর কমিটির শ্লোগান ছিল- 'জাস্টিস থ্রু সায়েন্স'।

বস্তুত এই সংস্থার উদ্যোগে জার্মানিতে প্রথমবারের মতো বৈজ্ঞানিকভাবে সমকামী মানসিকতার কারণ নির্ণয় করা শুরু হয়। শুধু তাই নয়, সমকামিতার আইনি স্বীকৃতির ব্যাপারে এই সংস্থা সচেষ্ট হয়। তখনকার জার্মান ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমকামিতা বিষয়ক আইন সংশোধনের জন্য হার্চফিল্ড পাঁচ হাজার বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষর সম্বলিত দরখাস্ত সরকারের কাছে পেশ করেন। ১৯১৩ সাল থেকে সহযোগী গবেষক ইভান ব্লোচের সাথে মিলে সমকামী মানুষদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন এবং যৌনতা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো্র জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেন, এবং এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'Institut für Sexualwissenschaft' নামে আরেকটি সংগঠনও গড়ে তুলেন। ১৯৩৩ সালে নাৎসীরা ক্ষমতায় এসে হার্চফিল্ডের কাজ বন্ধ করে দেয় এবং এই প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হার্চফিল্ড এবং সমমনা সমস্ত লেখকদের বই পত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আজকে ইন্টারনেটে নাৎসী বাহিনীর বই-পোড়ানোর যে সমস্ত ছবি পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই আসলে হার্চফিল্ডের বিভিন্ন লাইব্রেরির[115] ।

[115] 'The press-library pictures & archival newsreel film of Nazi book-burnings seen today are usually pictures of Hirschfeld's library ablaze', wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_Hirschfeld

চিত্রঃ নাৎসী বাহিনী ১৯৩৩ সালে ক্ষমতা দখলের পর হার্চফিল্ড এবং সমমনা সমস্ত লেখকদের বইপত্র পুড়িয়ে দেয়।

এত কিছু করেও কিন্তু এ সংক্রান্ত গবেষণা থামিয়ে রাখা যায়নি। ফার্ডিন্যান্ড হ্যাক, এডিংটন সায়মন্ডস, ইভান ব্লোচ, ক্লারা থমসন, থিডর হেনরিখ, ইরভিং বেইবার, অটো গ্রস, হুকার, মিলার, স্কোফিল্ড, হেনরি বেঞ্জামিন প্রমুখ গবেষকের বহুমুখী গবেষণা গহীণ আঁধার থেকে সমকামিতাকে নিয়ে আসলো দিনের আলোয়। এদের মতো গবেষকদের জন্যই সহমর্মিতা আর সহিষ্ণুতার ঢেউ এসে লাগে সমাজে। একদিন যাদের অচ্ছুৎ বলে গণ্য করা হতো, দেখা হতো সমাজের 'নিকৃষ্টতম জীব' হিসেবে, তাদের প্রতি বাড়িয়ে দেওয়া হলো সাহায্যের হাত। পৃথিবী জুড়ে বহুসংগঠন গড়ে উঠলো এই সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক মানুষদের সাহায্য করার এবং তাদের মানবিক অধিকার রক্ষার তাগিদে। রক্ষণশীলতা, প্রগতিশীলতা, বিজ্ঞান ও বাস্তবতার প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ আর প্রতিসংঘর্ষে একটা সময় যৌনতা সংক্রান্ত সনাতন ধারণাই গেল পাল্টে। পৃথিবীতে শিল্পবিপ্লব, প্রযুক্তির বিপ্লব, এনলাইটমেন্টের পাশাপাশি হাত ধরে বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করল 'যৌনতার বিপ্লব' – যা মানুষের যৌনতাসংক্রান্ত সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ধ্যান ধারণাকেই আমূল পাল্টে দিলো। আর যে ব্যক্তিটির গবেষণা এই যৌনতার বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আলফ্রেড কিন্সে (১৮৯৪ -১৯৫৬)।

কথিত আছে, প্রকৃতিপ্রেমিক এই তরুণ প্রফেসর কিন্সে গল ওয়াস্প নামে একধরনের বোলতার উপর ক্লাসে একদিন লেকচার দিচ্ছিলেন। সেখান থেকে আলোচনা কোনো একভাবে চলে গেল বোলতাদের যৌনপ্রবৃত্তির দিকে। ক্লাসের অনেক ছাত্র সুযোগ পেয়ে এ সময় নানাধরনের প্রশ্ন করা শুরু করল। কখনও বা তা চলে গেল চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মানুষের যৌনপ্রবৃত্তির দিকেও। কিন্সে তাঁর জীববিজ্ঞানের সীমিত জ্ঞানের আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের কৌতুহল মেটাতে থাকলেন। পুরো ক্লাস পরিণত হলো এক 'সরস' আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এমনকি এর জের পুরোমাত্রায় বজায় রইলো ক্লাসের বাইরেও। অনেক ছাত্র-ছাত্রী কিন্সের কক্ষে এসে ব্যক্তিগতভাবে যৌনতা বিষয়ে নানা ধরনের পরামর্শ চাওয়া শুরু করলো। কিন্সে দেখলেন, এই বিষয়টি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ রয়েছে প্রচুর, কিন্তু পুরো বিষয়টিকে ঢেকে রাখা হয়েছে নীতি-নৈতিকতার অদৃশ্য কালো চাঁদরে। তিনি বুঝতে পারলেন, 'সেক্স নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা না করার' এই চিরায়ত সনাতনী প্রথাটা যে করেই হোক ভাংতে হবে। তিনি ছাত্রদের ডীনের কাছে ধরনা দিলেন, এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যৌনশিক্ষার একটি কোর্স চালু করার পক্ষে যুক্তি দেখালেন। বললেন, ছাত্র-ছাত্রীরা যে হারে আমাদের দেশের মতো 'রসময়গুপ্ত মার্কা' চটি বই পড়ে সেক্স সম্বন্ধে ভুল ধারণা পাচ্ছে, তাঁর থেকে আমরা একাডেমিকভাবে কিছু পড়াই না কেন! কিন্সে শেষ পর্যন্ত তাঁর আবেদন মঞ্জুর করিয়ে ছাড়লেন। তিনি ফুল হাউজ অডিটোরিয়ামে একাডেমিকভাবে প্রথম 'সেক্স কোর্স' –এর উপর ক্লাশ নিতে শুরু করলেন। তবে সে ক্লাস উন্মুক্ত ছিল কেবল শিক্ষকবৃন্দ, গ্র্যাজুয়েট কিংবা সিনয়র ছাত্র, কিংবা বিবাহিত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। কিন্সে আগের মতোই ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কৌতুহল মিটাতে লাগলেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি এবং যৌনজীবনের উপর বিজ্ঞানভিত্তিক কোনো ভালো সমীক্ষাই বাজারে নেই। ফলে একটা সময় কিন্সের নিজেকেই

যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ে গবেষণায় নামতে হলো। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমীক্ষার প্রয়োজনে প্রশ্নাবলী তৈরি করলেন, এবং দীর্ঘ সময় ধরে এ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে এ গবেষণা চালিয়ে ১৯৪৮ সালে লিখলেন 'Sexual Behavior in the Human Male' নামে একটি যুগান্তকারী বই; এবং এর পাঁচ বছর পর ১৯৫৩ সালে বের করেন 'Sexual Behavior in the Human Female'। গ্রন্থ দুটির মধ্য দিয়ে মানব জীবনের এমন কিছু দিক উন্মোচিত হলো যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য নতুন, এবং অনেকের কাছেই খুব 'অস্বস্তিকর'। এমনকি এসব তথ্য দেখে কিন্সে নিজেও খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। সেই পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই কিন্সের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এলো, মানুষকে সামাজিকভাবে কেবল বিষমকামী বলা একেবারেই ঠিক নয়, বহু মানুষ আছে যারা যৌনপ্রবৃত্তিগত দিক দিয়ে সমকামী। শুধু তাই নয়, তিনি বললেন, যৌনপ্রবৃত্তিকে কেবল বিষমকাম আর সমকাম – মোটা দাগে এই দু'ভাগ করাটাও বোকামি। যৌনতার সম্পূর্ণ ক্যানভাসকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিমাপ করার জন্য কিন্সে উদ্ভাবন করলেন তাঁর বিখ্যাত 'কিন্সে স্কেল'। এ স্কেল সমন্ধে কিন্সে তার বইয়ে বলেন[116],

> 'পুরো জনসমষ্টিকে কেবল সমকামী আর বিষমকামী - এ দুই নির্দিষ্ট ভূবনের বাসিন্দা মনে করা ভুল হবে। পৃথিবীটা কেবল - ছাগল আর ভেড়ায় বিভক্ত নয়। প্রকৃতিতে খুব কম ক্ষেত্রেই এ ধরনের চরমসীমার রাজত্ব দেখা যায়, এর চেয়ে বরং এখানে থাকে বিবিধ উপাদানের সুষম বণ্টন।'

কিন্সের স্কেলেটি নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। স্কেলের দুই প্রান্তকে '০' এবং '৬' হিসেবে চিহ্নিত হয়। ০ দাগে অবস্থিত ব্যক্তিরা পরিপূর্ণভাবে বিষমকামী, আর ৬ দাগে অবস্থিত ব্যক্তিরা সম্পূর্ণভাবে সমকামী। দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী অবস্থা পাঁচটিভাগে বিভক্ত; এবং ওই পাঁচটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যৌনতার যে রূপ প্রতিভাত হচ্ছে তাকে

[116] Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin, Alfred C. Kinsey Paul H. Gebhard , Sexual Behavior in the Human Female, AND Sexual Behavior in the Human Male, W. B. Saunders Company , 1953

উভকামিতা বলাই শ্রেয়, যদিও উভকামিতার রকমফের আছে। নীচের ছকটি দেখলে এ সম্বন্ধে আরেকটু ভালো বোঝা যাবে:

রেটিং	বর্ণনা
০	পরিপূর্ণভাবে বিষমকামী
১	মূখ্যত বিষমকামী, কদাচিৎ সমকামী
২	মূখ্যত বিষমকামী, কিন্তু প্রায়শই সমকামী
৩	বিষমকামিতা এবং সমকামিতার প্রভাব সমান
৪	মূখ্যত সমকামী, কিন্তু প্রায়শই বিষমকামী
৫	মূখ্যত সমকামী, কদাচিৎ বিষমকামী
৬	পরিপুর্ণভাবে সমকামী
X	অযৌনপ্রজ (Asexual)

উপরের ছকটি কিন্সের স্কেলের সারমর্ম বলা যেতে পারে, যদিও কিন্সে বইটি লিখার সময় অযৌনপ্রজদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেননি। এটি স্কেলে অন্তর্ভুক্ত হয় পরে। আগেই বলা হয়েছে '০' দাগাঙ্কিত কক্ষটি থাকে পরিপূর্ণভাবে বিষমকামীদের দখলে। এই কক্ষে থাকা লোকেরা কখনোই সমকামের সাথে যুক্ত হয় না। '১' চিহ্নিত কক্ষে অবস্থানরত ব্যক্তিরা মূলত বিষমকামী হওয়া সত্ত্বেও কালেভদ্রে সমকামিতার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। এরা পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে কিংবা কৌতুহলবশত হঠাৎ করে সমকামী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেও এর সাথে কোনো গভীর মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠে না। '২' চিহ্নিত কক্ষের লোকেরা প্রবৃত্তিগত দিক দিয়ে এদের মতোই, কিন্তু এদের সমকামী প্রবণতা আরেকটু বেশি; কিন্তু তারপরও তা কখনোই বিষমকামীতাকে ছাপিয়ে যায় না। '৩' নম্বর কক্ষের আধিবাসীরা হয়ত সত্যিকার উভকামী। এদের সম্পর্কে কিন্সে

বলেন[117], 'তারা সমানভাবে দুই ধরনের সংশ্রবই গ্রহণ এবং উপভোগ করে থাকে। কোনোটির উপরেই তাদের কোনো নির্দিষ্ট পক্ষপাতিত্ব নেই।' '৪' নং কক্ষের সদস্যরা সমকামী হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই বিষমকামের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। একইভাবে '৫' নং কক্ষে এমন কিছু মানুষের সন্ধান মিলবে যারা সমকামী হয়েও মাঝে মধ্যে কিংবা কদাচিৎ বিষমকামে জড়িয়ে পড়ে। '৬' নং কক্ষের বাসিন্দারা পরিপূর্ণ সমকামী। ছকটি ভালোভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, ০ এবং ৬ বিপরীত মেরুতে। তেমনিভাবে ১ এবং ৫ পরস্পরের বিপরীত। ঠিক একইভাবে ২-এর বিপরীতে ৪-এর অবস্থান। অর্থাৎ, ০ এবং ৬ –এই চরমসীমা বাদ দিলে বাকি পাঁচটি কক্ষের অধিবাসীরা কমবেশি উভকামী।
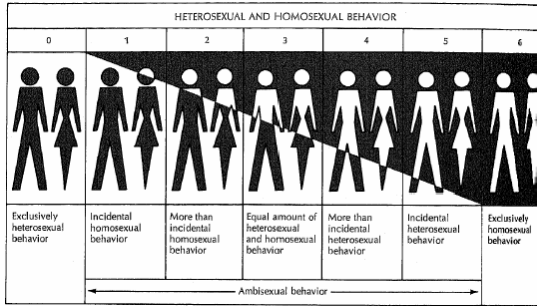
চিত্র : কিন্সে স্কেল থেকে বোঝা যায়, যৌনপ্রবৃত্তিকে কেবল সমকামী আর বিষমকামী – এ দুই ভাগে ভাগ করা ভুল হবে ।

যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ে কিন্সের যুগান্তকারী গবেষণা বই আকারে প্রকাশের পর পরই ড. কিন্সে তৎক্ষণাৎ সেলিব্রিটিতে পরিণত হয়ে গেলেন। ১৯৫৩ সালের অগাস্টের ২৪ তারিখে ড. কিন্সেকে নিয়ে টাইম ম্যাগাজিনে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন বের হলো, এবং তাতে লেখা হলো – 'কিন্সে সেক্সের ক্ষেত্রে সেই কাজটিই করলেন যে কাজটি অনেকদিন আগে কোপার্নিকাস করেছিলেন পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে'। এমনকি তাঁকে নিয়ে একটি কমিকস বই পর্যন্ত বাজারে বের হয়ে গেল – "ওহ! ড. কিন্সে'। মার্থারে'র লেখা এই কমিক বই-এর বিক্রি সে সময়ই আধা মিলিয়নে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

---

117 পূর্বোক্ত।

টাইম ম্যাগাজিনের (আগস্ট ২৪, ১৯৫৩); প্রচ্ছদে ড. কিন্সে

কিন্সে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার মাধ্যমে নতুন ধারা তৈরি করার পর আরো বহু গবেষক এ ধরনের কাজে এগিয়ে এলেন। এর মধ্যে সান্ড্রা বেম, জ্যানেট স্পেন্সর, রবার্ট হেলম্রিখ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সারা পৃথিবী জুড়ে যৌন মনোবিজ্ঞানীদের নানা পদের গবেষণায় নতুন নতুন তত্ত্বের আগমন ঘটতে লাগল। এর সাথে যোগ দিলেন জীববিজ্ঞানীরাও। মনস্তাত্ত্বিক, আচরণগত, সমাজ-সাংস্কৃতিক, এবং যৌন অভিজ্ঞতার পাশাপাশি জেনেটিক, কগনিটিভ, হরমোনাল, শরীরবৃত্তীয়, মস্তিষ্ককেন্দ্রিক এবং বিবর্তনীয় নানা রকমের গবেষণা যৌনপ্রবৃত্তির নানা আকর্ষণীয় দিক উন্মোচন করে চলল। প্রতিদিনই নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে আমরা ঝালাই করে নিতে থাকলাম আমাদের পারিপার্শ্বিকতাকে।

১৯৮০ সালে ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল স্টর্মস-এর একটি

গবেষণা পত্রে মত প্রকাশ করলেন[118], যৌন প্রবৃত্তি নির্ধারিত হওয়া উচিৎ কোনো ব্যক্তির ফ্যান্টাসি এবং কামপ্রবণতার (Eroticism) উপর নির্ভর করে, কারো দৈনন্দিন যৌনকর্মের উপর ভিত্তি করে নয়। তিনি দেখালেন, কোনো কোনো সময় উভকামীর ফ্যান্টাসির জগৎটা এমনভাবে আচ্ছন্ন থাকে যে, তা কেবলমাত্র পরিপূর্ণ বিষমকামের সাথেই তুলনীয়। আবার বিপরীত ছবিটাও কখনো সখনো প্রকট হয়ে উঠে। অর্থাৎ, উভকামীর মধ্যে দেখা দিতে পারে তীব্র সমকামিতার প্রকাশ।

এরপর ১৯৮৫ সালে ফ্রিৎস ক্লেইন তাঁর সহযোগী সেপেকফ এবং উলফের সাথে মিলে যৌনতা পরিমাপের একটু ভিন্নধর্মী স্কেল উদ্ভাবন করেন; একে 'Klein Sexual Orientation Grid' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্সের স্কেলটি ছিল সরল রৈখিক এবং একমাত্রার। ক্লেইন একে দ্বিমাত্রার ছক (মেইট্রিক্স) আকারে প্রকাশ করেন। তিনি যৌনতাকে স্থবির নয়, বরং 'গতিশীল' এবং 'বহু চলক সমৃদ্ধ' জটিল ব্যাপার বলে মনে করেন। তিনি তাঁর ক্লেইন-স্কেল নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যোগ করেন এবং মত প্রকাশ করেন - যৌনতার ব্যাপারটি পুরোপুরি বুঝতে হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন; এগুলো হলো, যৌনপ্রবৃত্তি, যৌন আচরণ, যৌন আকর্ষণ, যৌনতা সম্বন্ধে ফ্যান্টাসি, আবেগ, যৌনসঙ্গী, জীবনধারা, আত্মপরিচয় ইত্যাদি। এইভাবে নতুন-নতুন গবেষণায় প্রতিনিয়ত উন্মোচিত হতে থাকে যৌনতা বিষয়ক নানান দিক। তবে তারপরও কিন্সের গুরুত্ব কখনোই ম্লান হয়নি। বরং বলা যেতে পারে, যৌনতা বিষয়ে সমস্ত গবেষণার ভিত হিসেবে কিন্সের গবেষণাকে চিহ্নিত করা হয়। সেজন্য কিন্সের গবেষণার প্রায় ষাট বছর পরে আজও গবেষক রবার্ট এপস্টেইন সায়েন্টিফিক আমেরিকান মাইন্ডের একটি বইয়ে (২০০৬) লেখেন:

> "Ever since the late 1940s, when biologist Alfred Kinsey published his extensive reports on sexual practices in the U.S., it has been

[118] Michael D. Storms, Theories of sexual orientation. Journal of Personality and Social Psychology 38: 783-792, 1980.

> clear, as Kinsey put it, that people "do not represent two discrete populations, heterosexual and homosexual....The living world is a continuum in each and every one of its aspects." A recent position statement by the APA, the American Academy of Pediatrics and eight other national organizations agrees that "sexual orientation falls along a continuum." In other words, sexual attraction is simply not a black-and-white matter, and the labels "straight" and "gay" do not capture the complexities."

যৌনপ্রবৃত্তি যে কেবল সাদা- কালো এই দুই চরমসীমায় বিভক্ত নয় – মানবসমাজে এমন চিন্তা-চেতনার ক্রমোত্তরণ ঘটানোর জন্য যে ব্যক্তিটির গবেষণা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে তিনি হলেন জীববিজ্ঞানী আলফ্রেড কিন্সে। মূলত কিন্সের গবেষণাই ষাটের দশকে সূচিত করে যৌনতার বিপ্লবের (sexual revolution) এবং পরবর্তীতে উন্মোচন করে দেয় লেসবিয়ন, গে, বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডারদের মতো সংখ্যালঘু মানুষের 'এলজিবিটি[119] আন্দোলনের' দুয়ার। তবে সে সমস্ত মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে ঢুকবার আগে আমাদের আধুনিক জীব বিজ্ঞান আর জেনেটিক্সের বইয়ের পাতায় একটু ভালোমতো চোখ রাখা দরকার। কারণ হরমোন, শরীরবৃত্তীয় এবং জিন সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা ধীরে ধীরে কাটাতে সাহায্য করেছে ধোঁয়াশার অস্বচ্ছ মেঘ। আগামী অধ্যায়গুলোতে আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এ সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণার ফলাফলে চোখ রাখলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব সমকামিতা কতটুকু জেনেটিক, আর কতটুকুই বা পরিবেশগত।

---

[119] LGBT (or GLBT) is an acronym referring collectively to lesbian, gay, bisexual, and transgender people.

ষষ্ঠ অধ্যায়

গে মস্তিষ্ক এবং গে জিনের খোঁজে

সমকামীদের যৌনপ্রবৃত্তি আমাদের পরিচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিষমকামী লোকজনের থেকে আলাদা, এটা আমরা জানি। কারণ তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে আকর্ষণ অনুভব করে সমলিঙ্গের প্রতি। যেহেতু বিজ্ঞানের কাজই হচ্ছে প্রতিটি ঘটনার পেছনে যুক্তিনিষ্ঠ কারণ অনুসন্ধান, তাই বৈজ্ঞানিক পেশায় নিয়োজিত অনেক গবেষকই অনুমান করলেন সমকামিতার পেছনেও নিশ্চয় কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ থাকতে হবে। কিন্তু কারণের উৎসটা কোথায়? তাদের মস্তিষ্কের আকার, আকৃতি বা গঠন কি সাধারণদের থেকে একটু আলাদা? এ ব্যাপারটি বিজ্ঞানীদের ভাবিয়েছে পুরোমাত্রায়। ভাবনার কারণ আছে। কারণ যৌন-প্রবৃত্তির কেন্দ্রীয় উৎস হলো মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের নানা পছন্দ, অপছন্দ, ঘৃণা, অভিরুচি আর ফ্যান্টাসি। মস্তিষ্কই জীবনের বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সিদ্ধান্তে আসে আমাদের ঐশ্বরিয়াকে ভালো লাগতে হবে, নাকি শাহরুখকে। মস্তিষ্কই সিদ্ধান্ত নেয় এই মুহূর্তে আমাদের ভূতের গল্প ভালো লাগবে, নাকি আবেগময় রোমান্টিক উপন্যাস। কাজেই যৌনপ্রবৃত্তি তৈরিতে মস্তিষ্কের ভূমিকা কি সেটা বিজ্ঞানীদের জন্য খুব ভালো করে বোঝা চাই। কিন্তু সমকামী মস্তিষ্ক বিশ্লেষণের আগে বিজ্ঞানীরা আরেকটি জিনিস খুব গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ করেছেন। সেটা হচ্ছে নারী পুরুষের মস্তিষ্ক আর অর্জিত ব্যবহারে পার্থক্য।

মস্তিষ্কের যৌনতা: নারী বনাম পুরুষ

বিজ্ঞানীরা প্রথম এধরনের গবেষণা শুরু করেছিলেন ল্যাবরেটরিতে ইঁদুরদের মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে। ১৯৭৮ সালে ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রজার গোর্কি ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন ছেলে ইঁদুরের মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালমাস (Hypothalamus) নামের প্রত্যঙ্গটি মেয়ে ইঁদুরের থেকে তিনগুণ বড়। ঠিক একই ধরনের পার্থক্য বিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে পেলেন মানুষের মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করেও। পুরুষ মস্তিষ্কের সুপ্রাকিয়াস্মিক নিউক্লিয়াসের (Suprachiasmatic Nucleus) আকার মেয়েদের চেয়ে প্রায় ২.৫ গুণ বড় হয়। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে কর্পাস কালোসাম (Corpus Callosum) এবং এন্টিরিয়র কমিসুরের (Anterior commissure) নামে দুইটি প্রত্যঙ্গের আকার পুরুষদের প্রত্যঙ্গগুলোর তুলনায় বিবর্ধিত পাওয়া গেছে। কিন্তু এগুলোর কোনো প্রভাব কি প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় আছে? এক কথায় জবাব দেয়া মুশকিল। জীববিজ্ঞানীরা যেমন পুরুষ-নারীর মস্তিষ্কের আকার আয়তন আর গঠন নিয়ে গবেষণা করেছেন, তেমনি তাদের অর্জিত ব্যবহার নিয়ে নানা ধরনের কৌতুহলোদ্দীপক কাজ করে চলেছেন বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা[120]। তারা বলেন, ডারউইনের 'যৌনতার নির্বাচন' (Sexual Selection) বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা রেখে থাকে তবে এর একটি প্রভাব আমাদের দীর্ঘদিনের মানসপট তৈরিতেও পড়বে। যৌনতার উদ্ভবের কারণে সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে নারী-পুরুষ একই মানব প্রকৃতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি হয়ছে এক ধরনের মনোদৈহিক পার্থক্য – জৈববৈজ্ঞানিক পথেই। মনোবিজ্ঞানীরা অনেকেদিন ধরেই লক্ষ করছিলেন যে, ছেলে মেয়েদের পারস্পরিক চাহিদা পছন্দ, অপছন্দে যেমন মিল আছে, তেমনি আবার কিছু ক্ষেত্রে আছে চোখে পড়ার মতোই পার্থক্য। এটা হবার কথাই। নারী পুরুষ উভয়কেই সভ্যতার সূচনার

---

[120] বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান মুলতঃ বিজ্ঞানের দুটো চিরায়ত শাখাকে একীভুত করেছে; একটি হচ্ছে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান (Evolutionary Biology) এবং অন্যটি বৌদ্ধিক মনোবিজ্ঞান (Cognitive Psychology)। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আমার একটি ই-বুক মুক্তমনা ওয়েব সাইট থেকে ডাউন লোড করা যাবে। ঠিকানা - http://www.mukto-mona. com/ Articles/ avijit/ Manob prokriti Avijit.pdf । এ অধ্যায়টির বেশ কিছু অংশ আমার বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের উপর করা ই-বুক থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রথম থেকেই ডারউইন বর্ণিত 'সেক্সুয়াল সিলেকশন' নামক বন্ধুর পথে নিজেদের বিবর্তিত করে নিতে হয়েছে, শুধু দৈহিকভাবে নয় মন মানসিকতাতেও। দেখা গেছে, ছেলেরা আচরণগত দিক দিয়ে মেয়েদের চেয়ে অনেক প্রতিযোগিতামূলক (Competitive) হয়ে থাকে। ছেলেদের স্বভাবে প্রতিযোগিতামূলক হতে হয়েছে কারণ তাদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে প্রতিযোগিতা করে, যুদ্ধ বিগ্রহ করে বাঁচতে হয়েছে আদিকাল থেকেই। যারা এ ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে পেরেছে তারাই অধিকহারে সন্তান সন্ততি এ পৃথিবীর বুকে রেখে যেতে পেরেছে।

আধুনিক জীবনযাত্রাতেও পুরুষদের এই প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতাকে একটু চেষ্টা করলেই ধরা যাবে। একটা মজার উদাহরণ দেয়া যাক। আমেরিকার একটি জরিপ থেকে দেখা গেছে গাড়ি চালানোর সময় কখনো পথ হারিয়ে ফেললে পুরুষেরা খুব কমই পথের অন্য মানুষের কাছ থেকে সাহায্য চায়। তারা বরং নিজেদের বিবেচনা থেকে নিজেরাই পথ খুঁজে নিতে তৎপর হয়, না পারলে বড়জোর পথ-চিহ্ন বা মানচিত্রের দ্বারস্থ হয়, কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করে না। আর অন্যদিকে মেয়েরা প্রথমেই গাড়ি থামিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেয়। আসলে পুরুষেরা গাড়ি থামিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পছন্দ করে না, কারণ তাদের 'আত্মভরি' মানসিতার কারণে ব্যাপারটাকে তারা 'যুদ্ধে পরাজয়' হিসেবে বিবেচনা করে ফেলে নিজেদের অজান্তেই। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তাদের মানসপটে এত প্রবলভাবে রাজত্ব করে না বলে তারা সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে সমাধানে পৌঁছুতে উদগ্রীব থাকে। শুধু গাড়ি চালানোই একমাত্র উদাহরণ নয়; পুরুষেরা নারীদের চেয়ে অর্থ, বিত্ত আর সামাজিক প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠার প্রতি যে বেশি আকৃষ্ট তা যে কোনো সমাজেই প্রযোজ্য। এটাও এসেছে দীর্ঘদিনের প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা থেকে।

মানব ইতিহাসের পাতায় এবারে একটু চোখ রাখি। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, পুরুষেরা এক সময় ছিল হান্টার বা শিকারি, আর মেয়েরা ফলমূল সংগ্রাহক।

প্রয়োজনের তাগিদেই একটা সময় পুরুষদের একে অন্যের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে; অন্য গোত্রের সাথে মারামারি হানাহানি করতে হয়েছে; নিজের সাম্রাজ্য বাড়াতে হয়েছে; অস্ত্র চালাতে হয়েছে। তাদেরকে কারিগরি বিষয়ে বেশি জড়িত হতে হয়েছে। আদিম সমাজে অস্ত্র চালনা, করা শিকারে পারদর্শী হওয়াকে বেঁচে থাকার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। যারা এগুলোতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে তারাই অধিকহারে সন্তান সন্ততি এ পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে, যারা এগুলো পারেনি তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ইতিহাস ঘাটলে পাওয়া যাবে পুরুষেরা শুধু আত্মরক্ষা করতেই যুদ্ধ করেনি, যুদ্ধ করেছে সাম্রাজ্য বাড়াতে, আর সম্পত্তি এবং নারীর দখল নিতে। এখনো এই মানসিকতার প্রভাব বিরল নয়। এর বাস্তব প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন ভেনিজুয়ালার আদিম গোষ্ঠী ইয়ানোমামো (Yanomamo)দের নিয়ে গবেষণা করে। নৃতত্ত্ববিদ নেপোলিয়ন চ্যাংনন এই আদিম গোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে খুব অবাক হয়েই লক্ষ করেন,

> ‘এরা শুধু সম্পদ আহরণের জন্য যুদ্ধ করে না, এরা যুদ্ধ করে নারীদের উপর অধিকার নিতেও।’

দেখা গেল গোষ্ঠীতে যতবেশি শক্তিশালী এবং সমর-দক্ষ পুরুষ পাওয়া যাচ্ছে, তত বেশি তারা নারীদের উপর অধিকার নিতে পেরেছে।

চিত্রঃ ইয়ানোমামো গোত্রের পুরুষেরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম আক্রমনের আগে এভাবেই সমরশিক্ষা গ্রহণ এবং নিজেদের মধ্যে প্রদর্শন করে থাকে। (ছবি – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

আসলে যতই অস্বীকার করা হোক না কেন, কিংবা শুনতে আমাদের জন্য যতই অস্বস্তি লাগুক না কেন, প্রাককৃষি সমাজে যে সহিংসতা এবং আগ্রাসনের মাধ্যমে জোর করে একাধিক নারীদের উপর দখল নিয়ে পুরুষেরা নিজেদের জিন ভবিষ্যত প্রজন্মে ছড়িয়ে দিয়েছিল, এটা নিষ্ঠুর বাস্তবতা। পুরুষদের এই সনাতন আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় আজকের সমাজে ঘটা যুদ্ধের পরিসংখ্যানেও। এখনো চলমান ঘটনায় চোখ রাখলে দেখা যাবে - প্রতিটি যুদ্ধেই অসহায় নারীরা হচ্ছে যৌননির্যাতনের প্রথম এবং প্রধান শিকার। বাংলাদেশে, বসনিয়া, রুয়ান্ডা, আলবেনিয়া, কঙ্গো, বুরুন্ডিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক, ইরানসহ প্রতিটি যুদ্ধের ঘটনাতেই সেই নগ্ন সত্যই বেরিয়ে আসে যে, এমনকি আধুনিক যুগেও নারীরাই থাকে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিকার।

এদিকে পুরুষেরা যখন হানাহানি মারামারি করে তাদের 'পুরুষতান্ত্রিক' জিঘাংসা চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হয়েছে, অন্যদিকে, মেয়েরা দায়িত্ব নিয়েছে সংসার গোছানোর। গৃহস্থালির পরিচর্যা মেয়েরা বেশি অংশগ্রহণ করায় তাদের বাচনিক এবং অন্যান্য যোগাযোগের ক্ষমতা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি বিবর্ধিত হয়েছে। একটি ছেলের আর একটি মেয়ের মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে গঠনগত যে বিভিন্ন পার্থক্য পাওয়া গেছে, তাতে বিবর্তনীয় অনুকল্পই সঠিক প্রমাণিত হয়। ছেলেদের ব্রেনের আকার গড়পরতা মেয়েদের মস্তিষ্কের চেয়ে অন্তত ১০০ গ্রাম বড় হয়[121], কিন্তু ওদিকে মেয়েদের মস্তিষ্ক ছেলেদের চেয়ে অনেক ঘন থাকে। মেয়েদের মস্তিষ্কে কর্পাস ক্যালোসাম এবং এন্টেরিয়র কমিসুর নামক প্রত্যঙ্গ সহ টেম্পোরাল কর্টেক্সের যে এলাকাগুলো ভাষা

[121] একটি ব্যাপার এখানে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। বইয়ের এই অংশে জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোনো থেকে নারী-পুরুষের মস্তিষ্কের গঠনগত পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, এটি কোনো লিঙ্গভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা নয়। ছেলেদের মস্তিষ্কের আকার বড় হবার অর্থ এই নয় যে, ছেলেদের বুদ্ধি মেয়েদের থেকে বেশি কিংবা ছেলেরা যে কোনো কাজে মেয়েদের থেকে অধিকতর দক্ষ। অতীতে পুরুষতান্ত্রিক প্রথা টিকিয়ে রাখতে এ ধরনের ভুল স্টেরিওটাইপিং এর চেষ্টা করা হয়েছিলো। ছেলে আর মেয়েদের মস্তিষ্কের গঠনে জৈববৈজ্ঞানিক কিছু পার্থক্য রয়েছে, যার কারণ বিবিধ। এইটি বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরাই মূল উপজীব্য।

এবং বাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহায়তা করে বলে মনে করা হয়, মেয়েদের ক্ষেত্রে সেগুলো ছেলেদের চেয়ে অন্তত ২৯ ভাগ বিবর্ধিত থাকে। শুধু তাই নয়, মেয়েদের মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালনের হার ছেলেদের ব্রেনের চেয়ে শতকরা ১৫ ভাগ বেশি বলে জানা গেছে।

আরো কিছু পার্থক্য উল্লেখ করা যাক। ছেলেদের মস্তিষ্কের প্যারিয়েটাল কর্টেক্সের আকার মেয়েদের মস্তিষ্কের চেয়ে অনেক বড় হয়। বড় হয় অ্যামাগদালা (Amygdala) নামের বাদাম আকৃতির প্রত্যঙ্গের আকারও। এর ফলে দেখা গেছে ছেলেরা জ্যামিতিক আকার নিয়ে নিজেদের মনে নাড়াচাড়ায় মেয়েদের চেয়ে অনেক দক্ষ হয়[122]। তারা একটি ত্রিমাত্রিক বস্তুকে সামনে থেকে দেখেই নিজেদের মনের আয়নায় নড়িয়ে চড়িয়ে ঘুরিয়ে ঘারিয়ে বুঝে নিতে পারে বস্তুটি, পেছন থেকে, নীচ থেকে বা উপর থেকে কিরকম দেখাতে পারে। জরিপ থেকে দেখা গেছে, ছেলেরা গড়পরতা বিমূর্ত এবং 'স্পেশাল' কাজের ব্যাপারে বেশি সাবলীল, আর মেয়েরা অনেক বেশি বাচনিক এবং সামাজিক কাজের ব্যাপারে।

মস্তিষ্কের গঠনগত পার্থক্যের প্রভাব পড়ে তাদের অর্জিত ব্যবহারে, আর সেই ব্যবহারের প্রভাব আবার পড়ে সমাজে। অভিভাবকেরা সবাই লক্ষ করেছেন, মেয়ে শিশুরা ছেলে শিশুদের চেয়ে অনেক আগে কথা বলা শিখে যায়- একই রকম পরিবেশ দেয়া সত্ত্বেও। ছেলেদের বাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রগুলো গড়পড়তা মেয়েদের মতো উন্নত না হওয়ায় ডাক্তাররা লক্ষ করেন পরিণত বয়সে ছেলেরা সেরিব্রাল পালসি, ডাইলেক্সিয়া, অটিজম এবং মনোযোগ-স্বল্পতাসহ বিভিন্ন মানসিক রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। এ ধরনের আরো পার্থক্য আছে। ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় ছেলেরা যখন কাজ করে অধিকাংশ সময়ে শুধু একটি কাজে নিবদ্ধ থাকতে চেষ্টা করে, এক সাথে দু-তিনটা কাজ করতে পারে না, প্রায়শই বিশৃঙ্খল করে ফেলে। আর অন্যদিকে

[122] Linn, M. C., & Peterson, A. C. (1985). Emergence and characterization of sex differences in spatial ability: A meta-analysis. Child Development, 56(6), 1479-1498.;

মেয়েরা অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে ছয় সাতটা কাজ একই সাথে করে ফেলে। এটাও হয়েছে সেই শিকারী –সংগ্রাহক পরিস্থিতি দীর্ঘদিন মানসপটে রাজত্ব করার কারণেই। শিকারি হবার ফলে পুরুষদের স্বভাবতই শিকারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হতো, ফলে তাদের মানসজগত একটিমাত্র বিষয়ে নিবদ্ধ হয়ে গড়ে উঠেছিল, আর মেয়েদের যেহেতু ঘরদোর সামলাতে গিয়ে বাচ্চা কোলে নিয়ে হাজারটা কাজ করে ফেলতে হতো, তারা দক্ষ হয়ে উঠেছিল একাধিক কাজ একসাথে করাতে। 'মাল্টি টাস্কিং' এই মজ্জাগত দক্ষতার কারণেই বোধ হয় আজকের এই প্রতিযোগিতামূলক 'কর্পোরেট জগতে'ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে মেয়েরা ভালো করছে, এবং তাদের অধিকহারে সে সব জায়গায় নিয়োগ দেয়া হয়। একটা জিনিস এখানে পরিষ্কার করে বলা দরকার। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বলে যে, ছেলেরা গড়পরতা বিশেষ এবং নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে (সাধারণত) বেশি দক্ষ হয়, আর মেয়েরা সামগ্রিকভাবে বহুমাত্রিক কাজে (Multitasking)। আমাদের আধুনিক সমাজ বহু কিছুর সংমিশ্রনে। এখানে সফল হতে ‘স্পেসিফিক’ দক্ষতা যেমন লাগে, তেমনি লাগে ‘মাল্টিটাসকিং’ও। কাজেই, কেউ যদি নারীদের গৃহবন্দি করার অভিপ্রায়ে সেই পুরাতণ ‘ব্যাক টু দ্য কিচেন’ আর্গুমেন্ট নিয়ে আসতে চান সেটা মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনায় অফিসের চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করার ব্যাপারটা কিন্তু খুবই আধুনিক ঘটনা। এটা ঠিক পুরুষেরা একসময় শিকারি ছিল, আর মেয়েরা সংগ্রাহক, কিন্তু তা বলে কি এটা বলা যাবে, মেয়েরা যেহেতু একসময় সংগ্রাহক ছিল, সেহেতু এখন তারা অফিসে কাজ করতে পারবে না বা কম্পিউটারের চাবি টিপতে পারবে না, এমন দিব্যি তো কেউ দিয়ে দেয়নি।সেজন্যই আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে মেয়েরা অফিস আদালতে তো বটেই, ছেলেদের সাথে পাল্লা দিয়েই কাজ করে চলেছে মাইনিং ফিল্ড থেকে শুরু করে একেবারে নাসার বহির্জাগতিক গবেষণাগারসহ মোটামুটি সব জায়গাতেই।
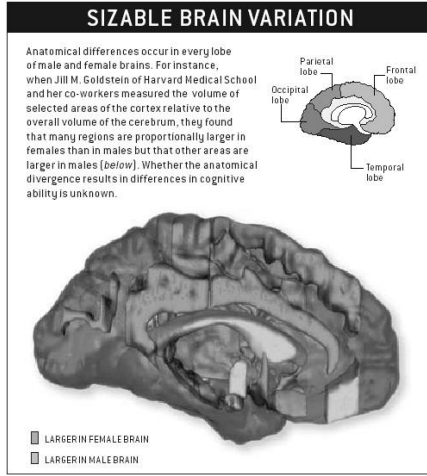
চিত্রঃ বিজ্ঞানীরা ছেলে এবং মেয়েদের মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে গঠণগত বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ করেছেন। (*ছবি*– সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

কিন্তু তারপরেও ছেলে-মেয়েদের পেশাগত কাজের ক্ষেত্রে পছন্দ অপছন্দে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ করা গেছে। ছেলেরা গড়পরতা সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ কাজের ব্যাপারে দক্ষ বলেই সম্ভবত অধিকহারে স্থাপত্যবিদ্যা, গণিত কিংবা প্রকৌশলবিদ্যা পড়তে উৎসুক হয়, আর মেয়েরা যায় শিক্ষকতা, নার্সিং, ডাক্তারি কিংবা সমাজবিদ্যায়। এই ঝোঁক সংস্কৃতি এবং সমাজ নির্বিশেষে একই রকম দেখা গেছে। এই রকম সুযোগ দেয়ার পরও বাংলাদেশের অধিকাংশ মেয়েরা বড় হয়ে বুয়েটের চেয়ে মেডিকেলে পড়তেই উদগ্রীব থাকে। কোনো সংস্কৃতিতেই ছেলেরা খুব একটা যেতে চায় না নার্সিং-এ, মেয়েরা যেমনিভাবে কখনোই 'গ্যারেজ মেকানিক' হতে চায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ।

শুধু তাই নয়, মস্তিষ্ক কীভাবে সমন্বিত হবে সেই প্রক্রিয়াতেও আছে নারী-পুরুষে পার্থক্য। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং (FMRI)

বিশ্লেষণ করে। একটি পরীক্ষায় এক দল মেয়ে এবং ছেলেদের আলাদা করে বসিয়ে তাদের 'লেট্', 'জেট্' প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে দেয়া হয়েছিল। শব্দগুলো উচ্চারণের সময় FMRI ব্যবহার করে তাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলোর ছবি তুলে নেয়া হলো। ফলাফল যা পাওয়া গেল তা সত্যই বিস্ময়কর। দেখা গেল একই কাজ করতে গিয়ে ছেলেদের মাথা আর মেয়েদের মাথা কাজ করছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে। ছেলেরা শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে মস্তিষ্কের কেবল একটি অংশের (বাম ইনফেরিও-র ফ্রন্টাল গাইরাস) উপর নির্ভরশীল থাকে, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের দুই অংশই (বাম এবং ডান ইনফেরিওর ফ্রন্টাল গাইরাস) সমানভাবে আন্দোলিত হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, মেয়েদের মস্তিষ্ক ছেলেদের তুলনায় অনেক সুষমভাবে বিন্যস্ত হয়ে কাজ করে। FMRI-র মাধ্যমে তোলা ছবিগুলো সত্যই নাটকীয়– বিজ্ঞানীরা দেখেছেন শব্দোচ্চারণের সাথে সাথে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ আলোকিত হয়ে উঠে এবং নারী পুরুষে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়[123]।

নারী-পুরুষের মস্তিষ্কের গঠনগত পার্থক্যের ছাপ আছে তাদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদায়। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড বাস ছয়টি মহাদেশ এবং পাঁচটি দ্বীপপুঞ্জের ৩৭টি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা ১০০৪৭ জন লোকের উপর সমীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সঙ্গী নির্বাচনের সময় ছেলেরা গড়পরতা দয়া, বুদ্ধিমত্তা আশা করে, কিন্তু পাশাপাশি প্রত্যাশা করে তারুণ্য এবং সৌন্দর্য। অন্যদিকে মেয়েরাও গড়পরতা ছেলেদের কাছ থেকে দয়া, বুদ্ধিমত্তা আশা করে ঠিকই, পাশাপাশি সঙ্গীর কাছ থেকে আশা করে ধন সম্পদ আর স্ট্যাটাস[124]। এ ধরনের চাহিদার পার্থক্য আরো প্রকট হয়েছে নারী-পুরুষদের মধ্যকার যৌনতা নিয়ে 'ফ্যান্টাসি' কেন্দ্রিক গবেষণাগুলোতেও। ব্রুস এলিস এবং ডন সিমন্সের করা

---

[123] Shaywitz BA, Shaywitz SE, Pugh KR, Constable RT, Skudlarski P, Fulbright RK, Bronen RA, Fletcher JM, Shankweiler DP, Katz L, et al., Sex differences in the functional organization of the brain for language, Nature. 1995 Feb 16;373(6515):561-2.

[124] Buss, D.M., 1989. Sex differences in human mate preferences: evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences 12, pp. 1–49.

ইউনিভারসিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণায় বেড়িয়ে এসেছে যে, পুরুষ এবং নারীদের মধ্যকার যৌনতার ব্যাপারে ফ্যান্টাসিগুলো যদি সততার সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে তিনজনের মধ্যে একজন পুরুষ একাধিক নারীর সাথে যৌনতার ফ্যান্টাসিতে ভোগে, এমনকি সারা জীবনে তাদের পার্টনারের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে কল্পনা করে তারা আমোদিত হয়ে উঠে- আর মেয়েদের মধ্যে সে সংখ্যাটা শতকরা মাত্র ৮ ভাগ। এলিস এবং সিমন্সের সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করা অর্ধেক সংখ্যক নারীরা অভিমত দিয়েছে, যৌনতা নিয়ে কল্পনার উন্মাতাল সময়গুলোতেও তারা কখনো সঙ্গী বদল করে না, অন্যদিকে পুরুষদের মধ্যে এই সংখ্যাটা শতকরা মাত্র ১২ ভাগ। মেয়েদের যৌনতার ফ্যান্টাসিগুলো তার নিজের পরিচিত যৌনসঙ্গীকে কেন্দ্র করেই সবসময় আবর্তিত হয়, আর অন্যদিকে পুরুষদের যৌনতার ফ্যান্টাসিগুলো সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়েকে নিয়েও উথলে ওঠে। একারণেই গবেষক এলিস এবং সিমন্স তাদের গবেষণাপত্রে এই বলে উপসংহার টেনেছেন [125] –

> ‘পুরুষদের যৌনতার বাঁধন-হারা কল্পনাগুলো হয়ে থাকে সর্বব্যাপি, স্বতঃস্ফুর্ত, দৃষ্টিনির্ভর, বিশেষভাবে যৌনতাকেন্দ্রিক, নির্বিচারী, বহুগামী এবং সক্রিয়। অন্যদিকে মেয়েদের যৌন অভিলাষ অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক, আবেগময়, অন্তরঙ্গ এবং অক্রিয়।’

ছেলে মেয়েদের যৌন-অভিলাষের পার্থক্যসূচক এই প্রবণতার প্রভাব পড়েছে আজকের দিনের বাণিজ্যে এবং পণ্য-দ্রব্যে। এমনি একটি দ্রব্য হচ্ছে ‘পর্ণগ্রাফি’ অন্যটি হলো ‘রোমান্স নভেল’। পর্ণগ্রাফির মূল ক্রেতা নিঃসন্দেহে পুরুষ। পুরুষদের উগ্র এবং নির্বিচারী সেক্স ক্রেজের চাহিদা পূর্ণ করতে বাজার আর ইন্টারনেট সয়লাব হয়ে আছে সফট্ পর্ণ, হার্ড পর্ণ, থ্রি সাম, গ্রুপ সেক্সসহ হাজার ধরনের বারোয়ারি

---

[125] B.J. Ellis, D. Symons (1990), "Sex Differences in Sexual Fantasy: an Evolutionary Psychological Approach", *Journal of Sex Research*, Vol. 27 pp.527 - 555.

জিনিসপত্রে। এগুলো পুরুষেরাই কিনে, পুরুষেরাই দেখে। মেয়েরা সে তুলনায় কম। কারণ, মেশিনের মতো হার্ডকোর পর্ণ পুরুষদের তৃপ্তি দিলেও মেয়েদের মানসিক চাহিদাকে তেমন পূর্ণ করতে পারে না। সমীক্ষায় দেখা গেছে নারীর নগ্ন দেহ দেখে পুরুষেরা যেমন সহজেই আমোদিত হয়, পুরুষের নগ্ন দেহ দেখে মেয়েরা তেমনি হয় না। কারণ - মেয়েদের অবারিত সেক্স জাগ্রত করতে দরকার অবারিত ইমোশন!

আর মেয়েদের এই অবারিত আবেগ জাগ্রত করতে বাজারে আছে 'রোমান্স নভেল'। এই সমস্ত প্রেমোপন্যাসের মূল ক্রেতাই নারী। প্রেম-বিচ্ছেদের পসরা সাজিয়ে শ'য়ে শ'য়ে বই সাড়া দুনিয়া জুড়ে বের করা হয় – আর সেগুলো অনায়াসে বিক্রি হতে থাকে সাড়া বছর জুড়ে, মূলত মেয়েদের হাত দিয়ে। বাংলাদেশে যেমন আছে ইমদাদুল হক মিলন, তেমনি আমেরিকায় সুসান এলিজাবেথ ফিলিপ্স, ভারতে তেমনি সুবোধ ঘোষ কিংবা নীহারঞ্জন গুপ্ত। প্রেম কত প্রকার ও কি কি তা বুঝতে হলে এদের উপন্যাস ছাড়া গতি নেই। আমি শুনেছি, রোমান্স নভেলের জন্য প্রকাশকেরা ইদানীংকালে বিশেষত উঠতি লেখকদের নাকি বলেই দেয়– কীভাবে তার উপন্যাস 'সাজাতে' হবে, আর কি কি থাকতে হবে। একটু প্রেম, অনুরাগ, কমিটমেন্ট, মান–অভিমান, বিচ্ছেদ, ক্লাইম্যাক্স তারপর মিলন। আবেগের পশরা বেশি থাকতে হবে, সে তুলনায় সেক্সের বাসনা কম। বইয়ের নায়িকার সেক্সের সাথে আবার আবেগ মিলিয়ে দিতে হবে, ইত্যাদি। এভাবে প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে রোমান্স নভেলের ম্যানুফ্যাকচারিং। মেয়েরা অনায়াসে কিনছে, আবেগে ভাসছে, হাসছে, কখনো বা চোখের পানি ফেলছে। আর বই উঠে আসছে বেস্ট সেলার তালিকায়।

আরো কিছু আনুষঙ্গিক মজার বিষয় আলোচনায় আনা যাক। পশ্চিমা বিশ্বে এক সময় 'প্লে বয়'-এর পাশাপাশি একসময় প্লে গার্ল' চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। চলেনি। মেয়েরা এ ধরনের পত্রিকা কেনেনি, বরং কিনেছে সমকামী পুরুষেরা ঢের বেশি। ছেলেরা শুধু কেন বল খেলবে আর মেয়েরা পুতুল- এই শিকল ভাঙ্গার অভিপ্রায়ে

ভিন্ন ধরনের খেলনা প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছিল - চলেনি। কারণ কি? কারণ হচ্ছে, আমরা যত আড়াল করার চেষ্টাই করি না কেন, ছেলে মেয়েদের মানসিকতায় পার্থক্য আছে- আর সেটা দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় ছাপ থাকার কারণেই। এই ব্যাপারটিই প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ পত্রিকা ইন্ডিপেন্ডেন্টে এক মায়ের আর্তিতে। সেই মা পত্রিকায় (নভেম্বর ২, ১৯৯২) তার অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন –

> ‘আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে আপনার পত্রিকার বিজ্ঞ পাঠকেরা কি বলতে পারবেন কেন একই রকমভাবে বড় করা সত্ত্বেও যতই সময় গড়াচ্ছে আমার দুই জমজ বাচ্চাদের মধ্যকার নারী-পুরুষজনিত পার্থক্যগুলো প্রকট হয়ে উঠছে? কার্পেটের উপর যখন তাদের খেলনাগুলো একসাথে মিলিয়ে মিশিয়ে ছড়িয়ে রাখা হয়, তখন দেখা যায় ছেলেটা ঠিকই ট্রাক বা বাস হাতে তুলে নিচ্ছে, আর মেয়েটা পুতুল বা টেডি বিয়ার’।
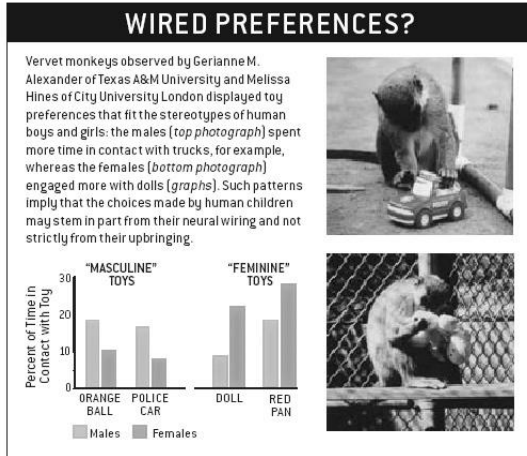
চিত্রঃ – বিজ্ঞানীরা ছেলে ভার্ভেট বানর নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে খেলনার প্রতি পছন্দের প্রকৃতি ভিন্ন হয়, যা আমাদের মানব সমাজের ছেলে-মেয়েদের খেলনা নিয়ে ‘স্টেরিওটাইপিং’-এর সাথে মিলে যায় (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

শুধু মানব শিশু নয়, মানুষের কাছাকাছি প্রজাতি ভার্ভেট বানর (Vervet Monkeys) নিয়ে গবেষণা করেও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন তাদের হাতে যদি খেলনা তুলে দেয়া হয়, ছেলে বানরেরা ট্রাক, বাস, গাড়ি, ঘোড়া নিয়ে বেশি সময় কাটায় আর মেয়ে বানরেরা পুতুল কোলে নিয়ে। মানব সমাজে দেখা গেছে খুব অল্প বয়সেই ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে খেলনা নিয়ে এক ধরনের পছন্দ তৈরি হয়ে যায়, বাবা মারা সেটা চাপিয়ে দিক বা না দিক। দোকানে নিয়ে গেলে ছেলেরা খেলনা-গাড়ি কিংবা বলের দিকে হাত বাড়াতে শুরু করে, আর মেয়েরা পুতুলের প্রতি। এই মানসিকতার পার্থক্যজনিত প্রভাব পড়েছে খেলনার প্রযুক্তি, বাজার এবং বিপণনে। যে কেউ আমেরিকার টয়েস আর আসের (Toys r us) মতো দোকানে গেলেই ছেলে-মেয়েদের জন্য খেলনার হরেক রকম সম্ভার দেখতে পাবেন। কিন্তু খেলনাগুলো দেখলেই বোঝা যাবে – এগুলো যেন দুই ভুবনের দুই বাসিন্দাদের চাহিদাকে মূল্য দিতে গিয়ে আলাদা আলাদাভাবে বানানো।

গে মস্তিষ্কের খোঁজে

বিজ্ঞানীরা ইঁদুর আর বানর নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছেন, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে হাইপোথ্যালমাসের মধ্যে 'মেডিয়াল প্রিঅপ্টিক' বলে যে এলাকাটা (Medial Preoptic Area) আছে, সেটা কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে যৌনতার পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে ছেলে ইঁদুরেরা মেয়ে ইঁদুরের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। বানর নিয়ে গবেষণা করেও বিজ্ঞানীরা একই ধরনের ফল পেয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হাইপোথ্যালমাস-বিশিষ্ট বানরদের আচরণ হয়ে থাকে অনেকটা 'যৌন-প্রতিবন্ধী'র মতো। মেয়ে বানরদের প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণই থাকে না। এ থেকে যৌনপ্রবৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে হাইপোথ্যালমাসের গুরুত্ব বোঝা যাচ্ছে। মানুষের ক্ষেত্রেও হাইপোথ্যালমাস নামের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গটির সাথে যৌনপ্রবৃত্তির সরাসরি সম্পর্ক আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তারা হাইপোথ্যালমাসের এলাকাকে অভিহিত করেন *ইন্টারস্টিয়াল নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাস* (INAH) নামের এক অদ্ভুত নাম দিয়ে। প্রতিটি

নিউক্লিয়াসকে আবার তারা বিভিন্ন নম্বর দিয়েছে– $INAH_1$, $INAH_2$, $INAH_3$, $INAH_4$,। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রজার গোর্কি এবং তাঁর এক ছাত্রী লরা এলেন আশির দশকে মানুষের মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে দেখলেন ছেলেদের মস্তিষ্কের তৃতীয় ইন্টারস্টিয়াল নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাস ($INAH_3$)-এর আকার মেয়েদের থেকে অন্তত তিনগুণ বড় পাওয়া যাচ্ছে।

১৯৯০ সালে সিমন লেভি নামের এক আমেরিকান প্রখ্যাত স্নায়ুবিজ্ঞানী চিন্তা করলেন নারী-পুরুষের হাইপোথ্যালমাস নিয়ে যখন এত কথা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে সমকামী ব্যক্তিদের হাইপোথ্যালমাসের কি অবস্থা সেটা একটু মেপে দেখা দরকার। তিনি ১৬ জন সমকামী পুরুষের এবং ছয় জন সমকামী মহিলার হাইপোথ্যালমাসের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা চালালেন। তিনি দেখলেন, গোর্কির মতোই তিনিও ছেলেদের $INAH_3$-এর আকার মেয়েদের চেয়ে আকারে দু'গুন বড় পাচ্ছেন। কিন্তু সেই সাথে আরো একটা জিনিস পেলেন। সেটা হলো- $INAH_3$-এর আকার বিষমকামীদের পুরুষদের চেয়ে সমকামী পুরুষদের ক্ষেত্রে দু থেকে তিনগুণ ছোট। অর্থাৎ, সমকামী পুরুষদের নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাস এর আকার মেয়েদের $INAH_3$-এর সমান! লেভি পরবর্তীতে একটি হাসপাতালের ৪১ জন রোগীর উপর একই পরীক্ষা করেন। সেখানেও তিনি একই ফলাফল পেয়েছিলেন। লেভির এই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি পরবর্তীতে উইলিয়াম বাইন নামের আরেকজন বিজ্ঞানী করেছিলেন[126]। তিনিও একই ফলাফল পেয়েছেন, অর্থাৎ, সমকামী পুরুষদের নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাসটি আকারে বিষমকামী পুরুষদের চেয়ে ছোট এবং অনেকটা মেয়েদের সমান।

---

[126] Byne W, Tobet S, Mattiace LA, et al. (September 2001). "The interstitial nuclei of the human anterior hypothalamus: an investigation of variation with sex, sexual orientation, and HIV status". Horm Behav 40 (2): 86–92.
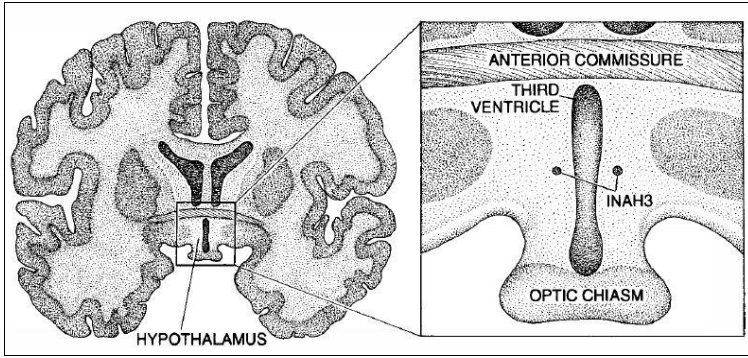
চিত্রঃ বিজ্ঞানীরা দেখেছেন মস্তিষ্কের তৃতীয় ইন্টারস্টিয়াল নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাস ($INAH_3$)এর আকার বিষমকামীদের পুরুষদের চেয়ে সমকামী পুরুষদের ক্ষেত্রে দু থেকে তিনগুণ ছোট হয়।

তার মানে কি? এর মানে কি এই যে সমকামী পুরুষদের মস্তিষ্ক অনেকটা নারীসুলভ? বলা মুশকিল। বিজ্ঞানীরা এই অনুকল্পটিকে আরেকটু বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করার চেষ্টা করলেন। তারা জানেন, শুধু $INAH_3$-এর আকারেই নয়, মস্তিষ্কের আরো অন্যান্য প্রত্যঙ্গের আকারেও পার্থক্য পাওয়া গেছে। যেমন, মেয়েদের ভাষাগত দক্ষতা যেহেতু ছেলেদের চেয়ে বেশি এবং একটু ভিন্নভাবে কাজ করে, তাদের কর্পাস কালোসাম (Corpus Callosum) এবং এন্টিরিয়র কমিসুর (Anterior Commissure) নামে দুইটি প্রত্যঙ্গের আকার পুরুষদের তুলনায় বড়। তাহলে সমকামীদের ক্ষেত্রে কি অবস্থা? হ্যা, আপনি যা সন্দেহ করেছেন তাই – সমকামী ব্যক্তিদের কর্পাস কালোসাম এবং এন্টিরিয়র কমিসুরের আকার বিষমকামী পুরুষদের চেয়ে আকারে বড় হয়, এবং মেয়েদের আকারের সাথে মিলে যায়। **১৯৯২** সালে লরা এলেন এবং রজার গোর্কি এন্টিরিয়র কমিসুর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সমকামীদের ক্ষেত্রে প্রত্যঙ্গটির আকার বিষমকামীদের চেয়ে বড়[127]। আবার কর্পাস কালোসাম নিয়ে

[127] Allen LS, Gorski RA (1992). "Sexual orientation and the size of the anterior commissure in the human brain". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 89 (15): 7199–202. doi:10.1073/pnas.89.15.7199.

পরীক্ষা করে আরেকদল বিজ্ঞানী দেখেছেন, সমকামীদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যঙ্গটির আকার বিষমকামীদের থেকে প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ বেশি[128]।

তাহলে কি দাঁড়ালো? একসময় উলরিচস (পঞ্চম অধ্যায় দ্রঃ) যেমনটি ভেবেছিলেন, – 'সমকামী পুরুষেরা আসলে পুরুষ দেহে বন্দি নারী আত্মার অতৃপ্ত প্রকাশ' – সেটাই কি তবে ঠিক?। অনেক বিজ্ঞানী পূর্বেকার সীমিত পরীক্ষা থেকে পাওয়া সিদ্ধান্তে তাই ভেবে নিয়েছিলেন। ঢালাওভাবে ভেবে নেয়া হয়েছিল- সমকামিতার প্রকাশ মানে 'A female spirit in a male body'। সামাজিকভাবেও আমরা দেখি সমকামী ছেলেদের 'মেয়েলি' বলে খোঁটা দেয়া হয়। তাহলে সত্যিই কি এই 'স্টেরিওটাইপিং' গুলোর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে? কিন্তু এখানে এসেই দাবার ছক আবারো উলটে গেলো। মানুষের মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালমাসে সুপ্রাকিয়াস্মিক নিউক্লিয়াস (VIP SCN Nucleus) নামের যে এলাকাটি আছে, যেটার আকার ছেলেদের ক্ষেত্রে মেয়েদের চেয়ে বড় থাকে। তাহলে সমকামীদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যঙ্গটির আকার কী রকম হবার কথা? নিশ্চয় ছোট এবং মেয়েদের সমান তাই না? না, মোটেই তা নয় – সমকামীদের ক্ষেত্রে VIP SCN Nucleus এর আকার পাওয়া গেল অনেক বড়, ছেলে মেয়ে দু'দলের চেয়েই[129]। সে জন্যই জোয়ান রাফগার্ডেন তার 'ইভল্যুশন রেইনবো' বইয়ে শ্লেষের সাথে লিখেছেন –'So much for the belief that gay man have female brains!' তবে এ ব্যাপারে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি, হয়ত ভবিষ্যৎ গবেষণা এ ব্যাপারে আরো ভালোভাবে পথ দেখাবে। আরো একটি ব্যাপারও এই সাথে লক্ষ্যণীয়। নারী সমকামীদের মস্তিষ্কে এ ধরনের কোনো প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

---

[128] Scamvougeras, A., Witelson, S.F., Bronskill, M., Stanchev, P., Black, S., Cheung, G., Steiner, M., Buck, B. Sexual orientation and anatomy of the corpus callosum. Society for Neuroscience Abstracts, 1994, p 1425.

[129] Swaab DF, Zhou JN, Ehlhart T, Hofman MA (1994). "Development of vasoactive intestinal polypeptide neurons in the human suprachiasmatic nucleus in relation to birth and sex". Brain Res. Dev. Brain Res. 79 (2): 249–59.

সমকামী পারিবারিক ধারার খোঁজে

আমার বাবা ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করতেন। আমিও ছোটবেলায় তাই খেলতাম। এ ধরনের অনেক বৈশিষ্ট্যই আমরা ঐতিহ্য হিসেবে বয়ে নিয়ে যাই, পারিবারিক পরিবেশ থেকে শিখে নিয়ে। মা ভালো রান্না করলে মেয়েকেও সেই গুণ পেতে সাহায্য করেন। আবার কিছু জিনিস না চাইলেও আমাদের বহন করতে হয় জেনেটিক তথ্য হিসেবে বংশ পরম্পরায়। চোখের এবং চুলের রঙ, নাকের গঠন, শরীর স্বাস্থ্য, হৃদরোগের ঝুঁকিসহ অনেক কিছুই। সমকামিতার ব্যাপারটিও আমরা পরিবারে বাহিত হতে দেখি। কিন্তু এটা কি জেনেটিক তথ্য হিসেবে পরিবারের ধারায় বয়ে চলে, নাকি পরিবেশ থেকে শেখা বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ?

বিজ্ঞানীরা এর উত্তর খুঁজতে প্রতিনিয়ত গবেষণা করে চলেছেন। তারা ইতোমধ্যেই দেখেছেন একটি জনগোষ্ঠীতে কোনো ভাই বিষমকামী হলেও অন্তত শতকরা ৪ ভাগ সম্ভাবনা থাকে তার পরবর্তী ভাইয়ের সমকামী হয়ে জন্মাবার। কিন্তু পরিবারের একভাই সমকামী হলে অন্তত ২২ ভাগ সম্ভাবনা তৈরি হয় অপর ভাইও সমকামী হবার। অর্থাৎ পরিবারে সমকামী ভাই থাকলে পরিবারে সমকামী ধারা তৈরি হবার সম্ভাবনা অন্তত চারগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু ভাই সমকামী হলে বোন লেসবিয়ান নাকি স্ট্রেট হবে কিনা- এ সংক্রান্ত কোনো সম্ভাবনার ঝোঁক পাওয়া যায়নি[130]। কোনো পরিবারে বোন সমকামী (লেসবিয়ান) হলে, অপর বোনেরও সমকামী হবার প্রবণতা দ্বিগুন বেড়ে যায়, কিন্তু ভাইয়ের উপর এর কোনো সম্ভাব্যতার প্রভাব জানা যায়নি[131]।

যমজদের নিয়ে পরীক্ষা করেও কৌতুহলোদ্দীপক ফলাফল পাওয়া গেছে। ১৯৮৫

[130] Pillard RC, Weinrich JD., Evidence of familial nature of male homosexuality, Arch Gen Psychiatry. 1986 Aug; 43(8):808-12.
[131] Bailey JM and Benishay DS, Familial aggregation of female sexual orientation, Am J Psychiatry 1993; 150:272-277

সালে রিচার্ড সি পিল্লার্ড এবং জেমস ডি ওয়েইনরিচ তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন সমকামিতার ধারাটি সম্ভবতঃ জেনেটিক তথ্য হিসেবে প্রবাহিত হয়। তারা দেখালেন যে, সদৃশ যমজদের (Identical Twins) ক্ষেত্রে এক ভাই সমকামী হলে অন্তত পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা থাকে অপর ভাইও সমকামী হবার। আর অসদৃশ যমজদের (Fraternal Twins) ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা থাকে চব্বিশ ভাগের মতো। এরপর থেকে অন্তত পাঁচটি যমজদের নিয়ে যৌন-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত গবেষণার খবর লিপিবদ্ধ হয়েছে[132]। ১৯৯১ সালে তাদের একটি গবেষণা থেকে জানা যায় সমকামী প্রবণতা সদৃশ যমজদের মধ্যে ৫৭ ভাগ, অসদৃশ যমজ দের মধ্যে ২৪ ভাগ, এবং অযমজদের মধ্যে ১৩ ভাগ সমকামীভাবাপন্ন হয়ে থাকে[133]। একইভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে নারী সমকামিতার প্রবণতা সদৃশ যমজে থাকে শতকরা ৫০ ভাগ, অসদৃশ যমজে থাকে ১৬ ভাগ, এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে থাকে ১৩ ভাগ। ১৯৯৩ সালে এ ধরনের আরেকটি গবেষণা থেকে পাওয়া যায়, ছেলেদের সদৃশ যমজদের মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগ সমকামী প্রবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে আর অসদৃশ যমজদের ক্ষেত্রে সেটা ২৯ ভাগ[134]। একইভাবে নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সদৃশ যমজের ক্ষেত্রে শতকরা ৪৮ ভাগ সমকামী হয়, আর অসদৃশ যমজের ক্ষেত্রে সেটা মাত্র ৬ ভাগ[135]।

উপরের জরিপ গুলো সবই ছিল আমেরিকার। ১৯৯২ সালে ইংল্যান্ডে এই ধরনের একটি জরিপ চালানো হয়। সেখানকার জরিপেও প্রায় একই ধরনের ফলাফল বেরিয়ে আসে, যদিও সংখ্যাটা অনেক কম। সদৃশ যমজদের মধ্যে শতকরা

---

[132] Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, Scientific American, May 1994.
[133] Bailey JM, Pillard RC, A genetic study of male sexual orientation., Arch Gen Psychiatry. 1991 Dec; 48 (12) pp1089-96..
[134] Frederick L. Whitam, Milton Diamond and James Martin, Homosexual orientation in twins: A report on 61 pairs and three triplet sets, Archives of Sexual Behavior, 22(3), 1993, pp 187-206.
[135] Bailey J M; Pillard R C; Neale M C; Agyei Y Heritable factors influence sexual orientation in women. Archives of general psychiatry 1993;50(3):217-23

২৫ ভাগ এবং অসদৃশ যমজদের ক্ষেত্রে মাত্র ২.৫ ভাগ সমকামী পাওয়া গেছে[136]। অস্ট্রেলিয়ায় একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে জরিপ চালানো হয়েছে। সেখানে অন্যান্য পদ্ধতির মতো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে যমজ সহোদর বাছাই করা হয়নি, বরং বাছাই করা হয়েছে নির্বাচনের ভিত্তিতে। তাদের জরিপ থেকে যে ফলাফল এসেছে তাহলো - সেখানে সদৃশ যমজদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ এবং অসদৃশ যমজদের ক্ষেত্রে মাত্র ০ ভাগ সমকামী পাওয়া গেছে; সদৃশ মেয়ে যমজদের শতকরা ২৪ ভাগ লেসবিয়ান হয় এবং অসদৃশ যমজদের ক্ষেত্রে সেটা প্রায় **১১** ভাগ[137]।

উপরের পরীক্ষাগুলো থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট; সদৃশ যমজে দুই ভাই-ই সমকামী হবার সম্ভাবনা অসদৃশ যমজের দ্বিগুণ পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে সদৃশ যমজে দুই ভাইয়ের দুজনেই সমকামী হবার সম্ভাবনা শতকরা ২৫ থেকে ৫০, এই ফলাফল নির্ভর করে কীভাবে বা কোথায় পরীক্ষা করা হচ্ছে তার উপর। তার মানে জেনেটিক ফ্যাক্টর যদি আমরা ২৫ থেকে ৫০ বলে রায় দেই, তবে পরিবেশ এবং অন্যান্য ফ্যাক্টরের প্রভাব ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ থেকেই যাচ্ছে।

এমনকি সদৃশ যমজদের দুই ভাইয়ের মধ্যেই সমকামিতা পাওয়ার যে ব্যাপারটিকে পুরোপুরি 'জেনেটিক' বলে ভাবা হচ্ছে, সেই দাবিও কতটুকু যুক্তিযুক্ত সেটাও খোলা মনে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। দুই সদৃশ যমজ ভাই সাধারণত একই পরিবেশে একই ভাবে বড় হয় এবং একজনের পছন্দ, অপছন্দ অভিরুচি অনেক সময় অপরজনকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই, যে কেউ দাবি করতেই পারে যে, সদৃশ যমজে অসদৃশ যমজদের চেয়ে অধিক হারে সমকামী ভ্রাতৃযুগল পাওয়া যাচ্ছে। এর কারণ 'অভিন্ন জিন' নয়, বরং তাদের বেড়ে উঠার 'অভিন্ন

[136] M King and E McDonald, Homosexuals who are twins. A study of 46 probands, The British Journal of Psychiatry 1993, 160: 407-409.
[137] Bailey, J. M., & Martin, N. G. A twin registry study of sexual orientation. Paper presented at the twenty-first annual meeting of the International Academy of Sex Research, Provincetown, MA, 1995.

পরিবেশ'। থিওডোর লিজ নামে এক মনোবিজ্ঞানী এই ব্যাপারটি উল্লেখ করে তার প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছিলেন একটি জার্নালে[138]। এ উদাহরণটি আমাদের সামনে এ ধরনের পরীক্ষার জটিলতা স্পষ্ট করে তুলে। ফ্রয়েড যে কথাটা অনেক আগেই বলেছিলেন একটু অন্যভাবে, সে কথাটাই হয়ত সত্য হয়ে ফিরে আসছে –

> 'সমকামিতার ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরো গভীর। ... কারণ [সদৃশ] যমজেরা যেন আয়নার প্রতিবিম্ব হিসেবে বেড়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যকার স্বকাম (narcissism) আরো বিবর্ধিত করে তুলে'।

তবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য আরেক ধরনের পরীক্ষা করা যেতে পারে। যদি কোনো সদৃশ যমজ জন্মের সময়েই আলাদা হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বড় হয়, এবং সেই উপাত্ত যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে হয়ত 'অভিন্ন' পরিবেশের ফ্যাক্টরটি বাদ দিয়ে শুধু জেনেটিক ফ্যাক্টর আলোচনায় আনতে পারব, এবং বলতে পারবো সমকামী প্রবৃত্তি সত্যই জেনেটিক কিনা।

১৯৮৬ সালে এ ধরনের একটি পরীক্ষার কথা জানা যায়[139]। ছয়টি সদৃশ যুগলের (চারটি ভগ্নি যুগল, এবং দুটি ভ্রাতৃযুগল) সন্ধান পাওয়া যায় যারা আলাদা আলাদা পরিবেশে বড় হয়েছিল এবং যুগলদের মধ্যে একজন অন্তত সমকামী। চারটি ভগ্নি যুগলের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন সদস্য ছিলেন বিষমকামী, এবং অন্যজন সমকামী। একটি ভ্রাতৃযুগলের ক্ষেত্রে দুই ভাইই ছিলেন সমকামী। একটি 'গে বার' এ পরিচয় হবার আগ পর্যন্ত এমনকি তারা একে অপরকে চিনতেনও না। আরেকটি ভ্রাতৃযুগলের ক্ষেত্রে, দুই ভাই জন্মের পরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা আলাদা পরিবেশে বড় হয়েছিলেন। এক ভাই ১৯ বছর পর্যন্ত উভকামী হিসেবে জীবন যাপন করেছিলেন, এবং তারপর

---

[138] Theodore Lidz, Md, Reply to 'A Genetic Study of Male Sexual Orientation', Arch Gen Psychiatry. 1993;50 (3):240.

[139] ED Eckert, TJ Bouchard, J Bohlen and LL Heston , Homosexuality in monozygotic twins reared apart, The British Journal of Psychiatry, 1986, 148: 421-425

পরিপূর্ণ সমকামী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। আর অন্য ভাই পনের থেকে আঠারো বয়স পর্যন্ত সমকামী ছিলেন। তারপর বিয়ে করে নিজেকে বিষমকামী হিসেবে সমাজে পরিচিত করেন। এই ক্ষেত্রে, অন্তত সীমিত সময়ের জন্য হলেও উভয় সদস্যই সমকামিতার প্রবৃত্তি প্রদর্শন করেছিল।

কাজেই উপরের পরীক্ষা থেকে একটি জিনিস বুঝা যাচ্ছে যে, জন্মের সময় বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং ভিন্ন পরিবেশে বড় হওয়া ভ্রাতৃযুগলে সমকামিতার উন্মেষের পেছনে জেনেটিক উপাদান থাকতে পারে। কিন্তু এই জেনেটিক প্রভাব ভগ্নিযুগলে পাওয়া গেছে অনেক কম।

কিন্তু এই পরীক্ষাই শেষ কথা নয়। সমকামিতার উপর পরিবেশের প্রভাব আদৌ আছে কিনা, আর থাকলে কতটুকু - সেটা জানার জন্য আরেক ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বেইলি এবং পিল্লার্ডের **১৯৯১** সালের সেই পরীক্ষায় (আগে উল্লিখিত) দত্তক নেয়া সদৃশ যমজ সন্তানদের উপর জরিপ চালানো হয়। দেখা গেছে কোনো সমকামী পরিবার বা ব্যক্তি দত্তক নিলে সেই ভাইয়ের সমকামী হিসেবে বেড়ে উঠার সম্ভাবনা (১১%) অনেক বেশি থাকে বিষমকামী পরিবার দত্তক নেয়ের চেয়ে (৫%)। কাজেই এ সমস্ত পরীক্ষা থেকে বোঝা যাচ্ছে, জেনেটিক ফ্যাকটরের পাশাপাশি পরিবেশের প্রভাবটিও থেকে যাচ্ছে পুরোমাত্রায়। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে মুখ্য কারণ হিসেবে প্রতিপন্ন করাটা এই মুহূর্তে আসলে সরলীকরণই হবে।

গে জিনের খোঁজে

১৯৯৩ সালে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথের সমকামী বিজ্ঞানী ডিন হ্যামার এবং এঙ্গেলা প্যাতাউচির একটি যৌথ গবেষণাপত্র বিজ্ঞানের সম্ভ্রান্ত জার্নাল 'সায়েন্স'-এ

প্রকাশিত হয়[140]। ডিন হ্যামারের সেই গবেষণাপত্রে শুধু সমকামী ধারাই নয়, সেই সাথে সমকামিতার উৎস হিসেবে ক্রোমোজমের মধ্যকার জেনেটিক একটি মার্কারের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারটিকে পরবর্তীতে কিছু পত্রপত্রিকা এবং মিডিয়া 'গে জিন' বলে প্রচার শুরু করে। ফলে এর পক্ষে বিপক্ষে নানা ধরনের বিতর্ক শুরু হয়। এই গবেষণাপত্রটি তাই খুব সতর্কভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে।

ডিন হ্যামেরের আলোচিত গবেষণাতেও আগের অন্যান্য গবেষকদের মতোই পরিবারের মধ্যে সমকামী ধারা খোঁজার একটি চেষ্টা করা হয়েছে; এবং এ গবেষণা থেকেও সেই একই উপসংহার বেরিয়ে আসে - পরিবারে সমকামী ভাই থাকলে সমকামী ধারা তৈরি হবার প্রবণতা বেড়ে যায়। হ্যামার তার গবেষণা থেকে যে ফলাফল পেলেন তাহলো- যদি এক ভাই সমকামী হয়, তাহলে ১৪ ভাগ সম্ভাবনা থাকে অন্য ভাইয়েরও সমকামী হবার, আর ভাই সমকামী না হলে সমকামী হবার সম্ভাবনা থাকে শতকরা মাত্র ২ ভাগ। কিন্তু হ্যামার এ পর্যন্ত গিয়েই থেমে গেলেন না। তিনি সমকামী পরিবারের দূরবর্তী আত্মীয় স্বজনদের পারিবারিক ধারাও বিশ্লেষণে আনলেন। আর এটা করতে গিয়েই বেরিয়ে এলো অজানা এক নতুন দিক। তিনি দেখলেন, সমকামী ছেলের মামাদের মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ এবং ফুপাতো ভাইদের মধ্যে শতকরা ৮ ভাগ সমকামী প্রবণতা সম্পন্ন পাওয়া ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বাবার দিকে অর্থাৎ চাচা কিংবা চাচাতো ভাইদের মধ্যে সেরকম কোনো প্যাটার্ন পাওয়া গেল না।

---

[140] Hamer DH, Hu S, Magnuson VL, Hu N, Pattatucci AM (July 1993). "A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation". Science, 261 (5119): 321–7
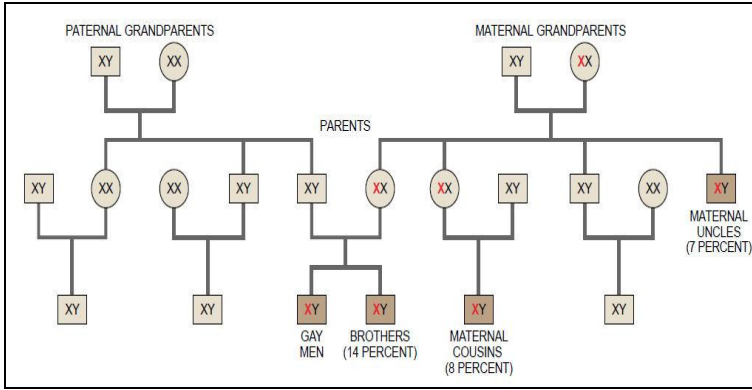
চিত্রঃ সমকামী পরিবারের দূরবর্তী আত্মীয় স্বজনদের পারিবারিক ধারা বিশ্লেষণ করে ডিন হ্যামার দেখলেন, সমকামী ছেলের মামাদের মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ এবং ফুতাতো ভাইদের মধ্যে শতকরা ৮ ভাগ সমকামী প্রবণতা সম্পন্ন পাওয়া ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি ধারণা করলেন সমকামী প্রবণতা মায়ের দিক থেকেই জেনেটিক ভাবে প্রবাহিত হয়।

তাহলে এর ব্যাখ্যা কী? সমকামী প্রবণতা কি তাহলে মায়ের দিক থেকেই জেনেটিক ভাবে প্রবাহিত হয়? ডিন হ্যামারের গবেষণা সে দিকেই ইঙ্গিত করে। আমরা জানি একটি ছেলের দেহে দু'ধরনের ক্রোমোজম থাকে। একটি হলো Y যা সে বাবার কাছ থেকে সরাসরি পায়, আর অন্যটি X ক্রোমোজম -যা সে মায়ের দিক থেকে পায়। কাজেই জেনেটিক প্রবণতা মায়ের দিক থেকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হবার অর্থ হচ্ছে X ক্রোমোজমে তার ছাপ থাকা। হ্যামার এবং তাঁর গবেষক-দল জানালেন X ক্রোমোজমের একদম প্রান্তসীমার একটি এলাকা – যাকে Xq28 হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, এটাই সমকামী প্রবণতা তৈরির জন্য দায়ী। হ্যামার ৪০ জন সমকামী ভাতৃযুগলের উপর পরীক্ষা করে দেখলেন তাদের মধ্যে ৩৩টি যুগলের মধ্যে এই Xq28 মার্কারের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। ৭টিতে পাওয়া যায় নি (বিষমকামীদের ক্ষেত্রে এই মার্কারটি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত থাকে)। বলা হলো যদিও নমুনাক্ষেত্র খুব একটা বড় ছিল না, তদুপরি ৪০ জনের মধ্যে ৩৩ জনে মার্কার খুঁজে পাওয়াটা আসলেই 'স্ট্যাটিস্টিকালি

সিগনিফিকেন্ট’[141]। এইটাই হলো ডিনহ্যামারের সমকামিতা নিয়ে মাইলফলক গবেষনার সারসংক্ষেপ। তার পরীক্ষায় পাওয়া এই Xq28 মার্কারটি ‘গে জিন’ হিসেবে ‘প্রচারের আলোয় উঠে আসে। আর অনেকেই ডিন হ্যামারের কাজকে এভাবে ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, ‘ক্রোমোজমের Xq28 এলাকায় একটি জিন পাওয়া গেছে যা সমকামিতাকে ত্বরান্বিত করে’।
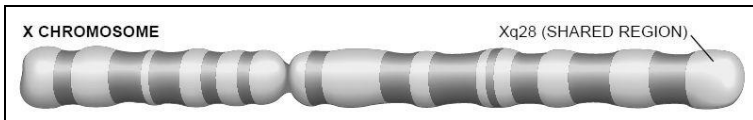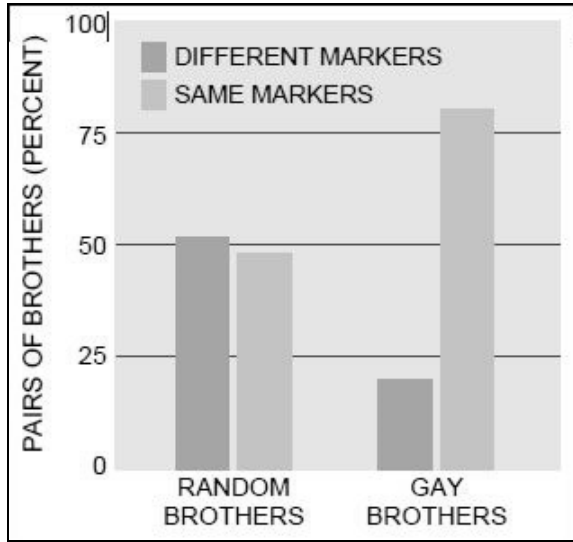
চিত্রঃ ডিন হ্যামারের হ্যামার ৪০ জন সমকামী ভাতৃযুগলের উপর পরীক্ষা করে X ক্রোমোজমের একদম প্রান্তসীমার একটি এলাকা – যাকে Xq28 হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সমকামী প্রবণতার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

141 Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, Scientific American, May 1994.

কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই এত সহজ সরল নয়। এই ফলাফল খুব নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। প্রথম কথা হলো ৪০টি যুগলের মধ্যে ৭টি যুগলে এই Xq28 মার্কারটি পাওয়া যায়নি। সমকামিতার প্রবৃত্তি তৈরিতে যদি Xq28 মার্কার থাকা 'অত্যাবশকীয় নিয়ামক' হতো, তাহলে ৪০টি যুগলের স্যাম্পলের সবগুলোতেই এটি পাওয়া যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি। যদি ৪০টি স্যাম্পলের মধ্যে মোটামুটি ২০টিতে পাওয়া যেত, আর বাকি ২০ টিতে না পাওয়া যেত, তবে আমরা বলতে পারতাম সমকামিতার প্রবৃত্তির সাথে এই মার্কারের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেটাও হয়নি। মার্কার পাওয়া গেছে চার-পঞ্চমাংশ ক্ষেত্রে। ৪০টি স্যাম্পলের মধ্যে ৩৩টিতে মার্কার পাওয়ার ক্ষেত্রটি নিঃসন্দেহে ফলাফলের পারিসাংখ্যিক গুরুত্বকে তুলে ধরে। ডিন হ্যামার হিসাব করে দেখিয়েছেন শুধুমাত্র সম্ভাবনার নিরিখে হিসেব করলে এমনি এমনি (নির্বিচারে) এটা ঘটার সম্ভাবনা ২০০ ভাগের মধ্যে ১ ভাগেরও কম। সে হিসেবে জেনেটিক প্রভাব থাকার প্রবণতাটাকে অস্বীকার করা হয়ত যাচ্ছে না, কিন্তু এটা কখনোই শেষ কথা বলার নিশ্চয়তাও দিয়ে দিচ্ছে না। মোটা দাগে বললে, যেহেতু যমজ ভ্রাতৃযুগলের দুজনই সব সময় সমকামী ভাবাপন্ন হয় না, সেহেতু মার্কার থাকলেই সমকামী হবে- এটা হলফ করে বলা যাচ্ছে না। আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে, কোনো মার্কার না থাকা সত্ত্বেও ৭টি ভ্রাতৃযুগলে সমকামী প্রভাব পাওয়া গেছে। তার মানে, মার্কারের সাথে কিংবা জিনের সাথে সমকামী প্রবৃত্তির সরাসরি সম্পর্ক শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যাচ্ছে না। আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই মার্কারের সাথে জেনেটিক একটা প্রভাব আছেই, তবুও সেটি একটিমাত্র জিনের সাথে কখনোই নয়। ডিন হ্যামার নিজেই সে কথা বলেছেন এভাবে[142] –

> 'কোনো একটি জিনকে (এ পরীক্ষায়) পৃথক করা যায়নি। পরীক্ষার মাধ্যমে যা করা হয়েছে তা হলো - ক্রোমোজমের একটি অংশ সনাক্ত করা, যে অংশটি দৈর্ঘ্যে চার মিলিয়ন বেস যুগলের সমান। এই অংশটি সমগ্র মানব

[142] Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, Scientific American, May 1994.

> জিনোমের শতকরা ০.২ ভাগেরও ছোট, কিন্তু তারপরেও এই অংশটিতে অবলীলায় কয়েকশত জিন এঁটে যেতে পারে। এই এলাকায় নিয়ামক জিনটি খুঁজে বের করা অনেকটা খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতোই। সূঁচ পেতে হলে হয় আমাদের হয় আরো অনেক বেশি পরিবার দরকার হবে, অথবা সম্ভাব্য সকল এলাকার ডি.এন.এ-র অনুক্রমের সম্পূর্ণ তথ্য জানা চাই'।

হ্যামার নিজে ১৯৯৫ সালে পরীক্ষাটি পুনর্বার পরিচালনা করেন হু, পাত্তাউচি এবং অন্যান্যদের সাথে মিলে। এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন হয় ৩২টি স্যাম্পল নিয়ে, এবং এর মধ্যে ২২টি ক্ষেত্রে তিনি আগের পরীক্ষার মতোই Xq28 মার্কার খুঁজে পেলেন[143]। অর্থাৎ, শতকরা প্রায় ৬৮ ভাগ ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারলেন যে, মার্কারের সাথে সমকামিতার একটা প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক আছে। এছাড়া স্যান্ডার এবং প্রমুখের ১৯৯৮ সালের গবেষণায়ও ৫৪টি স্যাম্পল নিয়ে পরীক্ষা করা হয়, এবং এর মধ্যে শতকরা ৬৬ ভাগ ক্ষেত্রে সমকামিতার সাথে Xq28 মার্কারের সম্পর্ক পাওয়া যায়[144]।

১৯৯৯ সালে ক্যানাডায় জর্জ রাইসের নেতৃত্বে গবেষকের একটি দল ডিন হ্যামারের পরীক্ষাটিই করার চেষ্টা করলেন নমুনা ক্ষেত্র আরো বাড়িয়ে দিয়ে। এই পরীক্ষায় সমকামী ভ্রাতৃযুগল সংগ্রহ করার জন্য কানাডার গে ম্যাগাজিন *Xtra*তে বিশাল বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, শেষ পর্যন্ত ৪৬টি যুগল নিয়ে কাজ শুরু করা হয়। এই যুগলগুলো নির্বাচিত হয় 'সমকামী সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী' (Gay Interviewer)-দের মাধ্যমে।

এই পরীক্ষায় ৪৬টি যুগলের মধ্যে মাত্র ২০টি যুগলে মার্কার পাওয়া গেল[145], পারিসাংখ্যিক হিসেবে যা অর্ধেকেরও কম। যদি সমকামিতার সাথে মার্কারের নিশ্চিত

---

[143] Hu S, Pattatucci AM, Patterson C, et al. (November 1995). "Linkage between sexual orientation and chromosome Xq28 in males but not in females". Nat. Genet. 11 (3): 248–56.
[144] Wilson, G.D., & Rahman, Q. (2005). Born Gay: The Biology of Sex Orientation. London: Peter Owen Publishers.
[145] Rice, Anderson, Risch and Ebers (1999) Male Homosexuality: Absence of Linkage to Microsatellite Markers at Xq28. Science 23(5414): pp. 665-667.

সম্পর্ক থাকতো তবে ৪৬টির মধ্যে ৪৬টিতেই মার্কার পাওয়া যেত। তা তো হয়ইনি, বরং যদি হ্যামারের মতো 'স্ট্যাটিস্টিকালি সিগনিফিকেন্ট' ৬৮% ফলাফলেরও পুনরাবৃত্তির কথা বিবেচনা করি, তবে মার্কার পাওয়া যাওয়ার কথা ছিল অন্তত ৩২টি। যদি এলোপাথাড়ি ভাবে ঘটা সম্ভাবনার হার শতকরা পঞ্চাশভাগের কথাও চিন্তা করি, তাহলেও মার্কারের সংখ্যা আসা উচিৎ ছিল ২৩টি। কিন্তু ২০টি মাত্র মার্কার পাওয়াকে কোনোভাবেই কোনো ধরনের সম্পর্কে ফেলা যায় না। কাজেই অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন এই পরীক্ষাটি Xq28 মার্কারের সাথে 'গে জিন' পাওয়ার আগের দাবিগুলোকে ভুল প্রমাণ করে দেয়[146]। ক্যানাডিয়ান গবেষকেরা তার ফলাফল সম্বন্ধে উপসংহার টেনে বলেন,

> আমাদের ফলাফল হ্যামারের মূল পরীক্ষার ফলের সাথে এত পার্থক্য কেন তৈরি করলো তা পরিষ্কার নয়। ... সে যাই হোক, আমাদের এই পরীক্ষার উপাত্ত যৌনপ্রবৃত্তির উপর Xq28 এলাকায় অবস্থিত একটি জিনের প্রভাব থাকার দাবিকে সমর্থন করে না। ... (যদিও) এই ফলাফল জিনোমের অন্য কোনো জায়গায় সমকামিতার উপর জিনের প্রভাবকে বাতিল করে দেয় না।

এই 'গে জিন' পাওয়ার সাম্প্রতিক এই পরীক্ষাগত ব্যর্থতা অবশ্যই একটি ময়নাতদন্ত দাবি করে। সারা মিডিয়া জুড়ে 'গে জিন' নিয়ে এত হৈ চৈ হলো, অথচ দুইটি বড় পরীক্ষায় দুই রকম ফলাফল বেরিয়ে এলো কেন? তবে কি হ্যামার পরীক্ষায় কোনো বড় ভুল করেছিলেন, কিংবা ভালো ফলাফল পেতে ডেটা পরিবর্তন করেছিলেন? নাকি ক্যানাডিয়ান গবেষকেরা সমকামী যুগল নির্বাচনের সময় সনাক্তকরণে ভুল করেছিলেন? এই শেষ বিচারের সমাধান এখনো হয়নি। হ্যামার অবশ্য ক্যানাডিয়ীয় গবেষকদের ফলাফল প্রত্যাখান করেছেন এই বলে[147] –

---

[146] 'The result demonstrates that there is no gay gene in Xq28' (ref. Joan Roughgarden, Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People, University of California Press, May 17, 2004)।

[147] Michael Abrams, The Real Story on Gay Genes, Discover Magazine, June, 2007

‘তারা (ক্যানাডীয় গবেষকেরা) প্রথমেই ধরে নিয়েছিলেন গে জিন বলে কিছু নেই, এবং তাদের পরীক্ষা ছিল পক্ষপাত দুষ্ট, কারণ পরীক্ষকের একজন প্রথম থেকেই ‘গে জিন বলে কিছু নেই’ - সেটা প্রমাণেই তৎপর ছিলেন। তাদের সেই (সমকামবিদ্বেষী) মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে তাদের পরীক্ষায়’।

তবে হ্যামার যাই বলুক না কেন গে-জিন নিয়ে পরীক্ষার ফলাফল একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে আছে সাধারণ মানুষ এবং নিরপেক্ষ গবেষকদের কাছে। তাদের কাছে বিষয়টি এখনো ‘অমীমাংসিত মামলা’ই। তবে ‘অমীমাংসিত’ বলে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এ সংক্রান্ত গবেষণা কিন্তু থেমে নেই। জিনের পথ ধরে সমাধানের পথ খুঁজতে এবারে এগিয়ে এসেছে এপিজেনেটিক্স[148]। এই এপিজেনেটিক্স উপরের সমস্যার একটা আকর্ষণীয় সমাধান হাজির করছে, যা ক্রমশ বিজ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। তারা দেখেছেন, জিন কেবল একা একা কাজ করতে পারে না, কাজ করে পরিবেশ থেকে পাওয়া সংকেতের মিথস্ক্রিয়ায়। বৈদ্যুতিক বাতির সুইচের যেমন টার্ন অন বা অফ করা যায়, ঠিক তেমনি পরিবেশ থেকে পাওয়া সংকেতের প্রভাবে জিনের সক্রিয়করণ (Activation) বা নিষ্ক্রিয়করণ (Deactivation) ঘটে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন মিথাইলেশন। দেখা গেছে আমাদের চারপাশের বহু কিছুই -পরিবেশ, খাদ্যাভাস, পানীয় বা ধূমপানে আসক্তি, মানসিক পীড়নসহ বহুকিছুতেই এই প্রক্রিয়াটি প্রভাবিত হয়। এই মিথাইলেশন হয় বলেই সদৃশ যমজ ভাতৃযুগলে জেনেটিক কোডে শতভাগ মিল থাকলেও তাদের আচরণে, মন মানসিকতায় কিংবা কাজকর্মে বিস্তর পার্থক্য থাকে অনেক সময়ই। মিথাইলেশনের প্রভাবে জেনেটিক কোডের একাংশ বা একাধিক অংশ টার্ণ অফ হয়ে যেতে পারে। কাজেই একই জেনেটিক কোড থাকা সত্ত্বেও জেনেটিক সুইচের টার্ণ অন বা অফের

148 এপিজেনেটিক্স নিয়ে বিস্তারিত জানতে এই বইয়ের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত ‘মানব প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিগুলো কি জন্মগত নাকি আচরণগত?’ অংশটি দ্রষ্টব্য।

কারণে একভাই বিষমকামী, আরেকভাই হয়ত সমকামী ভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। এ শুধু তত্ত্ব কথা নয়, এই ধারণার স্বপক্ষে কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গেছে সভেন বকল্যান্ডের গবেষণায়। তিনি যমজ ভাইয়ের ঠিক কোনো জায়গায় জিন টার্ণ অন বা অফের কারণে প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটে তার হদিস এখনো না পেলেও সাম্প্রতিক একটি গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, সমকামী ছেলের জন্ম দেয়া মায়ের এক্স ক্রোমোজমের সক্রিয়তা অন্য মায়েদের চেয়ে ভিন্ন হয়। [149] কিন্তু কীভাবে একটি জিন পরিবেশের প্রভাবে সক্রিয় বা অক্রিয় হয়ে যায়? একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে স্ট্রেস হরমোন করটিসোল। ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, কর্টিসোল স্থায়ীভাবে জিনের একাংশকে নিষ্ক্রিয় (turn off) করে দিতে পারে এবং এর ফলে ইঁদুরের স্বভাবে পরিবর্তন ঘটে। মানুষের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীরা একই রকম ফলাফল লক্ষ করেছেন। তারা দেখেছেন, মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে মানবদেহে এই হরমোনের আধিক্য বৃদ্ধি পায়। চাপময় পরিবেশে বেশি দিন কাটালে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায় - ফলে দেহ সহজেই সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হয় সে সময়। কিন্তু 'ধান ভানতে শীবের গীতের মতো' এই কর্টিসোল নিয়ে পড়ে যাওয়া হলো কেন? এই স্ট্রেস হরমোনের সাথে সমকামিতার কি কোনো সরাসরি সম্পর্ক আছে? বিজ্ঞানীরা বলেন, থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। জার্মান ডাক্তার গান্টার ডর্নারের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাপময় পরিবেশে যে সমস্ত মা গর্ভবতী হয়েছিলেন, তাদের সন্তানদের একটা বড় অংশ নাকি সমকামী হিসেবে গড়ে উঠেছিল ইতিহাসের অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি[150]। এমনকি ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, যে সমস্ত ইঁদুরেরা গর্ভের সময় চাপময় পরিবেশে দিন কাটায়, তাদের সন্তানের মধ্যে পরবর্তীতে সমকামিতার আধিক্য তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। অনেক সময় আবার বিভিন্ন এলার্জিক প্রতিক্রিয়ায়

---

[149] Bocklandt S, Horvath S, Vilain E, Hamer DH (February 2006). "Extreme skewing of X chromosome inactivation in mothers of homosexual men". Hum. Genet. 118 (6): 691–4.

[150] Matt Ridley, The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature, Harper Perennial, 2003.

দেহে টেস্টোসটেরোন হরমোনের (পুরুষ হরমোন) প্রতি সংবেদনশীলতা কমে যায়। যে সমস্ত মায়েরা সারা জীবনে অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেয়, তাদের ক্ষেত্রে শেষের দিককার সন্তানদের জন্মের সময় এ ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে বলে জানা গেছে। রে ব্ল্যানচার্ডের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কোনো পরিবারে বড় ভাই থাকলে তার পরের ভাইদের সমকামী যৌনপ্রবৃত্তি তৈরি করার সম্ভাবনাকে শতকরা ২৮ থেকে ৪৮ ভাগ বাড়িয়ে দেয়[151]। অর্থাৎ, একটি পরিবারে বড় ভাইদের সংখ্যা যত বেশি হবে, তত বেশি হবে পরবর্তী সন্তানের সমকামী হবার সম্ভাবনা (একে জনপ্রিয়ভাবে 'ওল্ডার ব্রাদার ইফেক্ট' হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়)। কারণ দেখা গেছে, যত বেশি সন্তানের জন্ম হয়, তত বেশি মায়ের টেস্টোসটেরোন হরমোনের প্রতি এলার্জিক প্রতিক্রিয়াও বাড়তে থাকে। হরমোন নিয়ে এই সাম্প্রতিক পরীক্ষাগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও কোনো কিছুই আসলে নিশ্চিত নয়। বহু নারীকেই আসলে বিভিন্ন সময়ে চাপযুক্ত পরিবেশে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাদের সবার সন্তান বড় হয়ে সমকামী হয়। আমার নিজের জন্মও হয়েছিল একাত্তরের দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে,আমার বাবা যখন দেশের সীমান্তে ছিলেন যুদ্ধরত। এমন পরিস্থিতিতে জন্ম নিয়েও কিন্তু আমি সমকামী হিসেবে বেড়ে উঠিনি। কিংবা আমার জন্মের কারণে কোনো 'ওল্ডার ব্রাদার ইফেক্ট' আমার ছোট ভাইয়ের উপরও পড়েনি। এমন উদাহরণ চারপাশে অজস্রই আছে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় সমকামী সন্তানের জন্মদেয়া মায়েদের নিয়ে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। তাদের প্রশ্ন করা হয়েছে যে, বিষমকামী সন্তানের জন্ম দেয়ার তুলনায় সমকামী সন্তানের জন্ম দেয়ার সময়টিতে কি তারা অধিক চাপযুক্ত পরিস্থিতিতে ছিলেন কিনা। তাদের মতামত থেকে এমন কোনো আলামত পাওয়া যায়নি যে,সমকামী সন্তানের জন্মের সময় কোনো চাপময় পরিস্থিতি তারা অতিবাহিত করেছিলেন[152]।কাজেই

---

[151] Blanchard, R. (1997). Birth order and sibling sex ratio in homosexual versus heterosexual males and females. Annual Review of Sex Research, 8, 27-67.

[152] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press, 1996

মায়ের মানসিক চাপের সাথে সন্তানের সমকামিতার কোনো প্রত্যক্ষ যোগসূত্র আসলে প্রতিষ্ঠিতই হয়নি। এছাড়া, গান্টার ডর্নারের মূল পরীক্ষার 'উদ্দেশ্য'ও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন মহলে। গান্টার তাঁর গবেষণাপত্রে সমকামিতাকে 'মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব' (Psychic Disability) হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'অদূরভবিষ্যতে সমকামিতার বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে।' তার এই মনোভাব নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলেই তুমুল প্রতিবাদ হয়েছে, তার সমকামিতার প্রতি বিদ্বেষমূলক মনমানসিকতাকে ইতিহাসের কলঙ্কজনক ইউজিনিক্সের (Eugenics) সাথেও তুলনা করা হয়েছে।

গে জিন নিয়ে মিডিয়ায় এত ঔতসুক্যই বা কেন?

বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাইরেও রাজনৈতিক একটা মতাদর্শগত লড়াই যে চলছে তার প্রভাব কিছুটা হলেও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রগুলোতেও পড়ছে। রক্ষণশীল সমাজের চাপে সাড়া দুনিয়া জুড়েই সমকামীদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়তে হচ্ছে। এই সমকামী অধিকার কর্মীদের অনেকেই ভাবেন, যদি কখনো প্রমাণ পাওয়া যায় যে সমকামী প্রবণতা জৈবিকভাবে অঙ্কুরিত হয় -সেটা সমকামীদের দাবি আদায়ের জন্য অনেক উপকারে আসবে। কারণ তারা তখন আরো বলিষ্ঠভাবে মানুষজনকে বোঝাতে পারবেন যে, ‘সমকামীরা জন্মগতভাবেই সমকামীপ্রবণতা নিয়ে জন্মায়’, এতে তাদের কোনো ‘দোষ’ নেই। ‘এডভোকেট’ নামে একটি মার্কিন গে এবং লেসবিয়নদের পত্রিকায় এ নিয়ে ১৯৯৬ সালে একটি জরিপ চালান হয়, সেখানকার শতকরা ৬১ ভাগ পাঠক মত দিয়েছিল যে, ‘যদি সমকামিতার পেছনে কোনো জেনেটিক কারণ আছে বলে জানা যায়, সেটা তাদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবে’[153]।

---

[153] "it would mostly help gay and lesbian rights if homosexuality were found to be biologically determined" ; The Advocate (1996, February 6). Advocate Poll Results. p. 8.

তবে এই দলের মধ্যে বিপরীত মতও আছে। যদি সমকামী প্রবণতা 'জেনেটিক' বলে প্রমাণিত হয়, তবে একে 'জেনেটিক রোগ' হিসেবে চিহ্নিত করে দেবার প্রবণতাও হয়ত বৃদ্ধি পাবে। এ ধরনের ভয় থেকে অনেকে আবার জিনের সাথে সম্পর্ক না পাওয়া গেলেই বরং ভালো বলে মনে করেন। তারা আশঙ্কা করেন আগে ডাক্তারেরা যেভাবে সমকামিতাকে 'মানসিক ব্যাধি' হিসেবে চিহ্নিত করে নানা উপায়ে রোগমুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন, সেরকম প্রবণতা হয়ত জেনেটিস্টদের মধ্যেও ভবিষ্যতে দেখা যাবে। তারা হয়ত হান্টিংটন ডিজিজ, আলসাইমার্স, মাইগ্রেন, সিকেল সেল এনিমিয়ার মতো সমকামিতাকেও জেনেটিক রোগ হিসেবে দেখিয়ে তার চিকিৎসার দাওয়াই তখন বাৎলে দিতে চাইবেন। Xq28 এলাকার ঠিক পাশেই ক্রোমোজমের ভিন্নতার কারণে *অকুলার এলবেনিজম* এবং *মেনকিস ডিজিস* নামে দুটি দুর্লভ জেনেটিক রোগ তৈরি হয় বলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন। সমকামিতাও কি সে ধরনের কোনো জেনেটিক রোগ? এর জবাব আমরা খুঁজতে চেষ্টা করবো পরবর্তী অধ্যায়ে।

সপ্তম অধ্যায়

সমকামিতা কি কোনো জেনেটিক রোগ?

মানসিক অথবা জেনেটিক রোগ?

সমকামিতার ইতিহাস থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ইতিহাসের একটা বড় সময় জুড়েই সমকামীদের অবিরতভাবে যুদ্ধ করতে হয়েছে ‘সমকামিতা এক ধরনের মানসিক রোগ’– সমাজে গেঁথে বসা এই মিথ্যা বিশ্বাসটি ভাঙতে। উগ্র ধর্মবাদীরা তো প্রথম থেকেই নানা পদের ঘোট পাকাতে সব সময়ই মুখিয়ে থাকতো, তার উপর মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে রঙ্গমঞ্চে হাজির হয়েছিলেন ‘মনোবিজ্ঞানী’ নামের বিজ্ঞানীরা। রিচার্ড ফ্রেইহার ইবিং সেই ১৮৮৬ সালে ‘সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস’ বইটির মাধ্যমে সমকামীদের গায়ে যে ‘মানসিক রোগের’ তকমা লাগিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে প্রায় একশ বছর ধরে সকল ‘ডিগ্রীধারী’ মনোবিজ্ঞানী আর ডাক্তারেরা যৌনতার এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে ‘অস্বাভাবিক’ হিসেবে চিত্রিত করে গেছেন। শুধু তাই নয়, তারা সমকামীদের ‘রোগমুক্ত’ করতে পুরো উনিশ শতক জুড়ে নানাধরনের নিষ্ঠুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, অত্যাচার করেছেন, নির্যাতন করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত একটা সময় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে,তারা যেমনটি আগে ভেবেছিলেন - সমকামিতা আসলে কোনো রোগ নয়। আসলে স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় -দুনিয়া জুড়ে সমকামী মানবাধিকারকর্মীরাই ডাক্তার এবং মনোবিজ্ঞানীদের মনে গেঁথে যাওয়া ‘বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার’ ভেঙ্গেছেন, তারা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সমকামী হয়েও স্বাস্থ্যকর এবং সুখী জীবন যাপন করা যায়। তার পরেও সমকামিতাকে এখনো অনেকেই ভুলভাবে এক ধরনের ‘রোগ’ বলে মনে

করে থাকেন। তারা ভাবেন চিকিৎসার মাধ্যমে এই ধরনের রোগ আসলেই ভালো করে ফেলা সম্ভব। সত্যই কি তাই? ব্যাপারটা বুঝতে হলে আমাদের রোগ বা 'ডিজিস' জিনিসটা কি সেটা ভালো করে বুঝতে হবে। মেডিকেলের অভিধানে রোগের যে সংজ্ঞা দেয়া আছে তা হচ্ছে[154]

> Disease is an impairment of the normal state of the body that interrupts function, causes pain, and has identifiable charecteristics.

এই সংজ্ঞানুযায়ী সমকামিতা কোনোভাবেই রোগ নয়, কারণ এটি শরীরে কোনো ব্যাথা বেদনা ঘটাচ্ছে না, কিংবা শরীরের কোনো 'ফাংশন' বিনষ্ট করেছে না। তারপরও স্বাভাবিক বা 'নরমাল' শব্দটি নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। কারণ কোনোটা স্বাভাবিক আর কোনোটা অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য তা উপরের সংজ্ঞায় স্পষ্ট করা হয়নি। একটি ব্যাপার এক্ষেত্রে পরিষ্কার করে বলা দরকার যে, সমকামিতা আসলে একটি যৌন-প্রবৃত্তি। আর যৌন-প্রবৃত্তি জিনিসটা কোনো রোগ নয়, যেটা চিকিৎসা করে 'নিরাময়' করা যেতে পারে। তারপরেও লাইসেন্সধারী ডাক্তাররা সমকামিতাকে একটা সময় 'রোগ' হিসেবে চিহ্নিত করে তা 'নিরাময় করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সমকামিতা-চিকিৎসার যে সমস্ত দাওয়াই তারা দিয়েছিলেন তা কেবল 'পিচাশ কাহিনী' আর 'হরর মুভি' গুলোতেই দেখা যায়। তারা চিকিৎসার নামে কখনো রোগীদের ইলেক্ট্রিক শক দিতেন, কখনো মস্তিষ্কে সার্জারি করে একটা অংশকে অকেজো করে দিতেন, কখনোবা দেহে ইচ্ছেমতোন হরমোন প্রবেশ করাতেন এমনকি খোঁজা পর্যন্ত করে দিতেন[155]। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতিটি ছিল 'অরুচি বা বমি চিকিৎসা'(Aversion therapy)। এই চিকিৎসায় সমকামী পুরুষকে চেয়ারে বসিয়ে নানা ধরনের যৌনকামনা উদ্রেককারী সমকাম-নির্ভর ছবি দেখানো হতো, আবার সেই

[154] See for example Medical dictionaries available on MedLine; http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/mplusdictionary.html

[155] Eric Marcus, Is It a Choice? Answers to the Most Frequently Asked Questions About Gay & Lesbian People, HarperOne; 3 Revised edition, 2005

সাথে তার পুরুষাঙ্গে বৈদ্যুতিক শক প্রয়োগ করে বমি করানোর চেষ্টা করা হতো। জার্মানিতে আবার একটি চিকিৎসায় কবর থেকে মরা লাশ তুলে নিয়ে পুরুষাঙ্গ ছেদন করে সমকামী রোগীর দেহের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হতো টেস্টোস্টেরন লেভেল বাড়ানোর জন্য, এটি করা হতো রোগীকে না জানিয়েই[156]। একবার ক্যাপ্টেন বিলি ক্লেগ হিল নামের ২৯ বছরের এক রোগীকে ১৯৬২ সালে এই বমি চিকিৎসার নামে এমন অত্যাচার করা হয় যে রোগী রীতিমতো কোমাতে চলে যান এবং হাসপাতালের বিছানায় মৃত্যুবরণ করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার লক্ষে এটাকে তখন 'স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু' হিসেবে উপস্থাপন করে। প্রায় ত্রিশ বছর পরে পুনঃ তদন্তে বের হয়ে আসে যে, বমি চিকিৎসায় ব্যবহৃত এপোমরফিনের প্রভাবে বিলি সে সময় অচেতন হয়ে কোমায় চলে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে পিটার প্রাইস নামের এক ব্যক্তিকে সমকামিতা থেকে মুক্ত করার জন্য একটি জানালাবিহীন ছোট্ট খুপড়িতে তিনদিন ধরে আটকে রাখা হয়। তাকে বাইরে থেকে গালিগালাজ সমৃদ্ধ টেপ শোনানো হয়, আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় ইঞ্জেকশন দিয়ে বমি করানো হয়। সেই বমি, প্রশ্রাব আর নিজের বিষ্ঠার মধ্যেই তাকে থাকতে বাধ্য করা হয়। তার এই অত্যাচারের কাহিনী হয়ত আজ নাৎসী বাহিনীর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের সাথে তুলনীয় মনে হবে। কিন্তু পার্থক্য একটাই - ব্যাপারটি ঘটেছিল ব্রিটেনের সম্ভ্রান্ত এনএইচএস হাসপাতালে[157]। এ ধরনের বহু নৈরাজ্যজনক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে সমকামিতার কৃষ্ণ ইতিহাস। সমাজের এই ধরনের ট্যাবু ভেঙে ভেঙেই প্রতিনিয়ত এগুতে হয়েছে সমকামীদের। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন স্বীকার করে নেয় সে সমকামিতা কোনো রোগ নয়, এটি যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এটি সমকামিতার আইনি অধিকার এবং সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের লড়াইয়ে এক বিরাট মাইলফলক, এক ঐতিহাসিক

---

[156] Brian Wheeler, When gays were 'cured', BBC News Online Magazine; http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/3258041.stm
[157] Peter Tatchell, Aversion Therapy Exposed, Guardian 13 September 1997

বিজয়। আজ ২০০৯ সালে দাঁড়িয়ে এ কথা বলা যায় সমকামিতা যে যৌনতার একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এ ব্যাপারে প্রায় সকল চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞরাই একমত পোষণ করেন (এই অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক বক্স দেখুন –‘ সমকামিতা কি কোনো রোগ বা মনোবিকৃতি?’)। প্রসঙ্গত, আমেরিকান সাইকোলজিকাল এসোসিয়েশন ১৯৯৪ সালে ‘স্টেটমেন্ট অন হোমোসেক্সুয়ালিটি’ শিরোনামে যে বিবৃতি জনসমক্ষে প্রকাশ করে, তার প্রথম দুটো অনুচ্ছেদ এখানে প্রণিধানযোগ্য[158] –

> ‘সমকামিতা নিয়ে গবেষণার ফলাফল খুবই পরিষ্কার। সমকামিতা কোনো মানসিক রোগ (Mental Illness) নয়, নয় কোনো নৈতিকতার অধঃপতন। মোটা দাগে এটি হচ্ছে আমাদের জনপুঞ্জের সংখ্যালঘু একটা অংশের মানবিক ভালোবাসা এবং যৌনতা প্রকাশের একটি স্বাভাবিক মাধ্যম। একজন গে এবং একজন লেসবিয়নের মানসিক স্বাস্থ্য বহু গবেষণায় নথিবদ্ধ করা হয়েছে। গবেষণার বিচার, দৃঢ়তা, নির্ভরযোগ্যতা, সামাজিক এবং জীবিকাগত দিক থেকে অভিযোজিত হবার ক্ষমতা – সব কিছু প্রমাণ করে যে, সমকামীরা আর দশটা বিষমকামীর মতোই স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে পারে।
>
> এমনকি সমকামিতা বিষয়টি কারো পছন্দ বা চয়েসের ব্যাপারও নয়। গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, সমকামী প্রবৃত্তিটি জীবনের প্রাথমিক পর্যায়েই তৈরি হয়ে যায়, এবং সম্ভবত তৈরি হয় জন্মেরও আগে। জনসংখ্যার প্রায় দশভাগ অংশ সমকামী, এবং এটি সংস্কৃতি নির্বিশেষে একই রকমই থাকে, এমনকি নৈতিকতার ভিন্নতা এবং মাপকাঠিতে বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও। কেউ কেউ অন্যথা ভাবলেও, নতুন নৈতিকতা আরোপ করে জনসমষ্টির সমকামী প্রবৃত্তি পরিবর্তন করা যায় না। গবেষণা থেকে আরো বেরিয়ে এসেছে যে, সমকামিতাকে ‘সংশোধন’-এর চেষ্টা আসলে সামাজিক ও মনঃস্তাত্বিক্ক কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছু নয়’।

---

[158] A statement from The American Psychological Association, July 1994

সমকামিতা কি কোনো রোগ বা মনোবিকৃতি?

বিজ্ঞানীরা আজ মেনে নিয়েছেন যে, শুধু মানুষের মধ্যে নয় সব প্রাণীর মধ্যেই সমকামিতার অস্তিত্ব আছে। কাজেই সমকামিতা প্রকৃতিজগতের একটি বাস্তবতা। আরো জানা গিয়েছে যে, সমকামিতার ব্যাপারটা কোনো জেনেটিক ডিফেক্ট নয়। একটা সময় সমকামিতাকে কেবল মনোরোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। চিকিৎসকেরা বিভিন্ন থেরাপি দিয়ে তাদের চিকিৎসা করতেন। এর মধ্যে শারিরীক নির্যাতন, শক থেরাপি, বমি থেরাপি সব কিছুই ছিল, কিছু ক্ষেত্রে জোর করে এদের আচরণ পরিবর্তন করলেও পরে দেখা গেছে অধিকাংশই আবার তারা সমকামিতায় ফিরে যায়। এ ধরনের অসংখ্য প্রমাণ আছে। আসলে বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যাবার পর ডাক্তাররা এবং অন্যান্য অনেকেই আজ মেনে নিয়েছেন, সমকামিতা যৌনতার একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সেজন্যই কিন্তু ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোনো নোংরা ব্যাপার নয়, নয় কোনো মানসিক ব্যধি। এ হলো যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ১৯৭৫ সালে আমেরিকান সাইকোলজিকাল এসোসিয়েশন একইরকম অধ্যাদেশ প্রদান করে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন ১৯৮১ সালে সমকামিতাকে মানসিক রোগের তালিকা থেকে অব্যহতি দেয়। আমেরিকান ল ইন্সটিটিউট তাদের মডেল পেনাল কোড সংশোধন করে উল্লেখ করে –‘কারো ব্যক্তিগত যৌন আসক্তি এবং প্রবৃত্তিকে অপরাধের তালিকা হতে বাদ দেয়া হলো’। আমেরিকান বার এসোসিয়েশন ১৯৭৪ সালে এই মডেল পেনাল কোডের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে সমকামিতাকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এর ফলে সমকামীরা পায়

অপরাধবোধ থেকে মুক্তি। আমেরিকান ১৯৯৪ সালে আমেরিকান সাইকোলজিকাল এসোসিয়েশন তাদের ‘স্টেটমেন্ট অন হোমোসেক্সুয়ালিটি’ শিরোনামের একটি ঘোষণাপত্রে সমকামিতাকে একটি স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে উল্লেখ করে এবং কারো যৌনপ্রবৃত্তিকে পরিবর্তন করার যে কোনো প্রচেষ্টাকে অনৈতিক বলে উল্লেখ করা হয়। আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন ১৯৯৪ সালের একটি রিপোর্টে সমকামিতাকে স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, এবং অভিমত ব্যক্ত করে যে, সমকামীদের যৌনতার প্রবৃত্তি পরিবর্তনের চেষ্টা না করে বরং তারা যেন সমাজে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে আমাদের সেই চেষ্টা করা উচিৎ। একাডেমী অব পেডিইয়াট্রিক্স এবং কাউন্সিল অব চাইল্ড এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ স্পষ্ট করেই বলে যে সমকামিতা কোনো চয়েস বা পছন্দের ব্যাপার নয়, এবং এই প্রবৃত্তিকে পরিবর্তন করা যায় না। ১৯৯৮ সালে ম্যানহাটনে কনফারেন্সে সাইকোএনালিটিক এসোসিয়েসন তাদের পূর্ববর্তী হোমোফোবিক ব্যবহারের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ১৯৯৯ সালে আমেরিকান একাডেমী অব পেডিয়াট্রিক্স, আমেরিকান কাউন্সিলিং এসোসিয়েশন, আমেরিকান এসোসিয়েশন অব স্কুল এডমিনিস্ট্রেটরস, আমেরিকান ফেডারেশন অব টিচার্স, আমেরিকান সাইকোলজিকাল এসোসিয়েশন, আমেরিকান স্কুল হেলথ এসোসিয়েশন, ইন্টারফেইথ এলায়েন্স ফাউন্ডেশন, ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্কুল সাইকোলজিস্ট, ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশাল ওয়ার্কার এবং ন্যাশনাল এডুকেশন এসোসিয়েশন একটি যৌথ বিবৃতিতে সমাকামিতাকে একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হিসেবে উল্লেখ করে তাদের উপর যে কোনো ধরনের আক্রমণ, আগ্রাসন এবং বৈষম্যের নিন্দা করেন। পশ্চিমা বিশ্বে কোনো আধুনিক চিকিৎসকই সমকামিতাকে এখন আর ‘রোগ’ বা বিকৃতি বলে আর চিহ্নিত করেন না।

মনোবিজ্ঞানীরা রণে ভঙ্গ দিলেও পরবর্তীকালে ঘোট পাকাতে আবারো এগিয়ে আসলেন আরেকদল বিজ্ঞানের তকমা লাগানো এক দল- আধুনিক জেনেটিক্স-ওয়ালারা। জিনগত গবেষণার ব্যাপারগুলো রঙ্গমঞ্চে আসার পর আবার নতুন করে সমকামিতাকে 'জেনেটিক ডিফেক্ট' হিসেবে দেখানোর চেষ্টা শুরু করেছিলেন কিছু কিছু 'বিশেষজ্ঞ'। কিন্তু সমকামিতার প্রবণতা যে কোনো জেনেটিক ডিফেক্ট নয় এটা অনেক ভাবেই প্রমাণ করা যেতে পারে। কীভাবে সেটা? প্রথমকথা, সমকামিতাকে 'জিনগত বিকৃতি' বলার আগে জিনের সাথে সমকামিতার সত্যই সম্পর্ক আছে কিনা- তা পরিষ্কার করতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটা এখনো আমাদের কাছে ধোঁয়াশা। আমরা আগের অধ্যায়ে সমকামিতা নিয়ে জিনসংক্রান্ত গবেষণার কথা জেনেছি। জিনের সাথে সমকামিতার একটা যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা হলেও এটা কিন্তু আমাদের পরিষ্কার করে বুঝতে হবে যে- 'গে জিন' বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব বিজ্ঞানীরা (এখনো) বের করতে পারেননি। 'জিনগত' কোনো ফ্যাকটর যদি থেকেও থাকে সেটা হয়ত বেশ কয়েকটি জিনের প্রভাবের সম্মিলিত ফল হবে। আর শুধু জিনকে গোণায় ধরলেই হবে না, এর সাথে আসতে হবে পরিবেশের প্রভাব। এপিজেনিটিক্স নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বহু জিন পরিবেশের প্রভাবে নিজেদের সক্রিয়করণ (Activation) বা নিষ্ক্রিয়করণ (Deactivation) ঘটায় - অনেকটা বিদ্যুতের বাতির সুইচ অন অফ-এর মতোই। এই নতুন শাখাটি থেকে আমরা জানতে পারছি পরিবেশ থেকে সংকেত নিয়ে দেহ কীভাবে তার অভ্যন্তরস্থ জিনের প্রকাশভঙ্গিকে (Genetic expression) বদলে ফেলে[159]। কাজেই জিন এবং পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ব্যাপারটি পুরোপুরি পরিষ্কার না হলে আমরা সমকামিতাকে এখনই 'জেনেটিক' বলে রায় দিতে পারি না, আর জেনেটিক রোগ বলা তো আরো পরের কথা। যদি আমরা তর্কের খাতিরে ধরেও নেই জিনের সাথে সমকামিতার সরাসরি একটা সম্পর্ক রয়েছেই, তারপরও এটাকে জনপুঞ্জের প্রকারণ বা ভ্যারিয়েশন না বলে 'রোগ' বলাটা বালখিল্যই হবে। আসলে

---

[159] বইয়ের পরিশিষ্টে *মানব প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিগুলো কি জন্মগত নাকি আচরণগত?* দ্রষ্টব্য।

আমরা যদি বিবর্তনের পটভূমিকায় চিন্তা করি, তাহলে যে কোনো দেহজ বৈশিষ্ট্যই আসলে কোনো না কোনো 'জেনেটিক মিউটেশন'-এর ফল। কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কারো চুল কালো, কারোটা বাদামী, কারো চোখ কালো, কারোটা আবার কটা। এগুলো কোনোটিকেই আমাদের সমাজে 'জেনেটিক রোগ' বলে চিহ্নিত করা হয় না। আমার এক বন্ধুর চোখের রঙ পুরোপুরি নীল। এবং সে এই রঙ নিয়ে যার পর নাই গর্বিত। কিন্তু যেহেতু আমার চারপাশের সবার চোখেরই রঙই আমি দেখি কালো বা বাদামী, কাজেই আমার বন্ধুর চোখকে কি আমি 'রোগাক্রান্ত' বলে রায় দিয়ে দিতে পারি? আমি কি তাকে গিয়ে বলতে পারি যে, যেহেতু আমার দেখা চারপাশের সবার চোখের রঙের সাথে তার রঙ মেলে না সেহেতু তার চোখের রঙ বদল করে অন্যদের মতো করে ফেলা উচিৎ? না, আমি তা মোটেই বলতে পারি না, আর বললেও বন্ধুটি সেটা মেনে নেবে কেন? কারণ জেনেটিক মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট চোখের এই নীল রঙ তার কোনো সমস্যা করছে না। বরং তার চোখের এই নীল রঙ নিয়ে সে চলনে বলনে একেবারে কেতাদুরস্ত। তার কাছে এই মিউটেশন অপছন্দনীয় নয়, বরং দারুণ গর্বের।

সমকামিতার ব্যাপারটিকেও আমার বন্ধুর নীল চোখের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ধরা যাক, চোখের নীল রঙের মতোই সমকামিতাও কোনো এক জেনেটিক মিউটেশনের ফল। কিন্তু মিউটেশন হয়েছে বলেই কি আমরা তাকে জেনেটিক রোগ বলে অভিহিত করে দেব, আর সকল সমকামীদের বলব যে সমকামিতা ছেড়ে বিষমকামিতার জগতে চলে যেতে? আমার নীল চোখা বন্ধুটি যেভাবে আপত্তি জানাতো তার চোখের রঙ পরিবর্তনের কথা বললে, বহু সমকামীই সেভাবে আপত্তি জানাবে, তাদের যৌনপ্রবৃত্তি পরিবর্তনের কথা বলতে গেলে। তাদের অনেকেই কিন্তু এই সমকামী প্রবৃত্তি নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে না, বরং তারা গর্বের সাথেই প্রতিবছর 'গে-প্রাইড'[160] মার্চে অংশ নিচ্ছে। তারা মনে করে, তাদের এই সমকামী প্রবৃত্তি কারো

[160] LGBT pride or gay pride is the concept that lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people should be proud of their sexual orientation and gender identity. The modern "pride" movement began after the "Stonewall riots" in 1969.

কোনো সমস্যা করছে না, স্বাভাবিক কোনো কাজকর্মের ক্ষেত্রেও এটি বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে না। কাজেই সমকামী প্রবৃত্তি তাদের কাছে কোনো রোগ নয়, বরং একটি স্বাভাবিক প্রকারণ (Variation) মাত্র। আর এ কথা তো বলাই বাহুল্য যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একটি প্রকারণ যখন 'অনুপযুক্ত' বা 'ক্ষতিকর' হিসেবে বিবেচিত হয়, তখন তা আপনা আপনিই বাতিল হয়ে যায়। কারণ ক্ষতিকর মিউটেশনবাহী এ সমস্ত জীব বংশবৃদ্ধি করার আগেই মৃত্যুবরণ করে ফলে তারা উত্তরাধিকার টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু যে মিউটেশন গুলো বাড়তি উপযোগিতা দেয় (যেমন, দু'পায়ের উপর ভর করে দাড়ানোর ক্ষমতা, কিংবা মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ইত্যাদি) কিংবা থাকে আপাত নিরপেক্ষ (যেমন, সাদা হাড় কিংবা নীল চোখ ইত্যাদি) সেগুলো প্রকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিলুপ্ত হয় না, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জেনেটিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বাহিত হয়। এ কথা নিঃসন্দেহ যে সমকামিতা শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, সমস্ত প্রাণী জগতেই প্রবলভাবেই দৃশ্যমান। সমকামিতা যদি সত্যই 'জেনেটিক ডিফেক্ট' হতো, তা হলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ছাকনির মধ্য দিয়ে মিলিয়ন বছর ধরে যাবার ফলে বহু আগেই বাতিল হয়ে যাবার কথা ছিল। প্রকৃতিতে হাজার হাজার জিনিস বিলুপ্ত হয়ে গেছে- কিন্তু সমকামী প্রবণতা হয়নি। সমকামিতা নামক প্রবণতাটি প্রাণী জগতে তবুও আছে রাজত্ব করছে অনাদিকাল থেকেই। কাজেই সমকামিতাকে প্রকারণ না বলে রোগ বলাটা যুক্তিযুক্ত নয়।

জেনেটিক রোগের বিপরীতে সমকামিতার অবস্থানের আর একটি বড় কারণ হলো সংখ্যাধিক্য। আমরা আগের একটি অধ্যায়ে দেখেছি, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী আলফ্রেড কিন্সের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি দশ জন ব্যক্তির একজন সমকামী। খুব রক্ষণশীল হিসাবও যদি ধরা হয় সেটা কোনোভাবেই পৃথিবীর সামগ্রিক জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগের কম হবে না। আর জেনেটিক ডিফেক্ট সে তুলনায় অনেকটাই দুর্লভ ঘটনা। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক। বিজ্ঞানীরা বলেন, জেনেটিক রোগের দুর্লভতার পরিমাপ (Degree of rarity) নির্ধারিত হয় দুইটি বিদ্যমান প্রক্রিয়ার

সাংঘর্ষিক মিথস্ক্রিয়ায়। এদের মধ্যে একটি হলো পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের মাধ্যমে সৃজন (Formation by mutation) এবং অন্যটি হলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বর্জনের হার (Rate of elimination by natural selection)। এই দুইয়ের প্রতিযোগিতায় নির্ধারিত হয় দুর্লভতার স্তর যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় পরিব্যক্তি-নির্বাচন ভারসাম্য (mutation-selection equilibrium)[161]। নীচের সারণী থেকে জেনেটিক রোগ এবং প্রকারণের একটা সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে –

সারণী ৭.১ *দুর্লভতা এবং রোগের প্রকোপের মধ্যকার পারস্পারিক সম্পর্ক*

জন্ম	ডারউইনীয় ফিটনেসের হ্রাস	জেনেটিক রোগ নাকি প্রকারণ?
প্রতি ১০ জনে ১	০.০০১%	প্রকারণ
প্রতি ১০০ জনে ১	০.০১%	
প্রতি ১০০০ জনে ১	০.১%	
প্রতি ১০,০০০ জনে ১	১%	
প্রতি ৫০,০০০ জনে ১	৫%	জেনেটিক রোগ
প্রতি ১০০,০০০ জনে ১	১০%	
প্রতি ১,০০০,০০০ জনে ১	১০০%	

যদি কোনো জেনেটিক বৈশিষ্ট্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয় তবে সেটি এক মিলিয়নে একটি ঘটতে দেখা যায় (সারনী ৭.১ এর সর্বশেষ সারি দ্রঃ)। দেখা গেছে, যদি ডারউইনীয় ফিটনেসের হ্রাসের হার শতকরা ১০ ভাগে নেমে আসে তবে জেনেটিক বৈশিষ্ট্য বেড়ে প্রতি একশ হাজারে একটিতে উঠে আসে। যদি ফিটনেসের হ্রাস শতকরা পাঁচ ভাগ থাকে তবে সেই জেনেটিক বৈশিষ্ট্য ঘটবে প্রতি পঞ্চাশ হাজারে একটি। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, প্রতি পঞ্চাশ হাজারে একটি বৈশিষ্ট্য থাকার

[161] James F. Crow and Motoo Kimura, Introduction to Population Genetics Theory, Harper & Row Publishers, June 1, 1970

হারকে জেনেটিক রোগাক্রান্ত হবার প্রান্তসীমা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে[162]। অর্থাৎ, সোজা কথায় - মিউটেশনের মাধ্যমে কোনো জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সংঘটনের হার যদি প্রতি পঞ্চাশ হাজারে একটি বা তারও কম ঘটে, তবে সেটিকে জেনেটিক রোগ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, তার বেশি হলে নয়। উদাহরণ হিসেবে এখানে *হান্টিংটন ডিজিজ* - নামে একটি জেনেটিক রোগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি ঘটে প্রতি ১০০,০০০ জনে ৪ থেকে ৭টি। সঙ্গত কারণেই এটি জেনেটিক রোগ হিসেবে গণ্য হবে। এরকম আরো জেনেটিক ডিফেক্ট আছে যেগুলো ঘটে খুব বেশি হলে প্রতি ৫০,০০০ জনে একটি করে ঘটে। এর সাথে তুলনা করলে বোঝা যায়- জেনেটিক ডিফেক্ট (৫০, ০০০ এ ১টি) এর তুলনায় সমকামিতার এই হার ২৫০০ গুণ বেশি (১০০ জনে ৫ জন ধরে হিসেব করলে)। তাই বিজ্ঞানীরা আজ বলেন[163] -

> সমকামিতা কোনো ধরনের 'ম্যালফাংশানিং' নয়... এটা নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই। সমকামিতা কোনো জেনেটিক বিকৃতিও নয়, নয় কোনো জেনেটিক রোগ।

তারপরেও কেউ যদি জেনেটিক ডিফেক্টের কথা বলেন, তাহলে তাদের প্রাণীজগতে সমকামিতার ব্যাপারটাও কিন্তু ব্যাখ্যা করতে হবে। কারণ আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে দেখেছি প্রাণীজগতেও কিন্তু সমকামী প্রবণতার হার একেবারে ফেলনা নয়। বনবো শিম্পাঞ্জিদের সমকামিতা প্রবণতা এতই বেশি যে এটা হেটারোসেক্সুয়াল রিলেশনশিপের সাথেই তুলনীয়। জাপানী ম্যাকুয়ি নামের এক ধরনের বাঁদর নিয়ে গবেষকরা গবেষণা করে সমকামিতার উল্লেখযোগ্য প্রবণতা লক্ষ করেছেন। এছারা হাতি, সিংহ, চিতাবাঘ, হায়না, ক্যাঙ্গারু, হরিণ, জিরাফ, পাহাড়ি ভেড়া, আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার মোষ, জেব্রা উল্লেখযোগ্য। পাখিদের মধ্যে পেঙ্গুইন, ধুসর

[162] Joan Roughgarden, *Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People*, University of California Press, May 17, 2004

[163] Joan Roughgarden, পূর্বোক্ত।

পাতিহাঁস, কানাডা পাতিহাঁস, কালো রজহাঁস, বরফী পাতিহাঁস, মিউট রাজহাঁস, শকুনসহ অনেক প্রাণীর মধ্যে সমকামিতার সুস্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। সরীসৃপের মধ্যে সমকামিতার আলামত আছে কমন অ্যামিভা, অ্যানোল, গিরগিটি, স্কিনক, গেকো মাউরিং, কচ্ছপ, রাটেল স্নেক প্রভৃতিতে। বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত ১৫০০-র বেশি প্রজাতিতে সমকামিতা এবং রূপান্তরকামিতার অস্তিত্ব সনাক্ত করেছেন, এই বইয়ের চতুর্থ পর্বে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই ধরে নেয়া হয়ত ভুল হবে না যে, প্রকৃতিতে সমকামিতার অস্তিত্ব সবসময় ছিল, আছে, এবং থাকবে। কাজেই জেনেটিক ডিফেক্টের কথা যারা বলেন তাদের ব্যাখ্যা করতে হবে কেন এই 'জেনেটিক ডিফেক্ট' প্রকৃতিতে এত সফলভাবে টিকে আছে। বলা বাহুল্য, এর কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

আর 'রোগ' সারাতেই বা চায় কে?

যদিও সমকামী-রূপান্তরকামী-উভকামীদের আর এখন আর পশ্চিমা বিশ্বে জেনেটিক এবং মানসিক রোগাক্রান্ত হিসেবে আর গণ্য করা হয় না, কিন্তু একটা সময় রোগ সারাবার নাম করে যাবতীয় কু-চিকিৎসা আর অপচিকিৎসা করে রীতিমতো অত্যাচার আর নিপীড়ন করা হতো। ইলেক্ট্রিক শক, মস্তিষ্কে সার্জারি, হরমোন চিকিৎসা কিংবা বমি চিকিৎসা'র নামে কীভাবে 'মনোবিশেষজ্ঞ'রা সেসময় রোগীদের উপর ভয়াবহ সব অত্যাচারের কথা যার কিছু উল্লেখ আমি করেছি এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে। ইতিহাসের পাতা খুঁজলে দেখা যাবে, বিশেষজ্ঞদের এ ধরনের 'চিকিৎসা'র শিকার শুধু সমকামীরাই হয়নি, হয়েছে অন্যান্য উপসর্গধারী রোগীরাও। কিছু উদাহরণ হাজির করা যাক।

এক সময় মৃগীরোগ বা হিস্টেরিয়ার চিকিৎসা করতে গিয়ে মেয়েদের ভগাঙ্কুর কেটে ফেলে দিতেন ডাক্তারেরা[164]। তারা ভাবতেন হিস্টেরিয়াগ্রস্ত মেয়েরা যৌনোন্মাদ। এদের ভগাঙ্গুর কেটে মেয়েদের 'ওভারসেক্সড' হবার হাত থেকে রক্ষা করলেই হিস্টেরিয়াও

---

[164] Theatres of Madness, Deviant Bodies, edited by J.Terry and J. Urla, Bloomington, Indiana University Press

কমে যাবে। ফলে ১৮৬০ সালের দিকে হিস্টেরিয়া চিকিৎসার নামে অসংখ্য মেয়েদের ক্লায়টোরিস কেটে ফেলে যৌন-প্রতিবন্ধী বানিয়ে ছেড়ে দিতেন 'বিশেষজ্ঞ' চিকিৎসকেরা। আর সেই কাজের সপক্ষে কথা বলতেন এভাবে[165] –

> 'আমাদের ধারণা ক্লাইটোরিস কেটে ফেলা মেয়েরা থাকে অনেক সুখি। তারা ঘুমায় ভালো করে, খায় ভালো করে, আর থাকে সারাদিন হাসিখুশি। আর তাছাড়া হিস্টেরিয়া চিকিৎসা করে ভালো করার মতো রোগ নয়। কাজেই রোগীকে যতদূর শান্তি দেয়া যায়, সেটাই ভালো'।

ভাবছেন শুধু মেয়েদের ভগাঙ্গুরই ডাক্তারদের জন্য সমস্যা ছিল? পুরুষের দলের কপালেও শান্তি রাখেননি স্বনামখ্যাত ডাক্তারেরা। তাদের জন্য সমস্যা করেছে পুরুষদের লিঙ্গের নীচে ঝুলে থাকা বাড়তি চামড়াটুকুও। অর্থাৎ ছেলেদের খৎনা করা নিয়েও ঘোট পাকিয়েছে ডাক্তারেরা বিস্তর। ১৯৬০ সালের দিকে আমেরিকায় জন্ম নেয়া শতকরা ৯৫ ভাগ শিশুর ত্বকচ্ছেদ করা হতো। তারপর ১৯৭০ সালের দিকে আমেরিকান একাডেমী অব পেডিয়াট্রিক্স ঘোষণা করে যে– খৎনা করায় কোনো 'চিকিৎসাগত সুবিধা' নেই। তারাই আবার ১৯৮৯ সালে গণেশ উলটে দিয়ে বলা শুরু করলো – এতে দারুণ 'পোটেনশিয়াল বেনেফিট' আছে। তারপর ১৯৯৯ সালে একাডেমীর পঞ্চাশ হাজার সদস্য উপসংহারে পৌঁছন যে, এই 'বেনেফিট' কোনো 'বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়'[166]।

সমকামিতার ব্যাপারটি নিয়েও ঠিক একইভাবে জল ঘোলা করা হয়েছে বিস্তর। জেনেটিক্স বিজ্ঞানের রঙ্গমঞ্চে আসার পর সমকামিতা জেনেটিক রোগ কিনা সেটাও গবেষণা করে বের করতে চেয়েছিলেন গবেষকেরা। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে মারিয়ার 'এন্ড্রোজেন ইনসেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম' এর সাথে পরিচিত হয়েছিলাম – যার ফলে XY ক্রোমোজম বিশিষ্ট 'পুরুষ' সন্তান নারী কাঠামোর আদলে দেহ নিয়ে বেড়ে উঠে।

---

[165] Rachel P. Maines, The Technology of Orgasm: "Hysteria," the Vibrator, and Women's Sexual Satisfaction, The Johns Hopkins University Press, 2001

[166] Deborah Stead, Circumcision's Pain and Benefits Re-Examined, New York Times, March 2, 1999

গবেষকদল দেখতে চেয়েছেন সমকামীদের জিনের রিসেপ্টরে ‘এন্ড্রোজেন ইনসেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম’ এর মতো কোনো ‘সমস্যা’ আছে কিনা। তারা সমকামী ভাতৃযুগলের টেস্টোস্টেরন রিসেপ্টরের জিন পর্যবেক্ষণ করে তা বিশ্লেষণ করে দেখলেন। তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই তারা খুঁজে পেলেন না[167]। টেস্টোস্টেরন রিসেপ্টরের জিন সমকামী বিষমকামী উভয় দলেই ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিল, কোনো প্যাটার্ন ছাড়াই। ফলে সমকামিতার ব্যাপারটি যে ‘এন্ড্রোজেন ইনসেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম’ এর মতো কোনো কিছু নয়, তা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল। এর আগে, জেনেটিক্স যখন জানা ছিল না -কখনো বিকৃতি, কখনো মানসিক রোগ, কখনো অধঃপতন... এ ধরনের নানা স্তর পার হয়ে শেষ পর্যন্ত আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন ১৯৭৩ সালে যখন স্বীকার করে নিলো যে সমকামিতা কোনো রোগ নয়। হলো এক নতুন যুগের সূচনা। কিন্তু তারপরেও যে সবাই এটি মেনে নিয়েছেন তা নয়। ধর্মীয় মদদপুষ্ট কিছু চিকিৎসকদের সংগঠন যেমন NARTH এক্স-গে মিনিশট্রি নামধারী কিছু ধর্মীয় সংগঠন যেমন, ইক্সোডাস ইন্টারন্যাশনালে, এভারগ্রীন ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি সংগঠন বিচ্ছিন্নভাবে এখনো চিকিৎসার মাধ্যমে সমকামীদের ‘রোগমুক্ত’ করতে বদ্ধ পরিকর। তারা পুরুষদের আরো পুরুষালি আর মেয়েদের আরো মেয়েলি করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে আর পাশাপাশি অরুচি চিকিতৎসার মতো অপচিকিৎসা চালাচ্ছে এখনো। পাশাপাশি আবার পরিচালনা করে ধর্মীয় প্রার্থনা সভার। এই চিকিৎসার নাম দিয়েছে ‘রিপারেটিভ থেরাপি’ (প্রচলিত ভাবে অভিহিত করা হয় ‘কনভারশন থেরাপি’ হিসেবে)। তারা মনে করে এ ধরনের চিকিৎসা করে তারা সমকামী প্রবৃত্তি থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারছে। কিন্তু বাস্তবতা উলটো। গবেষক এরিয়েল শিডলো এবং মাইকেল শ্রোডার ২০০২ সালের একটি গবেষণা পত্রে[168] দেখিয়েছেন, শতকরা মাত্র ৩ ভাগ ক্ষেত্রে ‘রিপারেটিভ থেরাপি’র মাধ্যমে

---

[167] J P Macke, N Hu, S Hu, M Bailey, V L King, T Brown, D Hamer, and J Nathans, Sequence variation in the androgen receptor gene is not a common determinant of male sexual orientation, Am J Hum Genet. 1993 October; 53(4): 844-652.

[168] Shidlo, Ariel; Schroeder, Michael, "Changing Sexual Orientation: A Consumers’ Report", Professional Psychology: Research and Practice 33 (3), 2002

যৌনপ্রবৃত্তি বদল করা সম্ভব হয়েছে, শতকরা ৮৮ ভাগ ক্ষেত্রে এটি পুরোপুরি ব্যর্থ, এবং বাকিরা কোনো অভিমত দেননি। ক্লিনিকাল মনোবিজ্ঞানী ডগলাস হাল্ডম্যান এ ধরনের চিকিৎসাকে 'সুডো সায়েন্স' বলে অভিমত দিয়েছেন[169]। বলা বাহুল্য, মূল ধারার কোনো চিকিৎসকেরাই এই 'রিপারেটিভ থেরাপি'কে এখন অনুমোদন করে না।

অনেক সময় আবার শর্ষের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ভূত। আশির দশকে আমেরিকায় একজন এস-গে মিনিস্ট্রির পরিচালনায় একটি সংগঠন তৈরি করা হয় 'হমোসেক্সুয়ালস এনোনিমাস' নামে। সংগঠনের উদ্দেশ্য সমকামিতার হাত থেকে জনগনকে মুক্তি দেয়া। কিন্তু সেই সংগঠনের দু জন সদস্য মিডিয়ায় অভিযোগ করেন যে, তাদের যৌনপ্রবৃত্তির পরিবর্তন তো হয়নিই বরং, সংগঠনের পরিচালক তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। 'এক্স গে লিবারেশন ইন জেসাস ক্রাইস্ট' নামে আরেকটি সংগঠনের পরিচালকের বিরুদ্ধেও সেখানকার সদস্যদের উপর যৌন আগ্রাসনের অভিযোগ উঠে এবং তাকে পরিচালকের পদ থেকে অব্যহতি দেয়া হয়। একই ব্যক্তি তখন ১৯৮৬ সালে আরেকটি 'গে মিনিস্ট্রি' তৈরি করে এবং সেখানেও তার উপদেষ্টাদের সাথে যৌন-সংসর্গের অভিযোগ উঠে। তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সেই সংগঠন থেকেও পদত্যাগ করে আরেকটি এক্স-গে মিনিস্ট্রি স্থাপন করেন ১৯৯৩ সালে এবং সেখানেও তার সহকর্মীদের সাথে সমকামী যৌন সম্পর্কের অভিযোগ উত্থাপিত হয়[170]।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অবস্থা আরো 'খারাপ'। সম্প্রতি সমকামিতা নিয়ে জনগণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হবার পরিপ্রেক্ষিতে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য 'অজ্ঞাতকুলশীল বিশিষ্ট

---

[169] "The Pseudo-science of Sexual Orientation Conversion Therapy". ANGLES, the policy journal of the Institute for Gay and Lesbian Strategic Studies (IGLSS), www.iglss.org. 1999.

[170] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press; 1 edition, 1996

ব্যক্তিদের' দিয়ে কলাম লেখানো হচ্ছে, কখনো বা বিশেষজ্ঞের অভিমত দেয়ানো হচ্ছে। এই সমস্ত 'কলামিস্ট বিশেষজ্ঞরা'সমস্যা সমাধানের নামে এমন পরামর্শ দিচ্ছেন যে, তাতে শুধু তাদের জ্ঞানের দীনতাই ফুটে উঠছে না, সেই সাথে সামগ্রিক পরিস্থিতিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হতাশাব্যঞ্জক দিকে। যেমন, কলকাতার বিখ্যাত আনন্দবাজার পত্রিকায় ২০০৩ সালের ২৯শে নভেম্বর জনৈক মৈনাক মিত্রের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিতে মৈনাক বলেন[171],

> 'আমি পুরুষ হয়েও আরেক পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট। শারীরিকভাবে আমরা একে অপরকে ভোগ করছি। কিন্তু একটা সময় পর ছেলেটি পালিয়ে যায়। ওর কথা মনে পড়লে খুব খারাপ লাগে...'

এর উত্তরে পত্রিকার 'বিশেষজ্ঞ' ঋতা ভিমানী সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে বলেন -

> ‘এই ধরনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার একটা নতুন ট্রেন্ড এসেছে। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা আছে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। অন্যদিকে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। ছেলেটি যে চলে গেছে জানবেন তা আশীর্বাদ হয়েছে। সাঁতার কাটুন, ফুটবল খেলুন। মেয়েদের সাথে মেলামেশা করুন। যে সব বন্ধু-বান্ধব প্রেম করছেন তাদের কাছে জানতে চান মেয়েদের মনের কথা। নারীশরীরের মধ্যে যৌনতার আঁচ নিন। পুরুষালি কাজকর্ম করুন। সমকামী গে হয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখাটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু জানবেন এর মধ্যে যে নিয়মে সৃষ্টি চলেছে সেই আনন্দ নেই।’

সমকামিতাকে ‘নতুন ট্রেন্ড’ হিসেবে আখ্যায়িত করে ঋতা ভিমানী শুধু সমকামিতা বিষয়ে শুধু তার জ্ঞানের দীনতাই প্রকাশ করেননি, সেই সাথে রক্ষণশীল মহলের হাতকেও শক্তিশালী করলেন। আর বাড়িয়ে তুললেন সমকামীদের মানসিক যন্ত্রণাকে।

---

[171] আনন্দবাজার ২৯/১১/০৩

উত্তর চব্বিশ পরগনার সীমান্তবর্তী সাপোর্ট গ্রুপের অন্যতম সদস্য সুখদের সাধুখাঁ এ ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন[172],

> 'দশ লক্ষ মানুষ যে পত্রিকা পড়ে, সেখানে এই ধরনের লেখা যদি ছাপা হয়, তাহলে সমকামীদের অবস্থাটা কী হবে একবার ভাবুন। বাড়িকে বোঝাবো কি করে? সবাই ভেবে নেবে,আমরা ইচ্ছে করেই বুঝি এমন আচরণ করি। ছোট থেকে তো অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুতেই নিজের প্রকৃতিকে বদলাতে পারিনি। তাহলে এবার আমরা মরি, তাই কি আপনারা চান? বিষ কিনে দিন, খেয়ে মরি। তাহলে আপনারা বাঁচবেন। পরামর্শ দেবার নামে আমাদের নিয়ে খেলা হয়ত বন্ধ হবে।'

বাংলাদেশের অনেক পত্রিকাতেই আবার একই কায়দায় উপদেশ দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধ অনুসরণ করতে পরামর্শ দেয়া হয়। বলা হয়, এতে সমকামিতার মতো বিকৃতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। পত্র-পত্রিকার পাতায় বিশেষজ্ঞ নামধারী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত কীভাবে সমস্যাকে জটিল ও ভয়াবহ করে তুলতে পারে তার কিছু বাস্তব উদাহরণ এগুলো।

এর বাইরেও বহু 'বিশেষজ্ঞের' অবিশেষজ্ঞীয় মতামত আছে। ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে সিডনি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত 'Why Gay Men Flee Bangladesh' নামের প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ শফিউল আজমের বরাত দিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশে প্রতিবছর শতকরা ৩.৫ ভাগ হারে সমকামিতা প্রকোপ বাড়ছে, আর এর পেছনে দায়ী করা হয় আর্সেনিকের কন্টামিনেশনকে। আরেকজন 'বিশেষজ্ঞ' সমকামিতার পেছনে দায়ী করেন হিন্দি ছবির প্রসারকে। বলা বাহুল্য পৃথিবীর আর কোনো গবেষণাতেই আর্সেনিক কিংবা হিন্দি ছবিকে সমকামিতার পেছনে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। সমকামিতা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে কেবল আর্সেনিক এবং বলিউড ছবিকে দায়ী করে অধ্যাপক

---

[172] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, সমপ্রেম, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।

আজমের যে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেই গবেষণার সাথে এই গ্রন্থের লেখক দ্বিমত পোষণ করে। তপন রবি নামে এক ভদ্রলোক এককসময় মুক্তমনায় এ ব্যাপারে ২০০৬ সালে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমাদের একটা প্রতিক্রিয়া আমাদের ফোরামে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমরা মনে করি, সমকামিতা কোনো রোগ নয়, বরং এটিকে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করে একে সারাবার চেষ্টার 'অভিপ্রায়'টিকেই বরং রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা উচিৎ। গবেষক এরিক মার্কোস তাঁর 'ইস ইট এ চয়েস' বইয়ে যে মন্তব্য করেছেন[173] তার সাথে আমরাও একমত পোষণ করি –

> যে সমস্ত থেরাপিস্টরা সমকামীদের যৌনপ্রবৃত্তি পরিবর্তন করতে চান, তাদের ধরে জেলে ভরা উচিৎ। মনোবিজ্ঞানীদের যেটা করা উচিৎ তা হলো – রোগী যে প্রবৃত্তিরই হোক না কেন, তার অস্বস্তি দূর করে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে মনোবল বাড়িয়ে তোলা।

---

[173] Eric Marcus, Is It a Choice? Answers to the Most Frequently Asked Questions About Gay & Lesbian People, HarperOne; 3 Revised edition, 2005

অষ্টম অধ্যায়

সমকামিতা: সমাজ, ইতিহাস এবং সাহিত্যে

সমকামিতার সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমকামিতা কোথাও থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেনি, বরং সমকামিতার ব্যাপারটি সব সভ্যতায় সব সময়ই ছিল। সমকামীদের সন্ধান মিলবে পৃথিবীর সর্বত্র। সমকামিতা ছিল গ্রীক এবং রোমান সাম্রাজ্যে, সমকামিতা ছিল সাইবেরিয়ান সামানদের (Shaman) মধ্যে, সমকামিতা ছিল নেটিভ আমেরিকানদের মধ্যে, সমকামিতা ছিল আফ্রিকান ট্রাইবে, সমকামিতা ছিল চৈনিক রাজবংশে, সমকামিতা ছিল আরব কিংবা ভারতীয় সভ্যতায়। এমন কোনো সভ্যতার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, যেখানে সমকামিতা নেই, কিংবা ছিল না। সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, দর্শন, পুরাণ কিংবা প্রত্নতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেই গবেষকেরা জেনেছেন, সমকামী মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষেরা ইতিহাসের প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতিটি স্থানেই ছিলেন। নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে, পৃথিবী বিখ্যাত বহুজনই সমকামী, নিভৃত সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামী কিংবা সমান্তরাল যৌনতাসম্পন্ন প্রবৃত্তির মানুষ ছিলেন। সেই তালিকায় স্যাপো, সক্রেটিস, প্লেটো থেকে শুরু করে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, আবু নুয়াস, সুলতান মাহমুদ, হাফিজ, বত্তিচেলি, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেলএঞ্জেলো, ফ্রান্সিস বেকন, উইলিয়াম সেক্সপিয়র, আইজাক নিউটন, ম্যারি উওলস্টোনক্রাফট, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, লর্ড বাইরন, হ্যান্স ক্রিস্টিয়ান এন্ডারসন, নিকোলাই গোগোল, আব্রাহাম লিঙ্কন, সুসান বি এন্থনি, কার্ল উলরিচস, জন

এডিংটন সিমন্ডস, অস্কার ওয়াইল্ড, মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক, ভার্জিনিয়া উলফ, মার্গারেট মীড, সালভাদর দালি, জোয়ান ক্র্যাফোর্ড, হাওয়ার্ড হিউজেস, জন ড্যারো, অ্যালেন টুরিং, লিটল রিচার্ড, ম্যাডোনা, বয় জর্জ, অ্যান্ড্রু সুলিভান, এন্ডারসন কুপার, রেচেল ম্যাডো, মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, এঞ্জেলিনা জোলিসহ অনেকেই আছেন[174]। কাজেই সমকামিতা পৃথিবীর কোনো নির্দিষ্ট দেশ, কাল, জাতি বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, আজও নেই। সমকামিতার অস্তিত্ব সব সবসময়ইই ছিল, প্রতিটি সভ্যতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তারপরও সমকামিতার ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠভাবে লিখতে হলে কোনো কোনো সভ্যতার কথা একটু বেশি গুরুত্ব পাবে। সমকামিতার ইতিহাস এবং প্রেক্ষাপট বুঝতে হলে এ সব প্রাচীন সভ্যতার কথা বিস্তৃতভাবে জানতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই চলে আসবে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার কথা। তারপর তাকাতে হবে পরবর্তী রোমান সভ্যতার দিকেও। সমকামিতার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই সভ্যতা দুটি গুরুত্বপূর্ণ। গ্রীসো-রোমান সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করে পাওয়া যায় যে, সে সময় সমকামিতাকে একটি স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি হিসবেই বিবেচনা করা হয়েছিল। সামাজিক কিছু প্রচলিত নিয়ম নীতি ভঙ্গ না করলে সমকামিতাকে গ্রীসে নিজস্ব সংস্কৃতির অংশ হিসেবেই দেখা হতো, এবং সবার কাছেই এটির উল্লেখযোগ্য বৈধতা ছিল[175]। খ্রিষ্ট ধর্মের উত্থানের আগ পর্যন্ত সমকামিতাকে সামাজিকভাবে হেয় করার প্রচেষ্টাও শুরু হয়নি। এই অধ্যায়ে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা থেকে শুরু করে আধুনিক সভ্যতা পর্যন্ত সমকামিতার ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক ছবি আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রীক সভ্যতায় সমকামিতা

প্রাচীন গ্রীসে সমকামিতাকে চিহ্নিত করার জন্য আলাদা কোনো শব্দ ছিল না[176]। তবে কাছাকাছি একটি শব্দ গ্রীক সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল –

---

[174] Keith Stern, Queers in History: The Comprehensive Encyclopedia of Historical Gays, Lesbians and Bisexuals, BenBella Books, 2009.

[175] Byrne Fone, Homophobia: A History, Picador , November 3, 2001

[176] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press; 1 edition.

Paiderastia[177]। আক্ষরিক অর্থে অনুবাদ করলে এর মানে দাঁড়াবে 'কিশোর প্রেম' (boy love)। গ্রীসে বয়স্ক ব্যক্তির সাথে কৈশোরোত্তীর্ণ (চোদ্দ থেকে বিশ বছর বয়স্ক) যুবকের প্রেম করার রীতি ছিল[178]। বয়স্ক ব্যক্তিটিকে বলা হতো এরাস্তেস (*erastes*) বা প্রেমিক, এবং যুবকটিকে বলা হতো এরোমেনোস (eromenos) বা প্রেমাস্পদ[179]।

গ্রীসের সম্পর্কগুলো লিঙ্গভেদের উপর মোটেই নির্ভরশীল ছিল না। আসলে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে কে নারী কিংবা কে পুরুষ – এ নিয়ে গ্রীসের লোকজন মোটেও চিন্তা করতো না। সম্পর্ক তৈরি হতো পারষ্পরিক আগ্রহ এবং আকর্ষনের ভিত্তিতে। নারী-পুরুষ ছাড়াও অন্যান্য সব প্রেমের সম্পর্ককেই 'স্বর্গীয়' হিসেবে দেখা হতো[180], এবং প্রেমের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের জোর-জবরদস্তিকে হেয় করা হতো। এ প্রসঙ্গে গবেষক ফ্রান্সিস মার্ক মন্ডিমোর তার 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি অব হোমোসেক্সুয়ালিটি' গ্রন্থে[181] উল্লেখ করেন –

> 'প্রাচীন গ্রীসে প্রেমময় সম্পর্ককে উদযাপন শুধু নয়, ক্ষেত্রবিশেষে মহিমান্বিত করা হতো। এই ধরনের সম্পর্ককে দেখা হতো সামাজিক বিন্যাসের গভীরতম প্রক্রিয়া হিসেবে। ... গ্রীক সমাজে যৌনতা এবং প্রজননকে (সন্তানোৎপাদন) এক করে দেখা হতো না। যৌনতা ছিল সমাজের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, আর প্রজননের মাধ্যমে উত্তরাধিকার তৈরি করা হতো বিয়ের মাধ্যমে। কিন্তু বিয়ে ছিল বলেই যৌনতার অন্যান্য

---

[177] শব্দটিকে আধুনিক 'পেডোফেলিয়া' বা নাবালকদের প্রতি যৌন-আকর্ষনের সাথে মিলিয়ে না ফেলাই বাঞ্ছনীয় হবে। এপ্রসঙ্গে বার্ন ফোন তার 'হোমোফোবিয়া' গ্রন্থে বলেন -' *Paiderastia,* which should not be confused with pedophilia, did not involve sexual use of children, a practice that antiquity viewed with as much horror as we do today. When men pursued younger males, those they perused were theoretically ready for the chase - that is they had reached puberty.'

[178] To be noted that marriages in Ancient Greece between men and women were also age structured, with men in their 30s commonly taking wives in their early teens.

[179] Louis Crompton, Homosexuality and Civilization, Belknap Press, 2003.

[180] যেমন, প্লেটো তার বিখ্যাত Symposium গ্রন্থে 'common love' এর বদলে 'heavenly love' ব্যবহার করেছিলেন।

[181] পূর্বোক্ত।

> অভিলাষ বা অপরাপর যৌনতা-কেন্দ্রিক আনন্দ থেকে কেউ, অন্তত পুরুষেরা – নিজেদের বিচ্যুত করতো না। গ্রীক সমাজে যৌনতার সামাজিক স্বীকৃতি জেন্ডার দ্বারা নির্ধারিত হতো না, বরং নির্ধারিত হতো সামাজিক ক্ষমতার ভারসাম্যের নিরিখে ।’

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রাচীন গ্রীসে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারটা লিঙ্গভেদের চেয়ে সামাজিক পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল বেশি। সেখানে ‘আদর্শ সম্পর্ক’ গণ্য করা একজন বয়স্ক পুরুষ এবং কৈশোর উত্তীর্ণ যুবকের মধ্যে। সম্পর্টির মধ্যে বয়স্ক পুরুষটি সক্রিয় (active) এবং যুবকটি অক্রিয় (passive) ভূমিকা পালন করতেন। এ প্রসঙ্গে ডেভিড হাল্পারইন বলেন[182],

> ‘প্রাচীন গ্রীসে যৌনসামগ্রী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে উপস্থিত হতো; নারী কিংবা পুরুষ নয়, বিভক্তিটি ছিল সক্রিয় না অক্রিয় তার উপর ভিত্তি করে’।

এরাস্তেস বা প্রেমিক পুরুষটি সম্পর্কটির মাঝে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। তিনি অনেকটা পথপ্রদর্শক বা দীক্ষাগুরুর আসন নিতেন। তিনি ছিলেন সাহস এবং জ্ঞানের সঞ্চালক। অপরদিকে এরোমেনোস ছিলেন সৌন্দর্য, তারুন্য, শৌর্য এবং বীর্যের প্রতিভূ। তিনি শুধু সম্পর্কে উচ্ছ্বাস এবং উদ্যমেরই যোগান দিতেন না, সেই সাথে সেবা সুশ্রুষা প্রভৃতির দায়িত্ব নিতেন। এরাস্তেস ব্যক্তিজীবনে বিবাহিত থাকতে পারতেন, কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরেও তার একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠতো এরোমেনোসকে ঘিরে। এরোমেনোস হয়ে উঠতেন এরাস্তেসের প্রেমাস্পদ। গবেষক ডেভিড হাল্পারাইন তার 'One Hundred Years of Homosexuality' গ্রন্থে বলেন, 'কৈশোর এবং যৌবনের মাঝামাঝি উত্তাল করা সময়টাই ছিল এরোমেনোস হবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত কাল - অনেকেটা আজকের দিনের কলেজ পাশ করা

---

[182] David Halperin, One Hundred Years of Homosexuality: And Other Essays on Greek Love, Routledge, 1989

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিচ্ছু ছাত্রের বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ের মত'। এরোমেন্তোসের সেই উচ্ছ্বাসময় রক্তিম সময়টা পেরিয়ে গেলে পাইদাস্তেরিয়া সম্পর্কের সমাপ্তি ঘনিয়ে আসতো। এরোমেনোস তখন ইচ্ছে করলে বিয়ে করতে পারতেন, আর পরে বয়স্ক সঙ্গী বা এরাস্তেস হিসেবে নতুন কোনো তরুণের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারতেন।

চিত্রঃ ছয় শতকের একটি মৃৎপাত্রে আঁকা এরাস্তেস বা প্রেমিক এবং এরোমেনোস বা প্রেমাস্পদের প্রতিচ্ছবি।

গ্রীসের এই পাইদেস্তারিয়ার সম্পর্কের আলামত পাওয়া যায় সে সময়কার অসংখ্য চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য এবং মৃৎশিল্পে। 'গ্রীক সমকামিতা'[183] নামের বইয়ে কে. জে.ডোভার

[183] K. J. Dover, Greek Homosexuality, MJF Books, May 1997

বিশ পৃষ্ঠা ধরে বর্ণনা করেছেন পটে আঁকা চিত্রকর্ম আর মৃৎশিল্পে সমকামিতার নানা কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের। তবে পটে আঁকা শিল্পকর্মের সাথে তৎকালীন গ্রীক সমাজের বাস্তবতার মিল সত্যই ছিল কিনা এই বিতর্কে[184] না গিয়েও বলা যায় যে, সমকামিতার বৈধতা সমাজে ছিল প্রবলভাবেই[185]। শুধু পটুয়াদের শিল্পকর্মে নয়, গ্রীক সাহিত্য এবং সংস্কৃতির প্রতিটি শাখাতেই সমকামিতার ব্যাপক উল্লেখ ছিল। সমকামিতার উল্লেখ আছে 'গ্রীক অ্যান্থোলজী'তে[186] এবং গ্রীক থিয়েটারগুলোতে। ইউরিপিডিসের[187] স্যাটায়ার নাটিকা 'সাইক্লোপস'-এ বর্ণিত সাইক্লোপস চরিত্রটি খুব পরিষ্কারভাবেই বলে – 'আমার কাছে মেয়ের চেয়ে ছেলেই বেশি পছন্দের'[188]।

সমকামিতার বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায় ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে হোমারের রচিত ইলিয়াডে। বিখ্যাত যোদ্ধা আকিলিস এবং পেট্রোক্লুসের মধ্যকার বন্ধুত্বকে বহু গবেষকই 'পাইদেরাস্তিক' বলে অভিমত দিয়েছেন[189]। আকিলিস আর পেট্রোক্লুস ছিলেন সম্পর্কে কাজিন, কিন্তু এদের মধ্যকার আবেগময় সম্পর্ক সম্বন্ধে হোমার সরাসরি কিছু না লিখলেও তার লেখা থেকে ইঙ্গিত অনুধাবন করা মোটেই কষ্টকর নয়। পরবর্তীতে Aeschines[190]-এর লেখা থেকে এর প্রমাণ মেলে –

---

[184] John Boswell, Same-Sex Unions in Premodern Europe, Vintage (May 30, 1995)

[185] Byrne Fone, Homophobia, পূর্বোক্ত।

[186] The Greek Anthology (also called Anthologia Graeca or, sometimes, the Palatine Anthology) is a collection of poems, mostly epigrams, that span the classical and Byzantine periods of Greek literature.

[187] Euripides (480 BCE–406 BCE) was the last of the three great tragedians of classical Athens (the other two being Aeschylus and Sophocles).

[188] "I prefer boys to girls" – Euripides, The Cyclopes, quoted in David F. Greenberg, The construction of Homosexuality, Chicago: University of Chicago press, 1948

[189] Louis Crompton, Homosexuality and Civilization, পূর্বোক্ত।

[190] Aeschines (389–314 BC) was a Greek statesman and one of the ten Attic orators.

> “[হোমার] বহু জায়গায় পেট্রোক্লুস এবং আকিলিসের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করলেও তিনি সম্ভবতঃ ইচ্ছে করেই তাদের মধ্যকার অন্তরঙ্গ অনুরাগ গোপন করেছেন। সম্পর্কটিকে তিনি স্রেফ ‘বন্ধুত্ব’ হিসবেই চিত্রিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন; ভেবেছেন যে, সম্পর্কের ব্যপ্তি কেবল অভিজ্ঞ চোখেই ধরা পড়বে ।”

যত অপ্রত্যক্ষভাবেই লেখা হোক না কেন, সমকামিতার উল্লেখ করা এটিই পৃথিবীর সম্ভবতঃ প্রথম সাহিত্যকর্ম। কিন্তু এই সমকামিতাকে গ্রীসের চিরায়ত এরাস্তেস – এরোমেন্তোসের ছাঁচে ফেলতে গেলে আমাদের একটু সমস্যাই হবে। তবে সমস্যাটা আমাদের বলা হলেও, সমস্যার মূল হোতা হোমার নিজেই। তার বর্ণনা থেকে জানা যায়, আকিলিস-পেট্রোক্লুসের সম্পর্কটিতে আকিলিসেরই প্রভাব ছিল বেশি। সম্পর্কটির মূল নিয়ন্ত্রক ছিলেন তিনি। আকিলিসের যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি তো ছিলই, সেই সাথে তিনি ছিলেন খ্যাতিমান মল্লবিদ। আকিলিস যখন বাইরে যুদ্ধ এবং ক্রীড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তখন গৃহস্থালির আনুষঙ্গিক কাজগুলো সেরে ফেলতেন পেট্রোক্লুস। তাদের এই পারম্পরিক শ্রমবিভাজন দেখে মনে হতে পারে 'সংসারের কর্তা' আকিলিসই ছিলেন এরাস্তেস আর 'সুগৃহিনী' পেট্রোক্লুস ছিলেন এরোমেনোস। কিন্তু গোল বাঁধিয়ে দিল হোমারীয় সাহিত্য-রহস্য। হোমার তার লেখায় পেট্রোক্লুসকেই বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে চিত্রিত করেছেন, আর আকিলিসকে দেখিয়েছেন পেট্রুক্লুসের তরুন সাথী হিসেবে (এবং রক্তের সম্পর্ক হিসেবে মামাতো ভাই)। আমরা আগেই জেনেছি যে, গ্রীক সংস্কৃতিতে বয়স্ক ব্যক্তিই হতেন এরাস্তেস এবং অপেক্ষাকৃত তরুণ সাথীটি হতেন এরোমেনোস, অনেকটা নীচের ছবির মতো। বয়স এবং সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করলে পেট্রোক্লুসেরই এরাস্তেস হবার কথা।

চিত্রঃ যুদ্ধের পর আকিলিস পেট্রোক্লুসের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিচ্ছেন। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন আকিলিস পেট্রোক্লুসের মধ্যকার সম্পর্কটি ছিল সাধারণ বন্ধুত্বের বাইরেও অনেক বেশি কিছু।

আকিলিস এবং পেট্রোক্লুসকে ঘিরে এরাস্তেস – এরোমেনোস কেন্দ্রিক যত রহস্যই আমরা আজকে তৈরি করি না কেন, হোমার নিজে তেমন কিছু পরিষ্কার করে লেখেননি বলেই মনে হয়। তবে হোমার সরাসরি কিছু না লিখলেও আকিলিস এবং পেট্রোক্লুসের মধ্যকার সম্পর্কের মানসিক আবেগ কারো কাছে অব্যক্ত থাকেনি। তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল গভীর, সজীব এবং আবেগঘন। তারুন্যের উদ্দামতা এবং মজ্জাগত উদ্ধত স্বভাব আকিলিসের মধ্যে প্রবলভাবেই প্রকটিত থাকলেও পেট্রোক্লুসের প্রতি তিনি বরাবরই ছিলেন অস্বাভাবিক রকমের নম্র এবং বিনীত। পেট্রোক্লুস আকিলসের বর্ম পরিহিত অবস্থায় একটি যুদ্ধে নিহত হলে, আকিলিস অত্যন্ত বিমর্ষ এবং সেই সাথে ক্রুদ্ধ হন আর পেট্রোক্লুসের হত্যাকারী হেক্টরকে খুঁজে বের করে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করেন। এই ট্রয়ের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে ২০০৪

সালে হলিউডে উলফগ্যাং পিটারসনের পরিচালনায় একটি ছবি নির্মিত হয়েছে 'ট্রয়' নামে। ছবিটিতে আকিলিসের চরিত্রে অভিনয় করেন ব্র্যাড পিট, পেট্রোক্লুসের চরিত্রে গ্যারেট হেডলান্ড এবং হেক্টরের ভূমিকায় ছিলেন এরিক বানা। যদিও পেট্রোক্লুসকে ছবিতে কেবল আকিলিসের 'কাজিন' হিসেবেই চিত্রিত করা হয়, তাকে দেখানো হয় আকিলিসের চেয়ে বয়সে ছোট হিসেবে, এবং তাদের মধ্যকার সমপ্রেম উহ্য রাখা হয় পুরোপুরি। আকিলিস এবং পেট্রোক্লুসের সম্পর্ক ছাড়াও প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে উল্লিখিত আছে অন্যান্য সমপ্রেমী দম্পতির কথা – হার্মোডিয়াস এবং এরিস্টোগিটন, অরেস্টেস এবং পাইলেডস কিংবা ডেমন এবং পাইথিয়াস – যারা সমপ্রেমী সাথীর জন্য জীবন দিতেও কার্পণ্য করতেন না।

সমকামিতার বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায় প্লেটোর দার্শনিক গ্রন্থ সিম্পোজিয়ামে (Symposium)। আনুমানিক ৩৮৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে লেখা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে প্রকৃতি, রাজনীতি, সমাজ এবং মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের বিচিত্র অভিব্যক্তি। মানুষে মানুষে প্রেমময় সম্পর্কের বিবিধ প্রকাশ ঘটেছে ফায়াডেরাস (Phaedrus), পসানিয়াস (Pausanias), এগাথন (Agathon), অ্যারিস্টোফেনেস (Aristophanes), এরিক্সিমা- চুসের (Eryximachus) নানা বক্তব্যে। সৃষ্টি রহস্য নিয়ে অ্যারিস্টোফেনেসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, মানুষের প্রকৃতি প্রথম থেকেই ছিল তিন ধরনের – নারী পুরুষ এবং তৃতীয় প্রকৃতি বা এন্ড্রোজাইনোস[191]। এই তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যরা সমকামিতায় আসক্ত হয় বলে অ্যারিস্টোফেনেস মনে করেছেন। তার বর্ণিত উপকথা অনুযায়ী, সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই নারী, পুরুষ এবং তৃতীয় প্রকৃতি নামক সত্ত্বার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সেই সত্ত্বাগুলো আমাদের মতো দেখতে ছিল না। এদের সকলেরই ছিল চারটা করে হাত, চারটা পা এবং দুই সেট করে যৌনাঙ্গ। এই অদ্ভুতুরে অসুরকূল স্বর্গের দেব-দেবীদের আক্রমণ করা শুরু করে দিলে দেবতা জিউস তাদের ক্ষমতাকে দুর্বল করার লক্ষ্যে

[191] Greek word Androgynous consists of two words - ανήρ (anér, meaning man) and γυνή (gyné, meaning woman), thus refers to the concepts about the third gender that has a mixing of masculine and feminine characteristics.

অনেকটা 'সিদ্ধ ডিমকে একটি সরু চুল দিয়ে যেমন বিভক্ত করে দেয়া যায়' ঠিক তেমনি ভাবে ফালি করে তাদের দুই ভাগে বিভক্ত করে দেন। যে ভাগে শুধুই পুরুষের আদি উপাদান ছিল, তারা পরিণত হলেন পরিপূর্ণ পুরুষে, তারা যুবক বয়সে প্রেমাসক্ত হতেন কেবলই মেয়েদের প্রতি। আর যে ভাগে ছিল কেবলই স্ত্রী উপাদান – তারা পরবর্তীতে হলেন নারী। এরা পরিণত বয়সে পুরুষের প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। আর তৃতীয় সত্ত্বার মধ্যে থাকে নারী-পুরুষের মিশ্রণ। ফলে তাদের কেউ সমধর্মী, কেউবা বিপরীতধর্মী লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হন আদি উপাদানগুলোর ভিন্নতার রকমফেরে। এই তৃতীয় প্রকৃতিদের নিয়ে এরিস্টোফেন বলেন [192]–

> "তারা যখন পরিণত পুরুষ হয়ে উঠে, তারা অন্য যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনেক সময় তাদের বিবাহ এবং সন্তানোৎপাদনের কাজে জড়িত করার জন্য জোর করতে হয়। তারা প্রকৃতিগতভাবেই নিজধর্মী মানুষের প্রতি আজীবন আকর্ষণ বোধ করে থাকে"।

সিম্পোজিয়ামে আমরা গ্রীসের বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসেরও উল্লেখ পাই। এক ভোজন সভায় আলকিবিয়াডস নামের এক সুদর্শন তরুণ মদ্যপান করে কীভাবে সক্রেটিসের প্রতি প্রেম নিবেদন করেছিল তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। আলকিবিয়াডসের সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল চারিদিকে, আর অন্যদিকে সক্রেটিসের চেহারায় আর যাই থাকুক সৌন্দর্য বলে কিছু ছিল না, কিন্তু সক্রেটিস পরিচিত ছিলেন তার অতুলনীয় জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার জন্য ঢের বেশি। আলকিবিয়াডস ভোজন শেষে তাকে নিরালায় নিয়ে যেতে চাইলে সক্রেটিস তাতে ভ্রুক্ষেপ করেননি। একসময় সক্রেটিস ঘুমিয়ে পড়লে আলকিবিয়াডস তাকে জাগিয়ে বলেন, 'আমার জীবনে যত প্রেমিক এসেছিল, তার মধ্যে তুমিই একমাত্র পূর্ণগুণ সম্পন্ন'। যদিও সক্রেটিসের কিশোর প্রেমের প্রতি আকর্ষণ এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা দুইই ছিল, কিন্তু তিনি আলকিবিয়াডসের প্রস্তাবে কোনো সাড়া দেননি। সক্রেটিসের এই 'সংযম'

---

[192] Plato, The Symposium, Christopher Gill trans., Penguin Classics, 2003.

সভাসদদের মাঝে দারুণভাবে প্রশংসিত হয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আলকিবিয়াডস পরবর্তীতে এক দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদে পরিণত হন এবং তাকে প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে শহর থেকে বের করে দেয়া হয়। বহু গবেষক[193] মনে করেন, সেই রাতে আলকিবিয়াডস যদি সক্রেটিসের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হতেন, তার ভালোবাসা এবং প্রজ্ঞা হয়ত দুর্বিনীত আলকিবিয়াডসের ব্যক্তিগত ইতিহাসের চাকাকে অন্যদিকে ঘোরাতে পারতো।

গ্রীক সংস্কৃতিতে জিমনেশিয়াম বা শরীরচর্চাকেন্দ্র ছিল সমকামীদের সমাকামিতা পরিস্ফুটনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান। গ্রীক ভাষায় জিমনেশিয়াম এসেছে গ্রীক শব্দ জিমনোস্ থেকে – যার আভিধানিক অর্থ হলো – নগ্নতা[194]। এমনিতেই নগ্নতার একটি গ্রহণযোগ্যতা সব সময়ই গ্রীক সমাজে ছিল। নগ্ন গ্রীক বীরদের মল্লযুদ্ধের চিত্রায়ণ বহু মৃৎপাত্রে ক্ষুদিত আমরা আজও দেখতে পাই। আর জিমনেশিয়ামগুলো ছিল সে সমস্ত মল্লবিদদের প্রিয় আস্তানা - তারা নগ্ন হয়ে এ সমস্ত জিমনেশিয়ামে শরীরচর্চা করতেন। তবে এই জিমনেশিয়ামে সে সময় কেবল শারীরিক কসরৎই প্রদর্শিত হতো না, সেই সাথে এটি হয়ে উঠেছিল মানুষে মানুষে সামাজিক আলোচনা এবং দর্শনেরও তীর্থস্থান। বহু বাঞ্ছিত প্রেমিক জিমনেশিয়ামে যেত সেখান থেকে তার বাঞ্ছিতাকে খুঁজে নিতে।

গ্রীক সংস্কৃতিতে যদিও কিশোর এবং নারীদের দেখা হতো যৌনতা উভভোগের প্রতীক হিসেবে, কিন্তু তারপরেও ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে বহু ব্যক্তি কেবল পুরুষের প্রতি প্রণয়াসক্ত থেকেছেন। তাদের কাছে 'যৌনতা উপভোগ' এবং 'যৌনতার দায়িত্ব' ছিল আলাদা। 'যৌনতার দায়িত্ব' পালন করতে তারা হয়ত একসময় বিয়ে

---

[193] Simon Goldhill, Love, Sex & Tragedy: How the Ancient World Shapes Our Lives, University Of Chicago Press 2005

[194] Louis Crompton, Homosexuality and Civilization, পূর্বোক্ত।

করতেন, কিন্তু যৌনতা উপভোগের জন্য তারা অনেকসময়ই দারস্থ হতেন তার পছন্দের পুরুষ সঙ্গীর কাছে। গ্রীক ইতিহাস থেকে দেখা যায় বিয়ন এবং জেনোর মতো দার্শনিক কিংবা আলেকজান্ডার দি গ্রেটের মতো সম্রাট সমপ্রেমে আসক্ত ছিলেন[195]। আকিলিসের যেমন ছিল পেট্রোক্লুস, ঠিক তেমনি আলেকজান্ডারের প্রেমাস্পদ ছিলেন তার প্রিয় যোদ্ধা হেফায়েশন (Hephaestion)। গ্রীক সভ্যতায় খুঁজলে পাওয়া যাবে বহু সমপ্রেমিক দম্পতির অস্তিত্বও। এর মধ্যে সাহিত্যিক ইউরিপিডেস এবং ট্র্যাজিক কবি এগাথনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা যায়।

স্যাপোর কথা

গ্রীক সভ্যতার সমকামিতার উল্লেখ করলে স্যাপোর কথা আমাদের আলাদা ভাবে উল্লেখ করতেই হবে। কারণ গ্রীক সভ্যতার পাইদেরাস্তিয়া আর এরাস্তেস-এরোমেনোস সহ যে সমকামিতার উদাহরণগুলো আমরা এই অধ্যায়ে দেখেছি তা সবই পুরুষ সমকামিতা নির্ভর। স্যাপো ছিলেন এই ছাঁচের একেবারেই বাইরে। তিনি খ্রীস্টপূর্ব ছয় শতকের গ্রীসের লেসবো দ্বীপের উল্লেখযোগ্য বাসিন্দা, আর পেশায় ছিলেন শিক্ষিকা। তার কবিতা প্লেটোর মতো দার্শনিককে অনুপ্রাণিত করেছিল, প্লেটো তাকে অভিহিত করেছিলেন 'দশম মুসেস'[196] হিসেবে। তবে সেপো সম্বন্ধে ঐতিহাসিকভাবে খুব কমই আমরা জানতে পেরেছি। অধিকাংশ তথ্যই এসেছে তৃতীয় সূত্র, কিংবা কখনো অগ্রন্থিত পরস্পরবিরোধী তথ্য থেকে। তবে তারপরেও যেটুকু তথ্য আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, তা হলো – স্যাপো গান আর কবিতা লিখতেন ফুলের সৌন্দর্য, স্বর্ণ, সূর্যালোক, মন্দিরের বাগান আর সর্বোপরি নারীর সৌন্দর্য নিয়ে। তার একটি কবিতা এরকম[197] –

---

[195] David F. Greenberg, The Construction of Homosexuality, University Of Chicago Press, 1990

[196] মুসেস -গ্রীক উপকথা অনুযায়ী কবিতা এবং সাহিত্যের প্রেরণা ছিলো গ্রীক দেবীরা, যাদের সংখ্যা ছিলো নয়টি।

[197] Ellen Greene, Reading Sappho: Contemporary Approaches (Classics and Contemporary Thought), University of California Press; August 1999

He seems as fortunate as the gods to me,
The man who sits opposite you
And listens nearby to your sweet voice and lovely laughter.
Truly that sets my heart trembling in my breast.
For when I look at you for a moment,
Then it is no longer possible for me to speak:
My tongue has snapped,
At once a subtle fire has stolen beneath my flesh,
I see nothing with my eyes, my ears hum, sweat pours from me,
A trembling seizes me all over,
I am greener than grass,
and it seems to me that I am little short of dying.

প্রেমিক সেপোর প্রিয় গ্রীক দেবী যে আফ্রোদিতি হবেন – এতে আর আশ্চর্য কি ! স্যাপো অঢেল কবিতা লিখেছেন আফ্রোদিতিকে উৎসর্গ করে; একটি নমুনা এরকম –

Thorned in bright colors, deathless Aphrodite,
Zeus' most subtle daughter, now I pray you,
Do not violate my soul with sorrow,
And pain, O Goddess!

তারপরেও আজকে- একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে স্যাপোর বহুকিছু নিয়েই বিতর্ক সৃষ্টি করা যাবে। কারণ তার জীবনের কোনো কিছুই নিশ্চিত করে আজ আর বলা সম্ভব নয়। তবু, স্যাপোর জীবন এবং কর্ম থেকে অন্তত একটি জিনিস স্পষ্ট হয় যে, সে সময় গ্রীসের নারী-পুরুষেরা খোলামেলা ভাবেই তাদের ভালোলাগাগুলোর প্রকাশ ঘটাতে পারতেন। স্যাপো নিজে হয়ত সমকামী ছিলেন না (আগেই বলা হয়েছে যে, আধুনিক কায়দায় কে সমকামী আর কে বিষমকামী -এ ধরনের লেভেল আরোপ

তৎকালীন গ্রীক সমাজে প্রচলিত ছিল না), কিন্তু নারীদের নিয়ে প্রেমময় কাব্য তিনি রচনা করেছিলেন স্বতস্ফুর্ত ভাবেই[198]।

রোমান সভ্যতায় সমকামিতা

রোমান সভ্যতা ছিল গ্রীক সভ্যতারই ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ। ফলে গ্রীসের সমকামিতার ঐতিহ্য রোমানেরা আত্মীকরণ করে নেয় তাদের সংস্কৃতির অংশ হিসেবেই। মূলত খ্রিষ্টধর্মের উত্থানের আগপর্যন্ত সমকামিতার প্রতি কোনো বিদ্বেষমূলক মনোভাব রোমান সমাজে গড়ে উঠেনি। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত আছে সমকামিতাকে প্রশ্রয় দেয়ার অযুহাতে ঈশ্বর কীভাবে সডোম নগরী ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। বাইবেলকে পুঁজি করে সমকামিতার উপর বিদ্বেষ সৃষ্টি করার চেষ্টা হয় কনস্টানটিনের হাত দিয়ে রোমে খ্রিষ্টধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হবার পর থেকে। তার আগ পর্যন্ত রোমান সমাজে সমপ্রেমের বৈধতা ছিল অনেকটা গ্রীক সমাজের আদলেই। তবে সংস্কৃতির নিরিখে গ্রীক সভ্যতার সাথে রোমান সভ্যতার সাথে শুরু থেকে কিছুটা পার্থক্য ছিলই। গ্রীক সভ্যতায় আমরা দেখেছি সমপ্রেম সাধারণত আবর্তিত হতো প্রেমিক-প্রেমাস্পদ (*erastes- eromenos*) সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে, একজন প্রৌঢ় এবং তরুণের মধ্যে। অন্যদিকে রোমান সভ্যতায় এ ধরনের কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিল না। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সমকামিতার সবধরনের সম্পর্ককেরই গ্রহণযোগ্যতা ছিল সমাজে[199]। তবে এই নিয়মের বাইরেও সামাজিক অবস্থানগত দিক দিয়ে সমকামিতার একটা আলাদা প্রেক্ষাপট ছিল। এটিকে রোমান সমাজে অনেকসময়ই দেখা হতো সামাজিক ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। সমকামিতাকেন্দ্রিক এক ধরনের সম্পর্ক প্রচলিত ছিল মনিব-ভৃত্যে কিংবা ক্রীতদাসের মাঝেও। খ্রিষ্টপূর্বাব্দ দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে রোমান সাম্রাজ্যে

---

[198] এ প্রসঙ্গে Dolores Klaich তার Woman Plus Woman গ্রন্থে বলেন, 'Sappho was a poet who loved women. She was not probably a lesbian who wrote poetry'

[199] Louis Crompton, Homosexuality and Civilization, Belknap Press of Harvard University Press, 2006.

ক্রীতদাসের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এমনকি কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে জনসংখ্যার শতকরা চল্লিশভাগই ছিল কৃতদাস। এদের একটা বড় অংশকেই স্ব স্ব মনিবদের তৃপ্তি দেয়ার জন্য নিয়োগ দেয়া হতো। সে সময় একজন সুদর্শন ক্রীতদাসের চাহিদা এতোটাই বেশি ছিল যে, কারো কারো মূল্যমান আবাদি জমিকেও ছাড়িয়ে যেত। সে সময়কার রোমান শাসকেরা রীতিমত সমকামিতাকে উদযাপন করতেন। বিথ্যানিয়ার (Bithynia) তরুণ রাজা নিকোমেডসের প্রতি সম্রাট জুলিয়াস সিজারের অনুরাগ নিয়ে তার সৈন্যরা পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা করতো এই বলে – 'Caesar may have conquered the Gauls, but Nicomedes conquered Caesar'[200]। সিজার ছাড়াও হাড্রিয়ান, কমোডাস, এলাগাবালাস, ফিলিপ দ্য এরাবিয়ান সহ অনেক সম্রাটেরই সমকামের প্রতি আসক্তি ছিল। এডওয়ার্ড গিবন তার 'দ্য হিস্ট্রি অব দা ডিক্লাইন এন্ড ফল অফ দ্য রোমান এম্পায়ার' গ্রন্থে বলেন[201], 'প্রথম পনেরজন সম্রাটের মধ্যে ক্লডিয়াস ছাড়া অন্য সকলেরই সমকামের প্রতি আসক্তি ছিল'। সমকামের আসক্তি ছিল বহু রাজনীতিবিদদের মধ্যেও। তার মধ্যে সিসেরো, মার্ক এন্টোনি, অক্টাভিয়াস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। মনোবিজ্ঞানী এবং যৌন-ইতিহাসবিদ নরমান সাসম্যান রোমান সাম্রাজ্যে সমকামিতার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন –

> 'গ্রীক সভ্যতায় যেমন স্বতস্ফুর্তভাবে সমকামিতাকে মহিমান্বিত করা হতো, তার সাথে তুলনা করে বলা যায়, রোমানেরা একে যৌন-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই মেনে নিয়েছিলেন। বহু গণমান্য রোমানেরাই প্রকৃত সমকামী না হলেও উভকামী যে ছিলেন তা নিশ্চিত। জুলিয়াস সীজারকে তো বলাই হতো তিনি প্রতিটি নারীর পুরুষ এবং প্রতিটি পুরুষের নারী'।

---

200 Suetonius, Tr. J. C. Rolfe. 2 vols. Cambridge: Harvard University press, 1913-1933.

201 Edward Gibbon. History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Vol. 1, London. 1898, p. 313.

রাজনীতিবিদ ছাড়াও রোমান কবি সাহিত্যিকদের রচনায় ব্যাপক হারে সমকামিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমান সাহিত্যে সমকামিতার প্রথমিক উল্লেখ পাওয়া যায় ৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রচিত ভ্যালেরিয়াস ম্যাক্সিমাসের 'মেমোরেবল ফ্যাক্টস এন্ড সেয়িং' নামের একটি পুস্তিকায়। পরবর্তীকালে সমকামিতার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে খ্রিষ্টপূর্বাব্দ প্রথম শতকে ভার্গিলের লেখা কাব্যগ্রন্থ এনেনেইড (Aeneid)-এ। এ ছাড়া সমকামী সাহিত্যের সন্ধান মিলবে মেলিগার এবং ক্যালিমেচাস, ক্যাটাল্লাস এবং তাইবুল্লাস, থিওক্রিটাস এবং কোরিডন এবং হোরেস প্রমুখের রচনায়। ক্যাটাল্লাসের একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ এরকম -

If I should be allowed to go so far as kissing
Your sweet eyes, Juventius,
I would go on kissing them three hundred thousand times;
Nor would it ever seem I had enough,
Nor if I harvested
Kisses as numerous as the ears of standing corn

পুরুষ সমকামিতার পাশাপাশি এ সময় রোমান সাহিত্যে নারী সমকামিতারও সন্ধান মেলে, যদিও পরিমাণগত দিক থেকে এটি নগন্যই বলা চলে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইফিস, আয়ান্থির গল্প, ফেডারাসের রচনা প্রভৃতিতে।

৩১২ সালে সম্রাট কন্সটানটিন ম্যাক্সেন্টিয়াসের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে খ্রিষ্টধর্মগ্রহণ করলে, রোমে খ্রিষ্টধর্ম রাজনৈতিক ভিত্তি লাভ করে। এই সময়টা খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। খ্রিষ্টধর্মের প্রথম শাসক হিসেবে রোমান চার্চকে প্রভুত ক্ষমতা প্রদান করেন কন্সটানটিন। পূর্ববর্তী সমস্ত প্যাগান রীতি নীতি রাষ্ট্রে নিষিদ্ধ করা হয়। শেষ প্যাগান সম্রাট জুলিয়ান ৩৬৭ সালে মারা গেলে প্যাগানদের প্রভাব একেবারেই কমে আসে। সমকামিতার প্রতি উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও ধীরে ধীরে সমাজে লোপ পেতে শুরু করে এসময় থেকেই।

মধ্যযুগ এবং রেনেসাঁর সময় সমকামিতা

কন্সটানটিন মারা যান ৩৩৭ সালে। কন্সটানটিনের মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরী তিন ছেলে পরবর্তীতে রোমান শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। কন্সটান্টিয়াস এবং কন্সটান্স ৩৪২ সালে সমপ্রেম এবং সমলিঙ্গের বিয়েকে অবৈধ ঘোষণা করেন[202]। একই ধারাবাহিকতায় ৩৯০ সালে খ্রিষ্টান সম্রাট ভ্যালেন্টিনিয়ান ২, থিওডোসিয়াস ১ এবং আর্কাডিয়াস সমকামকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং সমকামের শাস্তি হিসেবে অপরাধীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার বিধান চালু করেন[203]। খ্রিষ্টান সম্রাট জাস্টিনিয়ান ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর জন্য সমকামিতাকে দায়ী করেন[204] এবং শুধু তাই নয় সমকামিতার শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড তা ৫৩৩ সালে পরিষ্কার করে দেন এই বলে –

> The Lex Julia ... punishes with death not only those who violate the marriages of others, but those who dare to commit acts of vile lust with other man

রোমান সাম্রাজ্য পরবর্তী খ্রিষ্টান সভ্যতা এবং মধ্যযুগের ইতিহাস মূলত সমকামীদের উপর নিপীড়ন এবং নির্যাতনের ইতিহাস। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বহু খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিকদের সমকামিতার অযুহাতে এ সময় পুড়িয়ে মারা হয়। এই পীড়ন অব্যাহতো ছিল রেঁনেসার সময়ও প্রবল প্রতাপের সাথেই। ফ্লোরেন্সে প্লেগের কারণে জনসংখ্যা ১২৫০০০ থেকে কমে ৪০০০০০-এ নেমে আসে ১৩৪৮ সাল থেকে ১৪২৭ সালের মধ্যে। ধর্মবাদীরা এর পেছনে সমকামিতাকে দায়ী করে;

---

[202] Theodosian Code 9.8.3: "When a man marries and is about to offer himself to men in womanly fashion (quum vir nubit in feminam viris porrecturam), what does he wish, when sex has lost all its significance; when the crime is one which it is not profitable to know; when Venus is changed to another form; when love is sought and not found? We order the statutes to arise, the laws to be armed with an avenging sword, that those infamous persons who are now, or who hereafter may be, guilty may be subjected to exquisite punishment.

[203] (Theodosian Code 9.7.6): All persons who have the shameful custom of condemning a man's body, acting the part of a woman's to the sufferance of alien sex (for they appear not to be different from women), shall expiate a crime of this kind in avenging flames in the sight of the people.

[204] Justinian Novels 77, 144

তারা প্রচার করে সমকামিতার কারণে সডোম এবং গোমরাহ্‌র উপর যেমন ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে এসেছিল (বাইবেলে বর্ণিত উপকথা অনুযায়ী), ঠিক একই ভাবে তারা দাবি করে প্লেগের পেছনেও আছে একই কারণে ঈশ্বরের অভিশাপ। ইতালিতে এ সময় সমকামিতা ধরার জন্য বিশেষ ধরনের আদালতের ব্যবস্থা করা হয়, যাদের নৈশ প্রহরী (Officers of the Night) হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এদের কাজই ছিল শহরে সমকামী খুঁজে বের করা। শহরের বিভিন্ন জায়গায় সবার জন্য কাঠের খোলা বাক্স (tamburos) রেখে দেয়া হতো, আর নাগরিকেরা সন্দেহভাজন কারো নাম পেলেই এই বাক্সে এসে জমা দিয়ে যেতেন। এ সমস্ত অজ্ঞাত অভিযোগ, অনুযোগের ভিত্তিতে এই নৈশ প্রহরীর দল অনুসন্ধান চালাতেন। অনেকটা আজকের দিনের বাংলাদেশের র‍্যাব বাহিনীর আদলে তৈরি ইতালির এই স্পেশাল ব্রাঞ্চ-এর কার্যক্রম ১৪৩২ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৫০২ সাল পর্যন্ত চলে, এবং এই সময়ের মধ্যে প্রায় সতের হাজার মানুষকে সন্দেহের তালিকায় আনা হয়। প্রথম সমকামীর বিচার করে হত্যা করার নথিবদ্ধ দলিল আমরা পাই ১৭৪২ সালে ভেনিসে এবং এর পরের ছয় বছরে অন্তত তেরটি সমকামিতার মামলা পরিচালনা সেই একই শহরে করা হয়। রোলান্দিনো রঞ্চাইয়া (Rolandino Ronchaia) নামের এক ব্যক্তিকে সমকামিতার অভিযোগে ১৩৫৪ সালে পুড়িয়ে মারা হয়। একই রকম ভাগ্য বরণ করে নিতে হয় গিওভান্নি দি গিওভান্নির (Giovanni di Giovanni) ১৩৬৫ সালের দিকে। কিন্তু তার ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতার মাত্রা ছিল আরো অনেক বেশি। তাকে গাধার পিঠে করে সারা শহর ঘোরান হয়, তারপর তার লিঙ্গচ্ছেদন করে খোঁজা করে দেয়া হয়। শুধু তাই না, তারপর লোহিত তপ্ত লৌহ-শলাকা তার পশ্চাত দেশ দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এহেন শাস্তির ব্যাপারে যুক্তি দেয়া হয়েছিল যে, তাদের দেহের এই প্রত্যঙ্গটি 'সমকামিতায় ব্যবহৃত' হয়েছিল। (Dominique Phinot)।

১৪৯৪ সালে ডোমিসিয়ান পাদ্রী গিরোলামো স্যাভোনারোলার (Girolamo Savonarola) রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে সমকামিতার উপর নিবর্তন আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি

পেতে থাকে। ১৪৯৫ থেকে ১৪৯৭ সালের মধ্যে ইতালিতে ৭৩১ জনকে 'সডোমী আইনে' অভিযুক্ত হতে হয়। এদের অধিকাংশকেই প্রহসনমূলক বিচারের সম্মুখীন করে হত্যা করা হয়। সমকামিতামূলক সম্পর্ক থাকার কারণে বিচারের প্রহসনে হত্যা করা হয় ওয়াটারফোর্ড এবং লিসমোরের বিশপ জন এথেরণকে (John Atherton) ১৬৪০ সালে, শিরোচ্ছেদ করা হয় ইতালির মানবতাবাদী ইতিহাসবিদ জ্যাকোপো বোনফাডিও (Jacopo Bonfadio)কে। হত্যা করা হয় ওয়াল্টার হাঙ্গারফোর্ডকে, সুইডিশ রূপান্তরকামী লিসবেথা ওলসডটারকে (Lisbetha Olsdotter) এবং ১৫৫৬ সালে ফরাসী কম্পোজার ডমিনিক ফিনোটকে।

ডেভিড, মাইকেল এঞ্জেলো

সনাতন ডেভিড
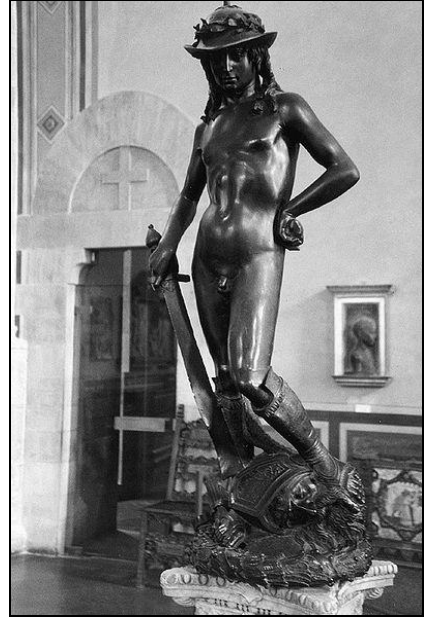
ডেভিড, দোনাতেল্লো

কিন্তু পাশাপাশি ইতালির সমাজে ধর্মীয় প্রথা এবং সংস্কারের বিপরীতে একধরনের নবজাগরণের সূচনাও পরিলক্ষিত হতে থাকে। এই নব জাগরণের নেতৃত্ব দেন দোনাতেল্লো, বত্তিচেল্লী, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেলেঞ্জেলোর মতো শিল্পীরা, আর সেই সাথে কোপার্নিকাস, গ্যালেলিও, কেপলারের মতো বিজ্ঞানীরা আর ফ্রান্সিস বেকন এবং জিওর্দানো ব্রুনোর মতো তুখোর দার্শনিকেরা। এ সময় খ্রীষ্টিয় গোঁড়ামীকে উপেক্ষা করে শিল্প সাহিত্য এবং ভাস্কর্যে হারিয়ে যাওয়া প্যাগান বিভিন্ন রীতিকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। বিজ্ঞানেও এই সময়ই সূচিত হয় কোপার্নিকাসীয় বিপ্লব, যা দর্শনেও যোগ করে নতুন মাত্রা। প্রকৃতি এবং মহাবিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের ধারণাগুলো যায় বদলে। এমনকি ধর্মীয় চরিত্রগুলোরও ভিন্নধর্মী রূপ দেয়া শুরু হয় এ সময় থেকেই। যেমন, সনাতন ভাবে বাইবেল বর্ণিত পয়গম্বর ডেভিড বা দাউদকে সলটারি হাতে দাঁড়ি গোফওয়ালা প্রৌঢ় হিসবেই চিত্রিত করা হতো। কিন্তু এই প্রথা ভেঙ্গে রেঁনেসার শিল্পীরা

আবিস্কার করলেন ডেভিডের অন্য আরেক রূপ। যেমন, স্থপতি দোনাতেল্লো ডেভিডকে মেষপালকের টুপি পরিহিত নগ্নদেহী যুবক হিসেবে চিত্রিত করে একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি নির্মাণ করেন ১৪৪০ সালে। সে সময় অনেক দিক থেকেই এই মূর্তিটি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। প্রথমতঃ এটিই রেনেসাঁর ইতিহাসে পুরুষের নগ্নদেহের প্রথম শিল্পকর্ম। শুধু তাই নয়, ডেভিডের বুট জুতো থেকে দীর্ঘ পালক বেড়িয়ে যেভাবে মূর্তির পদযুগল প্রদক্ষিণ করেছে, ঐতিহাসিকদের মতে সেটি সে সময়কার সমকামিতার সাক্ষর বহন করে[205]। নিঃসন্দেহে এ ধরনের মূর্তি তৈরি দোনাতেল্লোর জন্য যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কারণ রেনেসাঁর যে সময়ে এই মূর্তিটি নির্মাণ করা হয়েছিল তখন খোদ ফ্লোরেন্সেই প্রায় চৌদ্দ হাজার লোককে সমকামিতার আইনে বিচারের সম্মুখীন করা হয়[206]। পরবর্তীতে ১৫০৪ সালের দিকে রেনেসাঁর আরেক দিকপাল মাইকেলএঞ্জেলোও মার্বেল পাথরে ডেভিডের নগ্নদেহের আরেকটি ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। প্রায় ১৭ ফুট লম্বা সুঠামদেহী ডেভিডের অপূর্ব এই প্রতিমূর্তিটিও যথেষ্ট সমকামিতার যৌন উদ্রেগকারী (homoerotic), এবং রেনেসাঁর সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচিত। শিল্পকর্মগুলোর পাশাপাশি দোনাতেল্লো, বত্তিচেল্লী, লিওনার্দো এবং মাইকেলেঞ্জেলোর জীবনী থেকেও পরিষ্কার আলামত পাওয়া গেছে যে, তারা ব্যক্তি জীবনেও সমকামিতাকে তাদের শিল্পকর্মগুলোর মতই উদযাপন করতে পছন্দ করতেন।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি রেনেসাঁর সময়ের প্রধানতম ব্যক্তিত্ব এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা –সেটা বোধ হয় প্রায় সবারই জানা। কিন্তু যেটা হয়ত অনেকেরই জানা নেই যে, লিওনার্দো ছিলেন সমকামী। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড মনে করতেন, লিওনার্দোর

[205] David was a very controversial statue for many reasons. One reason was the fact that it depicted a nude young man, with much detail on the genitals. Also, a long feather coming from David's boot that caressed his leg and thigh, had, at the time, implied that David and/or Donatello (the artist), was homosexual (Ref. David , Donatello, wikipedia)
[206] PBS documentary "The Medici", 2003

সমকামের প্রতি আগ্রহ থেকেই বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প প্রতিভার জন্ম হয়েছিল। ১৯১০ সালে একটি বইয়ে লিওনার্দোর মনোজগত নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ফ্রয়েড বলেছিলেন[207], 'খুব কম বয়স থেকেই লিওনার্দো তার যৌনপ্রবৃত্তিকে জ্ঞানান্বেষণের দিকে ধাবিত করেন'।

ফ্রয়েডের কথায় সত্যতা কতটুকু তা নিয়ে বিতর্ক না করেও বলা যায়, সমকামিতার প্রভাব লিওনার্দোর মানসপটে সেই কিশোর বয়স থেকেই ছিল। তাকে এজন্য জেলেও যেতে হয়েছিল দুবার। প্রথমবার শহরের রাস্তায় রাখা কাঠের বাক্সে কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তি কোনো এক সমকামী যৌনকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এর ফলে নৈশ প্রহরীর দল (Officers of the Night) ১৪৭৬ সালের ৮ই এপ্রিল চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন, সেই তালিকায় লিওনার্দোও ছিলেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মুক্তি পান। দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটে এর দুমাস পরেই। এবারে লিওনার্দোকে সোজা জেলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এমনকি লিওনার্দর বাবাও কোনো ধরনের সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু তার কাছের এক প্রভাবশালী চাচার তদ্বিরে লিওনার্দো দু মাস জেল খেটে মুক্তি লাভ করেন[208]।

এরপরের ঘটনা তার আটত্রিশ বছর বয়সে যখন লিওনার্দো ছিলেন খ্যাতির শিখরে। বিখ্যাত *ভার্জিন অন দ্য রক্স* এবং *লাস্ট সাপার* তিনি এর মধ্যেই এঁকে ফেলেছেন, এবং রহস্যময়ী মোনালিসাও সম্ভবতঃ তার মাথায় ঘুরছে। ঠিক এ সময়ই তিনি গিয়ান গিয়াকোমো ক্যাপ্রোতি নামে এক কিশোরকে তার বাসায় রাখার জন্য নিয়ে আসেন। কিশোরের ডাক নাম ছিল সালাই (Salai)। লিওনার্দো 'তরুণ সালাইয়ের কোঁকড়ানো চুল, নিষ্পাপ মুখয়ব এবং সর্বোপরি দৈহিক সৌন্দর্যে' অত্যন্ত

---

[207] Sigmund Freud, Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, (1910), as cited by Daniel Arasse in his prologue Leonardo and Freud, Leonardo da Vinci.

[208] Keith Stern, Queers in History: The Comprehensive Encyclopedia of Historical Gays, Lesbians and Bisexuals, BenBella Books, 2009

মুগ্ধ হন[209]। কিন্তু এক বছরের মাথায় লিওনার্দো বুঝতে পারেন সালাই এতো সহজ সরল নিষ্পাপ নয়, তার 'ইধার কা মাল উধার' করার বদ-অভ্যাস আছে। লিওনার্দো এ সময় তার বিভিন্ন লেখায় সালাইকে 'ladro, bugiardo, ostinato, ghitto' - মানে 'চোর মিথ্যেবাদী, গোঁয়ার এবং লোভী' বলে আখ্যায়িত করেন। সালাইয়ের আলমারী ভর্তি ছিল দামী পোষাক পরিচ্ছদ আর ছিল পচিশ জোড়া জুতো। অন্তত পাঁচটি ঘটনায় লিওনার্দো সালাইয়ের চুরি দারি হাতে নাতে ধরে ফেলেন। কিন্তু তারপরেও সালাইয়ের সৌন্দর্য এবং আবেদনঘন চাহনি লিওনার্দোকে সালাইয়ের বদভ্যাসের কথা বেমালুম ভুলিয়ে দিয়েছিল বলেই মনে হয়। সেজন্যই হাজারটা বদভ্যাসের সন্ধান পেলেও তাকে বাড়ি থেকে বের না করে দিয়ে পরবর্তী পচিশ বছর ধরে লিওনার্দো সালাইকে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন।

লিওনার্দোর বিভিন্ন ছবিতে এ সময় কোঁকড়ানো চুলের যুবকের নগ্ন দেহের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। সে সময়কার আঁকা '*এঞ্জেল ইনকার্নেট*' সহ বহু স্কেচই তার প্রমাণ। আরেকটি ছবিতে কোঁকাড়ানো চুলের অধিকারী এক নগ্ন যুবককে পেছন দিক হতে আঁকা হয়। লিওনার্দোর আঁকা '*জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট*' ছবিতে সালাইয়ের মুখচ্ছবি ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের আরো ছবি হয়ত ছিল, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পাদ্রীরা ধর্মের দোহাই দিয়ে লিওনার্দোর বেশ কিছু 'যৌন-উদ্রেগকারী' ছবি ধ্বংস করে ফেলায় আমরা এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকের হদিস পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

সালাই লিওনার্দোকে ছেড়ে যান যাওয়ার বিশ বছর পরে লিওনার্দোর সাথে ফ্রান্সেস্কো মেলজি নামে আরেক মিলানের অভিজাত ব্যক্তির সাথে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। লিওনার্দো তখন বৃদ্ধ, কাজেই তাদের সম্পর্কের মধ্যে তারুণ্যের প্রেমময় উচ্ছ্বাস অনুপস্থিত থাকলেও তাদের সম্পর্ক ছিল অনেক প্রগাঢ়। মেলজি লিওনার্দোর

[209] A graceful and beautiful youth with fine curly hair, in which Leonardo greatly delighted, from Giorgio Vasari, *The Life of the Artist*.

শেষ দিনগুলোতেও লিওনার্দোকে পর্যাপ্ত সঙ্গ দেন এবং তার দেখভাল করেন। লিওনার্দোর নোটবইগুলোও মেলজির পরিচর্যাতেই থাকতো। লিওনার্দো তার ভাইয়ের কাছে লেখা চিঠিতে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেন[210] – ‘deeply felt and most ardent love’।

মাইকেলএঞ্জেলো

মাইকেলএঞ্জেলো ছিলেন রেনেসাঁর সময়ের আরেকজন স্বনামধন্য স্থপতি, এবং চিত্রকর। ডেভিড নামে তার অসামান্য স্থাপত্যকর্মটি নরদেহের সৌন্দর্যের অন্তিম প্রকাশ এবং সমকামী যৌনপ্রবৃত্তি শৈল্পিকভাবে প্রকাশের এক অভুতপূর্ব সাক্ষর। তা সত্ত্বেও সেসময়কার সর্বোচ্চ ধর্মবাদী সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা পেতে মাইকেলএঞ্জেলোর কখনোই কোনো অসুবিধা হয়নি। সিস্টাইন চ্যাপেলের ছাঁদে চিত্রাঙ্কনের জন্য পোপ জুলিয়াস ২ কর্তৃক মাইকেলএঞ্জেলোর এর মনোনয়ন প্রদান এমনি একটি উদাহরণ।

মাইকেলএঞ্জেলোর সারা জীবনেই অসংখ্য পুরুষের সাথে সান্নিধ্য ছিল। এদের অনেকেই মাইকেলএঞ্জেলোর স্থাপত্যকর্মের জন্য মডেল হিসেবে কাজ করেছিলেন। মাইকেল এঞ্জেলোর এই প্রণয়াস্পদদের তালিকায় ছিলেন ঘেরার্দো পেরিনি, নোবেলম্যান তমাসো ক্যাভালিরি, চেচিনো দেই ব্রাক্কি, ফেবো দি পোগিও সহ অনেকেই। পেরিনি মাইকেলএঞ্জেলোর সাথে দশ বছর একসাথে ছিলেন, আর মাইকেলএঞ্জেলো তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে 'স্বর্গীয়' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। মাইকেলএঞ্জেলো ব্রাক্কির প্রেমে পড়েছিলেন যখন ব্রাক্কির বয়স ছিল মাত্র তের। তার দু বছরের মাথায় ব্রাক্কি মারা যান। ব্রাক্কির এই অকাল প্রয়াণে মাইকেলএঞ্জেলো অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে ভেঙ্গে পড়েন। ব্রাক্কির সমাধিতে মাইকেলএঞ্জেলো নিবেদন করলেন এই পক্তিমালা -

---

[210] Robert Payne, Leonardo, Doubleday, 1978

The early flesh and here my
bones deprived
Of their charming face and beautiful eyes,
Do yet attest for him how gracious
I was in bed
When he embraced and in what
the soul doth live.

মাইকেলএঞ্জেলোর ডায়রি কিংবা চিঠি থেকে তার সমপ্রেমের বহু আলামত পাওয়া যায়। সে সমস্ত আলামত ইচ্ছে করেই গোপন করা হয়। এমনকি ক্যাভালিরিকে উদ্দেশ্য করে চিঠিতে মাইকেলএঞ্জেলো যে আবেগময় কবিতাগুলো লিখেছিলেন, সেগুলো পরে যখন প্রকাশিত হয় সেগুলোর জেন্ডার বদলে দিয়ে প্রকাশিত হয়।

চৈনিক সভ্যতায় সমকামিতা

চীন দেশেও সমকামিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস আছে। চীনে সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামী মানুষদের তংঝি নামে অভিহিত করা হয়। শব্দটি বর্তমানে সমান্তরাল যৌনতার সকল মানুষকে বুঝালেও এর বুৎপত্তিগত অর্থ গোনায় নিলে এটি মূলত সমকামী প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষদেরই বোঝাতো। 'তং' শব্দের অর্থ 'সম' এবং 'ঝি' শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রবৃত্তি বা প্রবণতা। কাজেই বুৎপত্তিগত অর্থে 'তংঝি' বলতে সমলিঙ্গের মানুষদের প্রতি যৌনাকর্ষণ এবং প্রবৃত্তিকে বোঝানো হয়। চীনা গবেষক জিয়াওমিংজিয়ং-এর প্রায় পাঁচ বছরের গবেষনায় লিখিত 'দ্য হিস্ট্রি অব হোমোসেক্সুয়ালিটি ইন চায়না'[211] চীনে সমকামিতার এক প্রামান্য দলিল। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে প্রাচীন কালের চীনের রাজা এবং অভিজাত পরিবারের সদস্যরা

---

[211] Xiaomingxiong , History of Homosexuality In China, Ng, Siuming (Wu Xiaoming) & Rosa Winkel Press; Revised Edition edition (1997)

তংঝিদের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতেন। এছাড়াও ‘দ্য ড্রিম অব দি রেড চেম্বার’[212] এবং ‘আউট ল অব দা মার্শ’[213] দুটো বিখ্যাত চীনা উপন্যাসেও তংঝি সম্ভোগের উল্লেখ রয়েছে। সেই সময় চীনে অনেক তংঝিই রাজা এবং সম্ভ্রান্ত পুরুষদের কাছে উপপত্নীর মর্যাদা পেয়েছিলেন। গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা অনেক সময় তাদের সর্বকনিষ্ঠ পুত্রসন্তানটিকে ‘মেয়ে হিসেবে’ বড় করতেন, তারপর রাজন্যবর্গ বা অভিজাত পরিবারের কাছে উপপত্নী হিসেবে বিক্রি করে দিতেন। বিভিন্ন নাটকেও তংঝিদের মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যেত। বিখ্যাত ‘বেইজিং অপেরার’ বিভিন্ন নাটকে এরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করতো। ১৯২৯ সালে মেইলান ফেং নামের এক তংঝি নারীর ভূমিকায় অভিনয় করে সাংহাই শহরে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন।

চীনা গবেষক লি ইনহীর (Li Yinhe) গবেষণা থেকে জানা যায় - চীনের প্রাচীন শ্যাং রাজবংশে (খ্রিষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টপূর্ব এগারো শতাব্দী) সমকামিতার সুস্পষ্ট অস্তিত্ব ছিল। এটিকে তখন চৈনিক ভাষায় 'লুয়ান ফেং'বলে অভিহিত করা হত। চৈনিক সমকামিতার আদিতম সাক্ষ্য এটি।

পরবর্তী বিভিন্ন রাজবংশে সমকামিতার নানা ধরনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ডিউক লিং এর প্রেমিক মিজি শিয়া এবং আরেক সম্রাট ওয়েইয়ের প্রিয়পাত্র লর্ড লং য়্যাং এর কথা আমরা চৈনিক সভ্যতার ইতিহাসে পাই। গবেষক প্যান গুয়ানদানের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, হ্যান ডায়নেস্টির প্রতিটি রাজার এক বা একাধিক পুরুষ যৌনসঙ্গী ছিল। সম্রাট আই (Emperor Ai) নামে পরিচিত লিউ সিং এর সাথে দন জিয়াং-এর সমকামিতার সম্পর্ক ছিল। কথিত আছে একবার ডন জিয়াং সম্রাটের গাউনের উপর ঘুমিয়ে পড়লে ঘুমন্ত প্রেমিককে জাগানোর বদলে তিনি জামার আস্তিন কেটে ফেলে বাকি গাউনটিকে বের করে পরিধান করেন। সে সময়কার ইতিহাসে

---

[212] Tsao Hsueh-Chin, Dream of the Red Chamber, Anchor; Abridged edition (October 20, 1958)
[213] Shi Nai'An, Outlaws of the Marsh, Foreign Languages Press (January 1, 2001)

আমরা নারীর সমকামিতারও কিছুটা হলেও হদিস পাই। সমকামিতা জনপ্রিয় ছিল সং, মিং এবং চিং রাজবংশেও।

১৯১৪ সালে গবেষক সান সিহাও (Sun Cizhou) তার গবেষণা থেকে দেখান যে চীনের বিখ্যাত প্রাচীন কবি চু উয়ান (Qu Yuan) ছিলেন তার রাজার প্রেমিক। সান সিহাও চু উয়ানের 'লিসাও' এবং 'লংগিং ফর বিউটি' সহ বেশ কিছু কবিতা বিশ্লেষণ করে দেখান যে, সে সমস্ত কবিতায় কবি যেভাবে রাজার সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন সেটা সেসময় মূলত নারীরাই করতেন তাদের নিজ নিজ প্রেমিকদের সৌন্দর্য তুলে ধরতে। চীনের ইতিহাসে চু উয়ান ছাড়াও আরো নেক সমকামী কবি যুগলের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবি শি ক্যাং (Xi Kang) এবং রুয়ান জি (Ruan Ji)'র মধ্যকার সম্পর্কও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তাদের বন্ধনকে উপমায় আখ্যায়িত করা হতো এভাবে – 'ইস্পাতের চেয়ে দৃঢ়, এবং অর্কিডের মতোই সুরভিত'। কথিত আছে একজন কবির স্ত্রী লুকিয়ে লুকিয়ে একদিন তাদের আবেগঘন অবস্থায় দেখে ফেলেন এবং তাদের যৌনস্পৃহার সৌন্দর্যে শিহরিত হয়ে উঠেন[214]।

চিত্র: পুরুষ প্রেমিকদের প্রেম লুকিয়ে দেখছে একজন নারী – চিং রাজবংশের সময় আঁকা একটি চিত্রকর্ম।

---

[214] Bret Hinsch, Passions of the Cut Sleeve: The Male Homosexual Tradition in China, The University of California Press, 1990

মিং রাজবংশের রাজত্বকালে (১৩৬৮-১৬৪৪) শিল্প কারখানা বিস্তার লাভ করে, সেই সাথে নাগরিক বিবিধ চাহিদাও। সমকামিতা শুধু তখন রাজবংশ কিংবা সম্রাটদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে গিয়েছিল সাধারণ মানুষদের মধ্যেও। তার উল্লেখ পাওয়া যায় ফুজিয়ান রাজ্যের শেন দেফু (১৫৭৮-১৬৪২)র বর্ণনায়[215] –

> 'ফুজিয়ানিস লোকেরা ছিল পুরুষদের সৌন্দর্যের বিরাট সমঝদার। কে কত বড়লোক কিংবা গরীব, কিংবা সুদর্শন নাকি কুৎসিৎ এগুলো দিয়ে নয়, তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি হতো সামাজিক পদমর্যাদার নিরিখে। বয়স্কদের মধ্যে সম্পর্ককে বলা হতো *চিজিয়ং*, আর তরুণদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে বলা হতো *চিদি*। যখন বড় ভাই ছোটভাইয়ের বাসায় যেতেন, তাকে অভিভাবকেরা অবিকল জামাইয়ের মতো আপ্যায়ন করতেন। বিয়ে সহ ছোট ভায়ের অন্যান্য সকল ব্যয় বড় ভাই বহন করতেন। তারা দুজন দুজনকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং এমনকি ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তারা একই বিছানায় শয়ন করতেন স্বামী-স্ত্রীর মতোই।

মিং সাম্রাজ্যের সময় পতিতাবৃত্তি বিস্তৃতি লাভ করে এবং সেই সাথে বৃদ্ধি পায় উল্লেখযোগ্যমাত্রায় পুরুষ যৌনকর্মীর (এদেরকে অভিহিত করা হতো গিগোলোস নামে) সংখ্যাও। কিন্তু এ সময় থেকেই চীনে কনফুসিয়াসের উদারপন্থি দর্শন থেকে সরে এসে পারিবারিক নিয়ম কানুন জোরদার করার প্রচেষ্টাও নেয়া হয়, এবং তার ফলে এ সময় থেকেই মূলত সমকামিতাকে দেখা হতে লাগলো নীতি-নৈতিকতার নিরিখে নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে।

---

[215] Vitiello, Giovanni, "The Dragon's Whim: Ming and Qing Homoerotic Tales from the Cut Sleeve. T'oung Pao 78 (1992), 341-372.

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষে পুরুষে সম্পর্ককে চীনে প্রথম আইনগতভাবে অবৈধ ঘোষণা করা হয় ১৭৪০ সালে, যদিও আইনের প্রয়োগ তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হয়নি।তারপরেও এটি একারনেই গুরুত্বপূর্ণ যে সমকামিতাকে অবদমনের প্রথম আইনি প্রয়াস ছিল এটি।

সমকামীরা সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত হয় চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়গুলোতে (১৯৬৬-১৯৭৬)। সরকারের পক্ষ থেকে সে সময় সমকামিতাকে দেখা হয়েছিল সামাজিক অধঃপতন এবং মানসিক রোগ হিসেবে। পুলিশ প্রতিনিয়ত সমকামীদের আস্তানায় হানা দিতে শুরু করলো, আর হচ্ছিলো সমানে ধরপাকর। কিন্তু সে সময় সমকামিতার কোনো আইনগত উল্লেখ সেসময় না থাকায় পুলিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রেফতার করতো আইনশৃঙ্খলা বিনষ্ট করে নাগরিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করার অযুহাতে।

তবে আশির দশকের পর থেকে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে বদলে যায়।সমকামীদের অধিকার ধীরে ধীরে সমাজে স্বীকৃত হতে শুরু করে। ১৯৯৭ সালে চীনে অপরাধের তালিকা হতে সমকামিতাকে অব্যহতি দেয়া হয় এবং ২০০২ সালে মানসিক অসুস্থতার তালিকা হতে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সমাজে সমকামিতা

ভারতবর্ষে সমপ্রেম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হলে প্রথমে ভারতবর্ষর আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি ফেলতে হবে। আর ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস আবার জড়িয়ে আছে ভারতীয় সাহিত্যের সাথে। ভারতীয় সাহিত্য বলতে প্রথমেই আসবে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যকীর্তি[216], পুরাণ[217], স্থানীয় উপাখ্যান[218] এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক

---

[216] এই সাহিত্যকীর্তির অন্তর্ভুক্ত - বৈদিক সাহিত্য (এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, সূত্র সাহিত্য ও উপনিষদ), মহাকাব্য (মূলত রামায়ণ ও মহাভারত), বৌদ্ধ সাহিত্য (পালি বা প্রাকৃত ভাষায় রচিত 'জাতক', অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ইত্যাদি) ও জৈন সাহিত্য (প্রাকৃত ভাষায় রচিত ভগবতী-সূত্র, আচারাঙ্গ-সূত্র ইত্যাদি), আইন এবং কামকলা সংক্রান্ত গ্রন্থ (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

গ্রন্থ[219]। তাছাড়াও অনুসন্ধান যোগ্য অন্যান্য ক্ষেত্র হচ্ছে- প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিলালেখা, তাম্রশাসন ও মূদ্রা।

ভারতবর্ষের সভ্যতাগুলোর কথা বললে সিন্ধুসভ্যতার কথাই চলে আসবে সবার আগে। সিন্ধু-সভ্যতাই হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা। আর সিন্ধু-সভ্যতার সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের একটি বড় নিদর্শন হচ্ছে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে অবিস্কৃত মূর্তি, সীল, ভাস্কর্য ইত্যাদি। সিন্ধু-সভ্যতায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একটি পুরুষ মূর্তি। লম্বা নাক, মাংসল চিবুক, দাড়িগোঁফবিহীন পুরুষ মূর্তি[220]। গায়ে অলংকার। মুখমন্ডলে নারীসুলভ কোমলতা ফুটে আছে। অনেকে মনে করেন যে, শহরবাসীরা নৃত্য ও নৃত্যশিল্পীর প্রতি অনুরাগী ছিল বলেই ভাষ্কর্যশিল্পী তার দক্ষস্পর্শে অত্যন্ত নিপুনভাবে এ পুরুষ-মূর্তিটি সৃষ্টি করেছিলেন। নিখুঁতভাবে তৈরি এ পুরুষ-মূর্তিটিই সিন্ধু-সভ্যতার পুরুষ-সৌন্দর্যনন্দনের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এ-মূর্তিটি হয়ত মাইকেলএঞ্জেলোর 'ডেভিড' মর্মরমূর্তির কথাই অনেককে মনে করিয়ে দেবে।

এ ধরনের অনেক আলামত থেকেই বোঝা যায় যে, আমাদের প্রাচীন অনার্য সভ্যতায় সমপ্রেম ছিল। কিন্তু আর্য বৈদিক-হিন্দুধর্ম সমপ্রেম সম্পর্কে অস্বাভাবিক নীরবতা অবলম্বন করেছে; কখনো বা এ ধরনের বিতর্ক সুনিপূণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যা সূচনা করেছে এক অনাবশ্যক অস্বস্তির। বৈদিক ধর্মসূত্রে বিয়ে (বংশরক্ষা),

---

এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্র সহ অন্যান্য গ্রন্থ), জীবনী সাহিত্য ও রাজ-প্রশস্তি (হর্ষচরিত, বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, নবসাহসাঙ্গচরিত, রামচরিত, গৌড়বহো, কৃমারপালচরিত, হামির-কাব্য, ভোজ-প্রবন্ধ ইত্যাদি) এবং অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্য (পতঞ্জলির ব্যাকরণ, মুদ্রা-রাক্ষস, দেবীচন্দ্রগুপ্তম, গার্গী-সংহিতা ইত্যাদি)।

[217] পুরাণ – অতি প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, সমাজ ও ধর্ম ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা। সাধারণতঃ পুরাণ বলতে বুঝায় ব্যাসাদি মুনি প্রনীত শাস্ত্র। পুরাণ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। মহাপুরাণের সংখ্যা ১৮।

[218] স্থানীয় উপাখ্যানের অন্তর্ভুক্ত - দ্বীপবংশ, রাজতরঙ্গিণী, মহাবংশের উপাখ্যানসহ অন্যান্য উপাখ্যান।

[219] পারসিয়া, ইন্ডিকা, তহকিক-ই-হিন্দ সহ অন্যান্য প্রামান্য গ্রন্থ।

[220] সমপ্রেম একটু আভাস, হিমেল সাগর, মুক্তমনা। http://www.mukto-mona.com/Articles/himel_shagor/shomokaam.pdf

ধর্ম (কর্তব্যপালন) ও রতি (সাহচর্য) এ-তিন উদ্দেশ্যের বিধেয় বলে বিধৃত করা হয়েছে। অন্যদিকে বৈদিক-হিন্দুর প্রধান শাস্ত্রগুলো সরাসরি সমপ্রেম বা সমকামিতাকে ঈশ্বর বিরোধিতা বলে গণ্য করেনি; বা এর জন্য কঠোর শাস্তির বিধানও বাতিয়ে দেয়নি, যদিও মনুস্মৃতির একটি শ্লোকে নারী সমকামিতাকে হেয় করা হয়েছে বলে প্রতীয়মাণ হয়। তারপরেও ভারতীয় প্রাচীন (খৃষ্টপূর্ব ৮ থেকে খৃষ্টপর ৬ শতাব্দী পর্যন্ত) বৈদিক-হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে সমপ্রেম বা বর-বন্ধুর উদাহরণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের প্রিয় সখা। মহাভারতে বর্ণিত কৃষ্ণ ও অর্জুনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই প্রমাণ করে যে, পুরুষের মধ্যে বন্ধুত্ব কত গভীর ছিল সেসময়। অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন[221],

> Thou art mine and I am thine, while all that is mine is thine also!
> He that hateth thee hateth me as well, and he that followeth thee
> followeth me! ... O Partha, thou art from me and I from thee.

ডার্কা থেকে ফিরে আসার সময়, শেষ রাতে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হন ধনঞ্জয়ের (অর্জুনের অন্য নাম) এর আশ্রমে রাত্রিযাপনের উদ্দেশ্যে। মহাভারতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে[222],

> ...worshipped duly and furnished with every object of comfort and enjoyment, Krishn of great intelligence, passed the night in happy sleep with Dhananjay as his companion.

এ সময়ে বর-বুন্ধত্ব খুবই প্রবিত্র ছিল। একে আরও পবিত্র করার উদ্দেশ্যে সপ্তমচক্কর দেওয়া হতো ‘পবিত্র অগ্নি’ প্রদক্ষিণ করে, অনেকটা যেমন ‘সাত পাক’

---

[221] Vana Parva, Mahabharat, Sage Vyas.

[222] Aswamed Parva, Mahabharat, Sage Vyas.

দেওয়া হয় বৈদিক-হিন্দু বিয়েতে। আর পুরুষ-পুরুষের এ-বন্ধনকে বলা হয়ত 'সপ্তমপদ মিত্র' বা বন্ধুর সঙ্গে একতালে সাত পাক দেওয়ার বন্ধুত্ব। রাম ও সুগ্রীভ তাঁদের বন্ধুত্বকে সুগভীর করার উদ্দেশ্যে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে সাত চক্কর দিয়েছিলেন[223]। ভীষ্ম[224] বলছেন যে, পুরুষ শুধু নারীর কাছে যায় বংশরক্ষা করার উদ্দেশ্যে। আর এ তখনই যায় যখন পৃথিবীর বুক থেকে বংশধর কমতে থাকে।[225] অন্যদিকে পঞ্চতন্ত্রে দেখা যায় যে, শুধু পশুপাখি ব্যতিত সবগুলো পৌরাণিক চরিত্রই পুরুষ; এদের মধ্যে সমপ্রেম আছে, এমনকি সংসার ধর্মও।

নারী-পুরুষর 'শারীরিক' মিলন ছাড়াও সন্তান জন্ম নেওয়ার উপকথার সন্ধান মিলে রামায়ন এবং মহাভারতের মতো বৈদিক সাহিত্যগুলোতে। এসব কাহিনীতে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের জন্মের ক্ষেত্রে কখনও সখনো সমকামিতারও আভাস মেলে, আবার কখনও একেবারেই প্রকৃতি নির্ভর; যেমন, সীতার[226] জন্ম মাটি থেকে আর দ্রৌপদীর[227] জন্ম যজ্ঞের অগ্নি থেকে। জরাসন্ধের জন্ম হয় দু-জন পৃথক নারীর গর্ভে জন্ম নেয়া অর্ধ অংগবিশিষ্ট পৃথক সন্তানের সংমিশ্রণে। ইন্দ্র এবং স্কন্ধের মধ্যে যুদ্ধের সময় ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে স্কন্ধের দক্ষিন পার্শ্ব হতে জন্ম হয় বিশাখের। কার্তিকের[228]

---

[223] Ramayan, Sage Valmiki

[224] মহাভারতের একটি প্রধানতম চরিত্র। রাজা শান্তনুর ঔরষে এবং গঙ্গার গর্ভে তার জন্ম হয়। কুরু-পান্ডবদের মধ্যকার জ্ঞাতি-বৈরিতা আরম্ভ হলে ভীষ্ম তা নিবারণ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কৌরবভবনে বাস করে তাদের অন্নে প্রতিপালিত বলে ভীষ্ম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি দশ দিন ধরে যুদ্ধ করে প্রতিদিন পান্ডবদের দশ সহস্র সৈন্য ও সহস্র রথীকে বধ করেছিলেন। যুদ্ধের দশম দিনে পান্ডবেরা নিরুপায় হয়ে ভীষ্মের কাছে গিয়ে তাকে বধের উপায় জানতে চাইলে তিনি পান্ডবদের নিজের মৃতুর উপায় বাতলে দেন।

[225] Mahabharat, Sage Vyas.

[226] রাজা রামের স্ত্রী এবং মিথিলার রাজা জনকের কন্যা। হাল দিয়ে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করার সময় জনক একে সীতা বা লাঙ্গলের রেখায় প্রাপ্ত হন বলে তার নাম রাখেন সীতা।

[227] পঞ্চপান্ডবের স্ত্রী হিসেবে মহাভারতে চিত্রায়িত। তিনি পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের যজ্ঞবেদী থেকে উদ্ভুত কন্যা।

[228] কার্তিক হলেন মহাদেব এবং পার্বতীর পুত্র। কথিত আছে মহাদেব অগ্নির শরীরে প্রবেশ করে এই পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কার্তিকের জন্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, পার্বতীর সাথে বিহার কালে মহাদেবের তেজ পৃথিবীতে পতিত হয়। পৃথিবী এই তেজ ধারণ করতে না পেরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি আবার ভয়ে এই তেজ শরবনে নিক্ষেপ করেন। শরবনে এই বীর্য একটি সুন্দর বালকের সৃষ্টি করে। তিনিই কার্তিক।

জন্ম হয় শিবের পুরুষরস অগ্নি পান করার ফলে। অয়াপ্পানের জন্ম হয় শিব ও বিষ্ণুর মিলনে।[229] গণেশের জন্ম হয় আবার জন্মস্থলির বাইরে[230]। দ্রোন কিংবা কৃপ-কৃপী কারো জন্মই স্ত্রী পুরুষের ‘স্বাভাবিক’ মিলনে হয়নি। বালখিল্য মুনিদের[231] জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মার লোম থেকে। নারী সমকামিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে রামায়নে। সগরবংশীয় অংশুমানের পুত্র মহারাজা দিলীপ[232] নিঃসন্তান হয়ে মৃত্যুবরণ করলে জন্ম রক্ষায় সমস্যা দেখা দেয়। শিব সে সময় আবির্ভূত হয়ে রাজার দু-জন বিধবা স্ত্রীকে আদেশ করেন সন্তান লাভের জন্য পরস্পর দেহমিলন করতে। তাদের মিলনে সন্তান জন্মায় বটে কিন্তু সে সন্তান ছিল অস্থিহীন। পরে ঋষি অষ্টাবক্রের বরে সেই সন্তান সুস্থ এবং উত্তমাঙ্গ হন এবং ভগীরথ নামে রাজ্যশাসন করেন। নারী সমকামিতার আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে রামায়নে। কথিত আছে লঙ্কা পরিভ্রমনের সময় হনুমান রাবনের স্ত্রীগনের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থা চাক্ষুষ দেখেছিলেন। সমকামিতার উল্লেখ ছাড়াও বৈদিক সাহিত্যে আমরা পাই লিঙ্গ-পরিবর্তনের কাহিনী। বিষ্ণুর মোহিনী অবতাররূপে[233] ধরাধামে এসে শিবকে আকর্ষিত করার কাহিনী এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ ছাড়াও যে দুটো চরিত্র সবার আগে আলোচনায় আসবে তা হচ্ছে- মহাভারতের শিখন্ডী ও বৃহন্নলা। দ্রুপদপুত্র শিখন্ডী পূর্বজন্মে ছিলেন অম্বা নামের এক নারী। মহাদেবের বরে তিনি পুরুষবেশে আবার মর্তলোকে জন্ম নিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম যখন তাকে চিনতে পারলেন তখন ওর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলতে তিনি নারাজ হন। কারণ ভীষ্ম প্রতীজ্ঞা করেছিলেন, তিনি নিরস্ত্র, ভূপাতিত, বর্ম ও ধ্বজহীন, বিকলেন্দ্রিয়, স্ত্রী কিংবা স্ত্রী নামধারী কারো সাথে যুদ্ধ করবেন না। শিখন্ডীকে সামনে

---

[229] বিষ্ণু অবশ্য তখন মোহিনী রূপে ছিলেন। কিন্তু শিব তো সবই জানতেন; কারণ তিনি মহাশক্তির অংশ। তাঁর অজানা কিছুই থাকতে পারে না। বিষ্ণু (হরি) এবং শিবের (হর) মিলনের ফসল অয়াপ্পানকে হরিহরপুত্র নামেও সম্বোধন করা হয়।

[230] Shiv Puran দ্রঃ.

[231] অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ষাট হাজার ঋষি। ঋগবেদের উল্লেখ-অনুসারে এরা ব্রহ্মার লোম হতে উদ্ভুত মানসপুত্র।

[232] মহারাজা দিলীপ ছিলেন রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ।

[233] Callisto Radiant , Mohini - Lord Vishnu in female form, http://www.transpiritual.com/25.html

রেখে অর্জুন তার রথ পরিচালনা করেন এবং শরাঘাতে ভীষ্মকে ভূতলে ‘শরশয্যায়’ শায়িত করেন।

আর বৃহন্নলা হচ্ছে ক্লীবরূপী অর্জুন। এই ‘তৃতীয় প্রকৃতি’র রূপ অর্জুন পরিগ্রহ করেন যখন তিনি বনবাসে ছিলেন। তিনি বাইরে নারী, অন্তরে নর, আধুনিক ট্রান্সজেন্ডারের উদাহরণ যেন। এভাবেই তিনি বিরাট রাজের নগরে রাজকন্যা উত্তরা এবং অন্যান্য কুমারীদের জন্য নৃত্যগীতের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় তার কানে দীর্ঘ কুন্ডল, হাতে শাখা আর সুবর্ণনির্মিত বলয় থাকতো। দুর্যোধন বিরাটরাজ্য থেকে গো-হরণ করলে বৃহন্নলা সেই গো-সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে উত্তরের সারথী হিসেবে যুদ্ধে যান। কিন্তু যুদ্ধের সময় এত বিপুল কুরু-সৈন্য দেখে উত্তর পালিয়ে যেতে চাইলে বৃহন্নলা তাকে নিবৃত্ত করেন এবং উত্তরকে তার সারথী করে নিজেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং গো-সম্পদ উদ্ধার করেন[234]।

বৌদ্ধ সাহিত্যে বিমলাকৃতিনির্দেশে একটি কাহিনী আছে, সেখানে বলা হয়েছে একজন বৌদ্ধভিক্ষু দেবীর দয়ালাভে নারীর রূপ গ্রহণ করেন। তারপর তাকে আবার পুরুষে পবিবর্তন করা হয়। দেবী তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, নারীরূপ অধিকার করার পর বৌদ্ধভিক্ষু কি কোনোও রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে? বৌদ্ধভিক্ষু উত্তরে জানালেন যে, তিনি তেমন আলাদা কিছুই উপলব্ধি করেন নি। দেবী তখন বললেন,

> ‘তুমি যেমন প্রকৃত নারী নও, কেবল নারীর রূপে ছিলে, তেমনি সকল নারীই সেরকম নারী রূপে থাকে, হয়ত আসলে সত্যিকার নারী নয়। তাই বুদ্ধ বলতেন, সত্যিকার নারী পুরুষ বলে কিছু নেই। ... সকল জিনিসই আসলে এরকমই - অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের মিলনমেলা’।

উপরের বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায় যে, শুধু নারী-পুরুষের সম্পর্কটিই ‘স্বাভাবিক’ বলে মেনে নেয়া হয়নি, তারপাশাপাশি সমপ্রেমকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখার

---

[234] মহাভারত, বিরাট পর্ব।

চেষ্টা করা হয়েছে। তাই হয়ত থেরাবেদে[235] বলা হয়েছে, সমকামিতা কিংবা বিপরীতরতি পুরোটাই দু-জন ব্যক্তির ইচ্ছা-অনুচ্ছার উপর নির্ভরশীল, এ তাদের ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপার। যদি এ সম্পর্ক তাদের মধ্যে আনন্দ ও নির্ভরতা প্রদান করতে পারে তাহলে একে সবারই মেনে নেওয়া উচিত।

জৈন সাহিত্যে স্ত্রীনিরবাণপ্রকারণ (Strinirvanaprakaran) মহা-দার্শনিক সকতয়ন বলেছেন, যে-কোনোও মানুষ সমপ্রেম উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আরও বলেছেন, পৃথিবীতে তিন প্রকার আকাংক্ষা আছে- পুরুষ, নারী ও তৃতীয়-লিঙ্গ। তৃতীয়-লিঙ্গ সম্বন্ধে পতাঞ্জুলির ব্যাকরণ ও জৈন সাহিত্যে বোঝানো হয়েছে যে, এরা ক্লীব, পণ্ডক ও নাপুঞ্জক; তিন হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে সামাজিক প্রথা হিসেবে এদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। পালি ভাষায় রচিত মণিকণ্ঠ জাতককে এক রাজার ধর্মাশ্রমের এক তরুণ ভিক্ষুর সঙ্গে প্রেমে পড়ার কাহিনী উল্লিখিত আছে[236]। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' তে সমকামিতার ওপর একটি গোটা অধ্যায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কামসূত্রেও লিঙ্গকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে- পুং-প্রকৃতি, স্ত্রী-প্রকৃতি ও তৃতীয়া-প্রকৃতি; অর্থাৎ পুরুষ, নারী ও তৃতীয়-লিঙ্গ। তৃতীয়া-প্রকৃতি বলতে বাৎস্যায়ন সমকামিতা বা সমপ্রেমকে বুঝিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন কীভাবে সে-সময়ের সমকামী পুরুষরা চুল-কাটার দোকানে উপস্থিত হয়ে নিজের আকাংখা মিটাতো। সমকামিতার উল্লেখ পাওয়া যায় সংস্কৃতভাষায় রচিত বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রেও[237]। খাজুরাহ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্দিরে সে-সময়কার মিথুনমূর্তিগুলো পরিদর্শন করলে বেশ কিছু সমপ্রেম বিষয়ক বহু মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। শুধু সমপ্রেম নয়,

---

[235] Theravada বৌদ্ধধর্মের একটি প্রাচীন শাখা। আক্ষরিক অর্থ –'প্রাচীন জ্ঞান'। ভারতে এক সময় এর উন্মেষ ঘটে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও কম্বোডিয়া, লাওস, থাইল্যান্ড, বার্মা এবং চীনের কিছু অংশে এই শাখার অনুসারী এখনো বিদ্যমান।

[236] Ruth Vanita and Saleem Kidwai, Same-Sex Love in India Reading from Literature and History, Macmillan India Ltd.

[237] Ruth Vanita and Saleem Kidwai, পূর্বোক্ত।

পাওয়া গেছে শিব এবং দুর্গার সমন্বয়ে গঠিত একক মূর্তি। এই মুর্তির মহেশ্বর অর্ধ দিকে নারী এবং অপর দিকে নর।
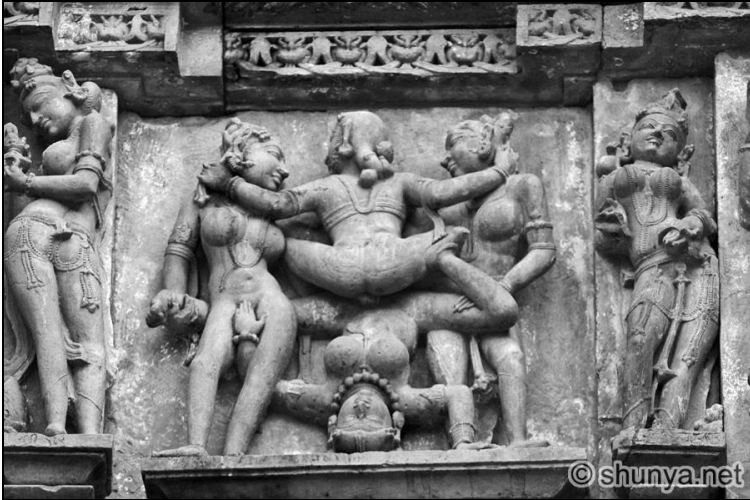
চিত্রঃ ভারতের প্রাচীন খাজুরাহ মন্দিরের গায়ে সমকামিতার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে।

চিত্রঃ ভারতের প্রাচীন গুহায় প্রাপ্ত শিবের অর্ধনারীশ্বর মুর্তি

শুধু ধর্মীয় পুরাণ কিংবা গ্রন্থেই নয়, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও সমকামিতার প্রচুর উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। সমকামিতার উল্লেখ পাওয়া যায় উর্দু এবং পার্শী ভাষায় লেখা বহু রচনায়। তার মধ্যে আমীর খসরু, জিয়াউদ্দিয়া রারানি, জামশেদ রাজগিরি, মুত্রিবি, হাকিকাত-আল-ফুকারা, মুহম্মদ আকরাম, সিরাজ আব্দুল হাই, দরগাহ কুয়ালি খান, মীর তাকি প্রমুখ অন্যতম[238]।

আমীর খসরু (১২৫৩-১৩২৫) ছিলেন ভারতের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক কবি এবং গীতিকার। তাকে কাওয়ালী গানের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। আমীর খসরুর হিন্দাভী কাব্যে সমকামিতার প্রভাব স্পষ্ট। তার অনেক কবিতায় প্রেমের নৈবদ্য

[238] Ruth Vanita and Saleem Kidwai, পূর্বোক্ত।

উৎসর্গীকৃত হয়েছে পুরুষকে উদ্দেশ্য করে। আমীর খসরুর একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ এরকম –

> Tonight I heard that he whom I want to see will come–
> May my head be sacrificed to the road you will take.
> The gazelles in the desert carry their heads in their hands,
> Hoping that you will come hunting them one day.
> The attraction of love will not leave you unaffected –
> If you don't come to my funeral you will come to my grave.
> My soul has reached the edge; come so that I may live.
> Once I am no more, what use will it be if you come.

আমীর খসরু ছিলেন নিজামউদ্দিন আউলিয়ার প্রিয়শিষ্য। তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক বন্ধুত্বেরও অনেক বেশি। তিনি গুরু আওলিয়ার মৃত্যুতে যথার্থই ভেঙে পড়ে লিখেছিলেন -

> The beauty sleeps on the bridal bed, her tresses all over her face;
> Come Khusro, let's go home, for darkness settles all around.
> Looking at the empty bed, I weep day and night
> Every moment I yearn for my beloved, cannot find a moment's peace.
> He has gone, my beloved has crossed the river,
> He has gone across, and I am left behind. ...

নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সাথে হৃদয়ের বিচ্ছেদ সামলাতে না পেরে আমীর খসরুও মারা যান নিজামউদ্দিন মারা যাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই।

মুত্রিবি (আসল নাম সামারকান্দ) সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমলে (১৬০৫-১৬২৬) পারস্য থেকে ভারতে আসেন। তার কবিতাতেও সমকামিতার প্রসঙ্গ ধরা পড়েছে খুব পরিষ্কার ভাবেই –

A Hindu boy stole my wretched heart
He stole its tranquility and its calmness
My reason, my judgment, any endurance, my patience
All of these he stole with his laugh

ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনামলে দিল্লিতে সমপ্রেমিকদের রাজ-দরবারে অবাধ গতিতে আসা-যাওয়া ছিল। সমান্তরাল যৌনতা এ সময় সাহিত্য ও সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে কবি মুকারম বক্স ও মোক্কারোম এর প্রসঙ্গ। কবির মৃত্যুর পর ৪০ দিন তাঁর প্রেমিক শোকযাপন করেছিলেন, বিধবার মতো। আর সূফিদের প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সকলই মোটামুটি অবগত। তাদের আধ্যাত্মিক গান ও সাহিত্য স্বর্ণস্তবক হয়ে আছে। সূফি কবি আবরু[239] তো বিপরীতরতিকে পরিহার করে সমকামিতাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন,

ÔHe who prefers a slut to a boy, is no lover, only a creature of lust.Õ

শেখ খলন্দর বক্স নারীর সমপ্রেমকে কবিতায় স্থান দিতে গিয়ে লিখেছিলেন[240],

I'd sacrifice all men for your sake, my life,
I'd sacrifice a hundred lives for your embraces
How beautiful is it when two vulvas meet – [...]
The way you rub me, ah! [...]

When you join your lips to my lips,
If feels as if new life pours into my being,
When breast meets breast, the pleasure is such

---

[239] Pen name of Najmuddin Shah Mubarak. He came from a family of Sufi saints and scholars. A modern critic described him as the chief of boy-worshippers.

[240] সমপ্রেম একটু আভাস, হিমেল সাগর, পূর্বোক্ত।

That from sheer joy the words rise to my lips:
The way you rub me, ah! [...]

How can I be happy with a man – as soon as he sits by me
He starts showing me a small think like a mongoose --
I'd much rather have a big dildo
And I know you know all that I know [...]

ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতা খুঁজে আরও কিছু উদাহরণ করা যাক -

- সুলতান মাহমুদ (৯৭১ - ১০৩০) ছিলেন গজনীর সুলতান এবং ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। এক সময় আফগানিস্তানের গোঁড়া মুসলিম পরিবারে জন্মানো এই অসম সাহসী সৈনিক ১০০১ থেকে ১০২৬ সালের মধ্যে সতেরো বার ভারত আক্রমণ করে লাহোর, সোমনাথ এবং পাঞ্জাব এলাকা নিজদের দখলে নিয়ে আসেন। ছোট্ট এলাকা থেকে যাত্রা শুরু করে একটা সময় তিনি বর্তমান কালের আফগানিস্তান, ইরান এবং পাকিস্তান পর্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করে ফেলেন। তবে তিনি কেবল বিরাট যোদ্ধাই ছিলেন না, সেই সাথে ছিলেন শিল্প সংস্কৃতির বিরাট সমঝদার। বড় বড় কবি সাহিত্যক নবাবের পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন। তবে সব কিছু ছাপিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল সুলতানের সাথে আয়াজ মালিক নামে এক কিশোর ভৃত্যের প্রেমের সম্পর্ক। তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ইসলামী সাহিত্যের এক প্রসিদ্ধ উপাখ্যান। কথিত আছে, আয়াজের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা সুলতান মাহমুদকে পরিণত করেছিল 'দাসেরও দাস' (a slave to his slave) হিসেবে[241]। ভালোবাসার স্বীকৃতি স্বরূপ সুলতান আয়াজকে ভৃত্য থেকে নিজের সেনাবাহিনীতে স্থান করে দেন, এবং আয়াজ যুদ্ধে পারদর্শীতা দেখিয়ে এক সময় সিপাহসালাহরের পদে উন্নীত হন। ১০২১ সালে সুলতান আয়াজকে লাহোরের নবাবে ভূষিত করেন। শুধু তাই নয়, সুলতান তার জীবনের শেষ

[241] Encyclopædia Britannica. 2006. Encyclopædia Britannica Online, 2006; Also see Malik Ayaz in Wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Malik_Ayaz

দিনগুলোর বেশিরভাগই আয়াজের সাথে কাটিয়েছিলেন[242]। বিখ্যাত কবি আত্তার নেশপুরী (১১৪৫- ১২২১) তার *ইলাহীনামায়* বর্ণিত আটটি গল্পে সুলতান এবং আয়াজের এই প্রেমের কাহিনী তুলে ধরেন। এছাড়া কবি শেখ সাদী এবং আলাম্মা ইকবালের কবিতাতেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

- সুলতান কুতুবুদ্দিন খিলজি, তার পিতা আলাউদ্দিন খিলজির মতো কৃতদাসের সঙ্গে সমপ্রেমে আবদ্ধ হন। কুতুবুদ্দিনের সমপ্রেমিক ছিলেন খসরু খান। সভা-কবি লিখেছেন,

> He often wanted to put a sword through the Sultan and kill him while he was doing the immoral act of publicly kissing him. This vile murderer of his father was always thinking of ways to kill the Sultan. Publicly he offered his body to the Sultan like an immoral and shameless woman. But within himself he was seething with anger and choking on a desire for revenge at the way the Sultan forced himself upon him and took advantage of him.

- বৃহষ্পতি মিশ্রের 'স্মৃতিরত্নহার' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে জগদত্তের পুত্রকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেছিলন জলালুদ্দিন। আর তাদের বন্ধুত্ব সুগভীর ও দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে জলালুদ্দিন বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। উপহার সরূপ হাতী, ঘোড়া, সোনা, রুপা প্রভৃতি প্রদান করেছিলেন। এমনকি শঙ্খধ্বনিতে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল।

- সুলতান মোহাম্মদ মীর্জা সম্বন্ধে সম্রাট বাবরের আত্মজীবনিতে[243] বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর সুন্দর ছেলে সন্তানগুলোকে তাঁর 'হুর-হারেমে' ভর্তি করেন।

---

[242] Čištī, `Abd al-Rahmān, The History of India, Volume 2, chpt. 134
[243] Tuzk-I-Baburi, autobiography of Babur, founder of the Mughal Empire in India (15th century).

বাবর নিজেও সুন্দর যুবক দলের সঙ্গ পছন্দ করতেন। এ প্রথা তাঁর রাজ্য জুড়ে উঁচ্চবিত্ত সমাজে প্রচলিত ছিল। সম্রাট বাবর লিখেছেন[244],

> I maddened and afflicted myself for a boy in the camp-bazaar, his very name, Baburi, fitting in. Up till then, I had had no inclination for any-one, indeed of love and desire, either by hear- say or experience, I had not heard, I had not talked. ... One day during that time of desire and passion when I was going with companions along a land and suddenly met him face to face. I got into such a state of confusion that I almost went right off. To look straight at him or to put words together was impossible. With a hundred torments and shames, I went on.

- আলী আদেল শাহ সুন্দর সমপ্রেমিক পুরুষ ও যুবক সুংগ্রহ করতে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাদের সঙ্গ খুব পছন্দ করতেন। একদিন তিনি আমির আল-বুরাইদকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানান যে, আমিরের দরবারে রক্ষিত সুন্দর দুটো সমপ্রেমিক ছেলেকে যেন অতি তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু আমির তাঁর ছেলে দুটোকে আলী আদেল শাহকে পাঠাতে অনুচ্ছিক থাকায় পাঠাননি। পরবর্তিতে যখন মোরতাজাহ নাজিম শাহ বেহারির সঙ্গে যুদ্ধ বাধে আমির আল-বুরাইদের, তখন দু-হাজার সৈন্য দিয়ে আলী আদেল শাহ তাঁকে সাহয্য করনে। যুদ্ধ শেষে আমিরের দরবারে রক্ষিত ‘সুন্দর দুটো ছেলে’কে উপহার দেন আদেল শাহকে[245] ।

আধুনিক বাংলা ও অন্যান্য সমসাময়িক সাহিত্যে সমকামিতা

বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম কোনো লেখক ‘সমকামিতা’কে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে

[244] Tuzk-I-Baburi, পূর্বোক্ত।

[245] Tarekh-I-Farishtah, Mohammed Qasam Farishtah, 16th century.

তুলেছিলেন তা আজ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। বাংলা আধুনিক সাহিত্যে প্রথমসারির লেখকদের মধ্যে যারা সর্প্রথম সমপ্রেম নিয়ে লিখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়[246]। তাঁর ‘দুই বন্ধু’ (১৮৫৬) গল্পে সুখ-স্পর্শ, বিরহ-বিধুর, হৃদয়-স্নিগ্ধ করা দু-জন বন্ধুর প্রেমের কথা বলা হয়েছে। গবেষক ফয়জুল লতিফ চৌধুরীর গবেষণা থেকে জানা যায়, ১৯২৫ সালে কল্লোল পত্রিকার কার্ত্তিক সংখ্যায় নীলিমা বসু 'ঝরাফুল' নামে একটি গল্পে সমকামিতাকে উপজীব্য করে তুলেছিলেন[247]। এরপর বাংলাদেশের মাহবুব উল হকের আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'মফিজন' এ সমকামিতা অত্যন্ত সূক্ষভাবে হলেও উঠে এসেছে। ১৯৫১ সালে কমল কুমার মজুমদার চতুরঙ্গ পত্রিকার বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যায় 'মল্লিকা বাহার' গল্পে স্ত্রী-সমকামিতাকে বিষয় হিসবে নিয়ে আসেন। এখানে গল্পটির শেষাংশ পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো -

> শোভনা আপনার মধ্যে মল্লিকাকে এনেছে, সোহাগ করে মালা পরিয়ে দিয়েছে, সে মালা তার কণ্ঠে বিলম্বিত চুম্বনে চুম্বনে শোক ভুলিয়ে দিয়েছে। এবার শভনা খাদের গলায় বললে, 'কই তুমি তো আমায় খেলে না। তুমি আমায় ভালোবাসো না?' 'বাসি!' মল্লিকা শোভনাকে গভীর অপ্টুতার সঙ্গে গভীর ভাবে চুম্বন করলে। শোভনা জিজ্ঞাসা করলে - 'আগে কাউকে কখনো এমনভাবে ...' 'হ্যা ... আচ্ছা, আপনি?' 'আমায় তুমি বলো, আমি তমার কে? বলো?' 'আচ্ছা, তুমি?' 'না', দৃঢ় কণ্ঠে শোভনা বললে, বধ হয় মিথ্যা। হেসে বললে, 'আমি তোমার স্বামী তুমি-' 'বউ' শুনে শোভনা আবেগে চুম্বন করলে। ...

246 সমপ্রেম একটু আভাস, হিমেল সাগর,পূর্বোক্ত।

247 অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, সমপ্রেম, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।

কমল মজুমদারের আগেও স্ত্রী সমকামিতাকে নিয়ে গল্প লিখেছিলেন জগদীশ গুপ্ত। বস্তুত সময়ের সাথে সাথে সমকামিতা নানাভাবে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। দু-পার বাংলাতেই সাহিত্যিকেরা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে যৌনতার এই বিশেষ প্রবৃত্তিটি সাহিত্যে তুলে এনেছেন। এ প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ইমদাদুল হক মিলন, শামসুর রাহমান, পারভেজ হোসেন, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, মহম্মদ নুরুল হুদা, রোকন রহমান, সুমন লাহিড়ী, আব্দুর রউফ চৌধুরী প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। এ ছাড়া আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'উৎসব' গল্পে সমকামী পুরুষ যৌনকর্মীদের জীবনের কথা বিধৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে নলিনী বেরার অপৌরুষেয়, কবিতা সিংহের পৌরুষ, সমরেশ মজুমদারের 'আমার আমি' এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রকাশ্য দিবালোক' প্রমুখ সাহিত্যকর্মে সমকামিতা স্থান করে নিয়েছে। সম্প্রতি তিলোত্তমা মজুমদার 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' উপন্যাসে নারী সমকামিতার সমস্যাগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বাংলা কবিতাতেও বিক্ষিপ্তভাবে এসেছে সমকামিতা প্রসঙ্গ। বাংলাদেশের 'নির্বাসিত কবি' দাউদ হায়দারের 'সমকামী কয়েদী' এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। অসীম সাহসিকতার সাথে কবি দাউদ হায়দার গরাদের অভ্যন্তরে সমকামী জীবনের এক বাস্তব চিত্র এঁকেছেন কবিতাটিতে -

> অতঃপর গরাদ বেয়ে রাত্রি গভীর হলো। যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়েছে।
> কখন যেন নিভে গেছে বাতি। আশে পাশের রাস্তায় চীৎকার নেই।
> কোলাহল মানুষেরা ফিরে গেছে ঘরে। নিঃশব্দ চারিদিকে;
> কেবল মাঝে মাঝে দু একটা হুইসেল; ঘণ্টার ঢং ঢং দীর্ঘশ্বাস!
> রাত্রি গভীর হলো; সমকামী-কল্যানে কয়েকজন তখনো জেগে-
> যেন তীব্র মধুর সম্ভোগে ভরে দেবে ভুবন! -আর চোখে চোখে বেছে
> নিল পুষ্ট বালক; রাত্রি গভীর হোক চরিতার্থ করা যাবে অমল বাসনা।
> মূলত এই আমাদের ইন্দ্রিয় স্বদেশ, বিরাট ব্যাপ্তি -আমাদের
> মস্তিষ্কে অবিরাম বিস্ময় আর অতিরঙ্গ সীমানা; অর্থাৎ প্রয়োজন

নেই কোনো নারী নাভীমূল স্তন সমুদ্রদীপ্তি -আমাদের চোখের তারায়
হা-মুখ যোনী নয়, শুধুমাত্র চপল সৈকত।

কোনো কথা নেই, কেবল রূপান্তরের লাস্যময় ডুপের বাউল রাক্ষস আর,
হঠাৎ রক্তিম চুম্বনে ভরে তোলে অমল গুণ্ঠন, শোনিকের গন্ধ আর
ঘূর্ণিত পিছল ছুরিকা!

বালক ঘুমিয়েছিল, হঠাৎ জেগে দেখে ঈশ্বর শুধু উত্থান
পতনে -আদর্শ-দংশনে বিক্ষত করছে নেপথ্য গহবর - কিছুই বলার
নেই, চকিত কেবল বাহুপাশে আবদ্ধ করে নিষ্ফল নিখিল, বন্দী
যৌবন!

একইভাবে কবি দাউদ হায়দারের মতো সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, শফিক শাহীন এবং সেলিম মোজাহারের কবিতায় বিচ্ছিন্নভাবে সমকামিতা ধরা পড়েছে। নারী সমকামিতা এসেছে তসলিমা নাসরীনের কিছু লেখায় এবং কবিতায়। ‘আমার মেয়েবেলা’ নামের আত্মজৈবনিক উপন্যাসে তসলিমা কিশোর বয়সে তার বালিকা বন্ধু রুণির প্রতি গভীর ভালোবাসার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পুরুষদের যৌন অত্যাচার আর লৈঙ্গিক বৈষম্যে অতীষ্ট পাশ্চাত্যের অনেক নারীবাদিরা এক সময় পুরুষের যৌনাঙ্গকে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। তারা যৌনসঙ্গমে পুরুষের যৌনাঙ্গ নারীর যোনিতে অনুপ্রবেশকে প্রভুত্বের সমার্থক মনে করেছিলেন[248]। সেই একই প্রনোদনা লক্ষ্য করা যায় তসলিমার লেখনীতেও। পুরুষদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে 'নারীবাদী তসলিমা' নারীদের জন্য ভালোবাসা প্রকাশ করেন তার কবিতায় এভাবে-

যেহেতু নারীরাই দেখতে জানে পালকের মতো খুলে খুলে ক্ষত,
নারীকেই নামাতে হবে ঠোঁট চুম্বনের জন্য স্তনে
নারীকেই মেলতে হবে যোনিফুল নারীর সজল আঙ্গুলে

---

[248] যশোধরা বাগচী, যৌনতা : নারীবাদের আলোয়, যৌনতা ও সংস্কৃতি; সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তী; পুস্তক বিপনী, ২০০২

নারী ছাড়া কার সাধ্য নারীকে আমূল ভালোবাসে।

নারীসমকামিতা প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে উর্দু লেখক ইসমত চুঘতাইয়ের অবিশ্বরনীয় ছোটগল্প 'লিহফ' (লেপ) -এর কথা। একটি বাচ্চা মেয়ের জবানিতে বলা এই কাহিনীটি উপমহাদেশের লেসবিয়নিজম সংক্রান্ত হাতে গোনা গল্পের একটি। গল্পের শেষ অঙ্কে এক বিরাট লেপের তলায় মনিবিনী ও পরিচারিকার যৌনক্রিয়ার রহস্যময় ওঠাপড়া দেখে ভীত বালিকার মনে হয় যেন কোনো মত্তহস্তীর আস্ফালন। ভারতীয় সংস্কৃতির জগতে সমকামিতার অবস্থাও অনেকটা চুঘতাইয়ের লেপের তলায় হাতীর মতোই - রহস্যময়, ভীতিপ্রদ ও সম্পূর্ণ লোকচক্ষুরহিত[249]।

সমকামী উর্দু সাহিত্যের কথা বললে পাকিস্তানি সমকামী কবি ইফতি নাসিমের অবদানের কথা বলতেই হবে। প্রথমে উর্দু ভাষায় কবিতা লেখা শুরু করলেও বর্তমানে ইংরেজি ভাষায় লিখতে শুরু করেছেন। সমকামী জীবনের নানা অবস্থা এবং সঙ্কটের কথাই তার কবিতায় স্থান পায়। যেমন তার বাবাকে নিয়ে ‘মেরে বাবা’ নামে একটি কবিতায় ইফতি বলেন –

Mere Baba

sab kahte haiN merii shakl aap se miltii jultii hai
merii aaNkheN, merii peshaanii, mere hoNT
meraa lahjaa, baateN karne kaa andaaz
uThne, baiThne, chalne phirne ka andaaz
mere hoNToN kii harkat
sab kuchh aap hii jaisaa hai
maiNne sunaa hai beTaa
baap kii nasl kaa vaaris hotaa hai
mere zehn meN ek savaal ubhartaa hai

---

[249] অভিজিৎ গুপ্ত, সমকামিতা ও সংস্কৃতি: দেশে ও বিদেশে, যৌনতা ও সংস্কৃতি; সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তী; পুস্তক বিপনী, ২০০২

maiN jo bilkul aap par huuN
to phir merii tarjiih-e-jins
aapse kyuuN is darja alag hai?

অনুবাদ –

বাবা আমার, সবাই বলে আমার চেহারার সাথে নাকি তোমার অদ্ভুত মিল
আমার চোখ, কপাল, ঠোঁট, আমার উচ্চারণ, আর যেভাবে আমি কথা বলি
যেভাবে বসি, যেভাবে হাটি
আমার হাতের নড়াচড়া, সবকিছুই নাকি তোমার মতো।
আমি শুনেছি সন্তানের মধ্যে নাকি বয় বাবার রক্তের স্রোতধারা
আমার মনে প্রশ্ন আসে – সব কিছুই যদি আমার তোমার মতোই হবে
তবে আমার যৌনপ্রবৃত্তি তোমার চেয়ে এতটাই আলাদা হলো কেন?

সমকামী কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে ইফতিকে যে চড়াই-উৎরাই পেরুতে হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর ছিল না। ১৬ বছর বয়স থেকে ইফতি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গজল লেখা শুরু করেন। কিছু কিছু গজলের মধ্য দিয়ে তিনি তার সমকামী মননের যন্ত্রণা ও অসহায়ত্বকে তুলে ধরেন। কিন্তু পাকিস্তানি সমাজের রক্ষণশীলতা অনেক ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারপরেও কবিতা এবং গজলকে হাতিহার করে নাসিম সমস্ত প্রতিবন্ধকতা জয় করতে সচেষ্ট হয়েছেন। 'নারমান' নামে একগুচ্ছ কবিতা নিয়ে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। 'নারমান' ফার্সি শব্দ। এর অর্থ অর্ধনারীশ্বর। এই বইয়ের কবিতার দুই-তৃতীয়াংশ হচ্ছে সমকামিতা আর সমপ্রেম। 'আহ্বান' (come) নামে একটি ইংরেজি কবিতা এ'রকম-

Come
and lie down next
to me
play with my hardy chest
and let me

search for the gazelles
I lost with time
in the thick jungle of hair
On your chest; in my search
I crossed the line of childhood
to puberty.

Come look to me
and look into my eyes
We are the rescuers of
Noah's ark thrown back into
the sonny sea, guilty of
same-sex love.

তাছাড়া কথাসাহিত্যিক সাদাত হাসান মান্টোর কথাও বলা যায় যিনি তার সাহিত্যে যৌনতার অভিযোগে বহুবার আদালতের সম্মুখীন হন এবং অর্থ জরিমানাসহ কারাদণ্ড পর্যন্ত ভোগ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর উর্দুভাষার রেখতি কবিতায় (Rekhti Poetry) নারী সমকামিতার ঢালাও উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে গবেষকরা সন্দেহ করেন এ সমস্ত কবিতার অধিকাংশই সম্ভবতঃ পুরুষদের লেখা – এগুলো লেখা হয়েছে পুরুষ কবিদের দ্বারাই - 'নারীসুলভ অলঙ্কার' ব্যবহার করে[250]। সমকামিতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিদর্শন আছে নাজির আকবরাবাদির উর্দু কবিতায় কিংবা উড়িয়া ভাষায় লেখা গোপাবন্ধুদাসের জেলখানায় লেখা কবিতায়। পুরুষ সমকামিতার প্রাথমিক প্রকাশ পাওয়া যায় ১৯২০ সালে প্রকাশিত পান্ডে বেচান শর্মা (ছদ্মনাম উগ্র)'র হিন্দি ছোট গল্প 'চকলেট'-এ[251]।

[250] Ruth Vanita, "Married Among Their Companions": Female Homoerotic Relations in Nineteenth-Century Urdu Rekhti Poetry in India, Journal of Women's History - Volume 16, Number 1, Spring 2004, pp. 12-53

[251] Pandey Bechan Sharma 'Ugra' Translated from Hindi and with an Introduction by Ruth Vanita Chocolate and Other Writings on Male-Male Desire, Hardcover (Edition: 2006),

এই ছোটগল্পগুলো সে সময়ের পরিবেশ এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করলে অনন্যসাধারণ হিসবেই গন্য হবার যোগ্য। তার ছোটগল্পগুলো সেসময় ভারতের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক তৈরি করে – সে বিতর্কে অংশগ্রহণ করা থেকে মুন্সি প্রেমচাঁদ থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত কেউই বাদ যায়নি। সমকামিতা আছে ফিরাক গোরাখপুরির কবিতায়, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা'র উপন্যাস 'খুলি ভাট'-এ। সমকামিতার নিদর্শন আছে হিন্দি ভাষায় লেখা রাজেন্দ্র যাদবের 'প্রতীক্ষা' তে, চিত্রশিল্পী ভূপেন খাক্করের গুজরাতি ছোটগল্পে, আর কিশোরী চরণ দাসের উড়িয়া গল্পে। সমকামিতার উল্লেখ আছে মালায়ান ভাষায় লেখা ভি.টি নন্দকুমারের 'দুই নারী'তে। রাজস্থানী ভাষায় লেখা 'দোহরি জুন' (দুই জীবন) নামের ছোটগল্পে নারী সমকামিতা এবং উভকামিতাকে নিয়ে এসেছেন পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত রাজস্থানী লেখক বিজয় দান দেত্তা। সমকামিতা এবং উভকামিতাকে বিষয়বস্তু করে লিখেছেন ভারতীয় কবি এবং ঔপন্যাসিক বিক্রম শেঠ। তার একটি ইংরেজি কবিতা *Dubious* এরকম[252] –

Some men like Jack
and some like Jill;
I'm glad I like
them both; but still

I wonder if
this freewheeling
really is an
enlightened thing –

or is its greater
scope a sign
Of deviance from
some party line?

[252] Ruth Vanita and Saleem Kidwai, পূর্বোক্ত।

In the strict ranks
of Gay and Straight
What is my status:
Stray? Or Great?

সমকামিতা প্রসঙ্গ প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্যভাবে এসেছে মারাঠি ভাষায় নির্মলা দেশপান্ডে কিছু ছোটগল্পে। মারাঠি ভাষায় লেখা বিজয় তেন্ডুলকারের নাটিকা *মিত্রাচবি গোস্তা* (মিত্রার গল্প) নারী সমকামিতাকে প্রাধান্য দিয়ে লেখা উপমহাদেশের গুটিকয় নাটিকার অন্যতম। সমকামিতার উল্লেখ আছে সি.এস. লক্ষ্মী (আম্বাই)-এর তামিল সাহিত্যে আর সুকিরাতের পাঞ্জাবী সাহিত্য 'নির্বাসন'-এ। পশ্চিমের মতো ব্যাপক আকারে না হলেও উপমহাদেশের লেখক এবং সাহিত্যিকেরা সব সময়ই সমাজের বাস্তবতা তুলে ধরতে সমকামিতা সহ অন্যান্য যৌনপ্রবৃত্তিকে তাদের সাহিত্যে তুলে এনেছেন। সমকামী মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের হাওয়াও ক্রমশ লাগতে শুরু করেছে আমাদের সাহিত্যের বাতায়নে। ইন্টারনেট এবং বাংলা ব্লগস্ফিয়ারগুলোতে এ সংক্রান্ত লেখা এবং আলোচনা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। আশা করা যায় আগামী বছরগুলোতে এ সাহিত্য চোরা গোপ্তা পথে না চলে সাহিত্যের মূল স্রোতধারায় প্রবেশ করে যাবে।

নবম অধ্যায়

উপাসনা ধর্মে সমকামিতা

ধর্ম নামক বিষয়টির ব্যাপকতা আজকের দিনে বহুমাত্রিক এবং বিশাল। একেক ভাষায় এর ভাবার্থ একেক রকম। ইংরেজিতে প্রোপার্টি অর্থে যে ভাবে এটিকে ব্যবহার করি, বাংলায়ও অনুরূপ 'বস্তুর গুণ' বোঝাতে আমরা ধর্মকে ব্যবহৃত হতে দেখেছি বহুক্ষেত্রেই। যেমন আমরা বলি, আলোর ধর্ম 'ঔজ্বল্য', আগুনের ধর্ম 'দহন' ইত্যাদি।ধর্ম শব্দটির বুৎপত্তি ঘটেছে সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে। ধৃ ধাতুর সাথে 'মন্' প্রত্যয় যোগ করে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। কাজেই আক্ষরিক অর্থে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে 'যা ধারণ করে থাকে তাই ধর্ম'। তবে এই 'ধারণ করার' সংজ্ঞাতেই ধর্মের ব্যপ্তি আটকে থাকেনি। ইংরেজি 'রিলিজিয়ন' শব্দটির বাংলাও আমরা করেছি – ধর্ম, যার অর্থ *প্রোপার্টি* হতে ভিন্ন। কাজেই বাংলাভাষায় প্রোপার্টি এবং রিলিজিয়নের জন্য আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। দুটোকেই 'ধর্ম' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে অধুনা এ দুটি শব্দের পার্থক্য বোঝাতে অনেকে রিলিজিয়নের শব্দার্থ করেছেন 'উপাসনা ধর্ম'। অর্থাৎ ঈশ্বর উপাসনা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে থাকা মানুষের যে আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকাণ্ড তাকেই বলা হয়েছে মানুষের উপাসনা ধর্ম বা রিলিজিয়ন। এই অর্থে ইসলাম, খ্রীস্টিয়, হিন্দু এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকেও উপাসনা ধর্ম বা রিলিজিয়ন হিসেবে গণ্য করতে পারি। তবে 'রিলিজিয়ন' তথা ধর্মের মূল ভিত্তি হলো ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, যদিও বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের মত 'নিরীশ্বরবাদী' দর্শনগুলো এই সংজ্ঞার বাইরেই পড়বে।

ধর্মের উৎপত্তির একটা ইতিহাস আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম মানুষ ছিল অসহায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হিংস্র পশুর দাপাদাপি সব কিছু মিলিয়ে সে ছিল সত্যিকার অর্থেই নিরাশ্রয়। সেই সাথে খাদ্যের অপর্যাপ্ততা, রোগ ব্যাধি ও মহামারী ছিল নিত্যসঙ্গি। জীবন রক্ষার প্রয়োজনেই একটা সময় সূর্য, ঝড়, ঝঞ্ঝা, আগুন, বিদ্যুৎ, পর্বত, পশু ইত্যাদিকে বশ করার উপায়ের কথা মানুষ চিন্তা করে। হয়ত কখনো দাবানলে জঙ্গলে গাছের পর গাছ ধংস হতে থাকলো, আগুনের এই শক্তি দেখে হতবিহবল হয়ে মানুষ আগুনের উপাসনা শুরু করল, যাতে অগ্নিদেব সন্তুষ্ট থাকলে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিপর্যয় এড়ানো যায়। এভাবেই মানুষের অসহায়ত্ব এবং প্রয়োজনের তাগিদে ধর্মের প্রাথমিক রূপ হিসেবে প্রকৃতি এবং প্রতীকের উপর অলৌকিক শক্তি আরোপ করে তাদের পূজা অর্চনা শুরু হয়। মায়াবী কৌশল বা ইন্দ্রজালের মাধ্যমে অশরীরী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ বা বশ করার চেষ্টা চলে। ক্রমশ চলে আসে স্তব, স্তুতি, পুজা ও প্রার্থনা। এইভাবেই ঐন্দ্রজালিক কাজকর্মকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে থাকে মানুষের ধর্মবিশ্বাস। নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রপ জীবনের আকুতিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হতে থাকে নানা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। এইসব অনুষ্ঠান ও পুজো-পার্বনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করারা জন্য আবার গড়ে উঠলো পুরোহিত শ্রেণি। পুরোহিত শ্রেণি আবার নিজেদের কায়েমী স্বার্থ সুকৌশলে রক্ষা করতে আশ্রয় নিলো ধর্মের।

সমাজবিবর্তনের এক বিশেষ পর্যায়ে এলো রাষ্ট্র। ধর্মও ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিলো। যে অন্যায় ও অবিচার শোষিত মানুষ অসহায় ভাবে ভোগ করে, তার পরিপূরক হিসেবে স্বর্গ, নরক, পারলৌকিক বিচার প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের আশা এবং আকাংখাকে শাসক শ্রেণি কাজে লাগালো স্বীয় স্বার্থে। সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিকতা এবং কল্পণাকে রাষ্ট্রযন্ত্র বিভিন্নভাবে বিশ্বাসযোগ্য এবং স্থায়ী করে রাখার প্রয়াস পায়। এক সময় মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদা এবং অজানাকে ব্যাখ্যা করার উদগ্র আগ্রহ থেকে যে ধর্মের জন্ম হয়েছিল, সেই ধর্মই ধীরে ধীরে প্রচলিত সামাজিক

অনুশাসন ও পশ্চাৎপদ রীতিনীতিকে নীতি নৈতিকতার মোড়কে পুড়ে পরিবেশন শুরু করে। ধর্ম পরিণত হয় পুরুষতন্ত্র এবং শোষকশ্রেণির এক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল হাতিয়ারে। রক্ষণশীল মানুষেরা ধর্ম রক্ষার নামে তৈরি করে নানা রকমের টাবু। নারী অধিকার অবদমন, সমকামীদের প্রতিবিদ্বেষ, জাতিভেদ, বর্ণবাদ, সতীদাহ, জিহাদ ইত্যাদি নানা ধরনের ধর্মীয় সংস্কার এসে প্রগতিশীলতার চাকাকে পেছনের দিকে চালিত করে।

এক বছর আগে ভারতের তাজ হোটেল যখন সন্ত্রাসবাদী হামলায় আক্রান্ত হলো, তখন 'বিশ্বাসের ভাইরাস' নামে একটি লেখা মুক্তমনায় লিখেছিলাম[253]। লেখাটিতে বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মের প্রায়োগিকতাকে ব্যাখা করার একটি প্রয়াস নেয়া হয়েছিল। লেখাটিতে আমি ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম যে, 'বিশ্বাসের' একটা প্রভাব সবসময়ই সমাজে বিদ্যমান ছিল। না হলে এই বিংশ শতাব্দীতে এসেও প্রাচীণ ধর্মগুলো স্রেফ মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে এভাবে কখনোই টিকে থাকে থাকতে পারতো না। এটা মনে করা ভুল হবে না যে, 'বিশ্বাস' ব্যাপারটা মানব জাতির বেঁচে থাকার পেছনে হয়ত কোনো বাড়তি উপাদান যোগ করেছিল একটা সময়। মানুষ আদিমকাল থেকে বহু সংঘাত, মারামারি এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আজ এই পর্যায়ে এসে পৌছেছে। একটা সময় সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করাটা ছিল মানব জাতির টিকে থাকার ক্ষেত্রে অনেক বড় নিয়ামক। যে গোত্রে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে পারা গিয়েছিল যে যোদ্ধারা সাহসের সাথে যুদ্ধ করে মারা গেলে পরলোকে গিয়ে পাবে অফুরন্ত সুখ, সাচ্ছন্দ্য, হুর পরী উদ্ভিন্নযৌবনা চিরকুমারী অপ্সরা, (আর বেঁচে থাকলে তো আছেই সাহসী যোদ্ধার বিশাল সম্মান আর পুরস্কার) - তারা হয়ত অনেক সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছে এবং অধিক হারে উত্তরাধিকার তৈরি করতে পেরেছে। বিবর্তনের নিয়মেই হয়ত বিশ্বাসনির্ভরতার বিভিন্ন বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে এমনিভাবে ঢুকে গেছে যে পুরো প্রক্রিয়াটি আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক একটি

---

[253] অভিজিৎ রায়, বিশ্বাসের ভাইরাস, মুক্তমনা,http://mukto-mona.com/banga_blog/ ?p=290

ব্যাপার বলে মনে হয়। মুক্তমনায় প্রকাশিত ইবুক 'বিজ্ঞান ও ধর্ম: সজ্ঘাত নাকি সম্বনয়'[254] এ রিচার্ড ডকিন্সের একটি চমৎকার প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে '*ধর্মের উপযোগিতা*'[255] নামে। প্রবন্ধটিতে অধ্যাপক ডকিন্স একজন বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্বসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

অধ্যাপক ডকিন্সের লেখাটি থেকে একটা গুরুত্বপুর্ণ বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। মানব সভ্যতাকে অনেকে শিশুদের মানসজগতের সাথে তুলনা করেন। শিশুদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই একটা সময় পর্যন্ত অভিভাবকদের সমস্ত কথা নির্দ্বিধায় মেনে চলতে হয় –এ আমরা জানি। ধরা যাক একটা শিশু চুলায় হাত দিতে গেল, ওমনি তার মা বলে উঠল - চুলায় হাত দেয় না - ওটা গরম! শিশুটা সেটা শুনে আর হাত দিল না, বরং সাথে সাথে হাত সরিয়ে নিলো। মার কথা শুনতে হবে - এই বিশ্বাস পরম্পরায় আমরা বহন করি - নইলে যে আমরা টিকে থাকতে পারবো না, পারতাম না। এখন কথা হচ্ছে - সেই ভালো মা-ই যখন অসংখ্য ভালো উপদেশের পাশাপাশি আবার কিছু মন্দ বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপদেশও দেয় – 'শনিবার ছাগল বলি না দিলে অমঙ্গল হবে', কিংবা 'রসগোল্লা খেয়ে অংক পরীক্ষা দিতে যেও না – গেলে গোল্লা পাবে' জাতীয় - তখন শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না সেই মন্দ বিশ্বাসকে অন্য দশটা বিশ্বাস কিংবা ভালো উপদেশ থেকে আলাদা করার। সেই মন্দবিশ্বাসও বংশপরম্পরায় সে বহন করতে থাকে অবলীলায়। সব বিশ্বাস খারাপ নয়, কিন্তু অসংখ্য মন্দ বিশ্বাস হয়ত অনেক সময় জন্ম দেয় 'বিশ্বাসের ভাইরাসের'। এগুলো একটা সময় প্রগতিকে থামাতে চায়, সভ্যতাকে ধ্বংস করে। যেমন, ডাইনি পোড়ানো, সতীদাহ, বিধর্মী এবং কাফেরদের প্রতি ঘৃণা, মুরতাদদের হত্যা এগুলোর কথা বলা যায়। ডেনিয়েল ডেনেটের সাম্প্রতিক '*ব্রেকিং দ্য স্পেল*'[256] বইয়ে এর ধরনের

---

[254] বিজ্ঞান ও ধর্ম: সংঘাত নাকি সমন্বয়? (২০০৮): মুক্তমনা ইবুক, http://www.mukto-mona.com/project/Biggan_dhormo2008/

[255] 'বিজ্ঞান ও ধর্ম: সংঘাত নাকি সমন্বয়' বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রঃ

[256] Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, Daniel C. Dennett, Viking Adult, 2006

পিঁপড়ের মাথায় ল্যান্সফ্লুক প্যারাসাইটের উদাহরণ হাজির করেছেন। ল্যাংসেট ফ্লুক নামের প্যারাসাইটের কারণে পিঁপড়ের মস্তিষ্ক যখন আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন পিঁপড়ে কেবল চোখ বন্ধ করে কলুর বলদের মতো কেবল পাথরের গা বেয়ে উঠা নামা করে। ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকেও অধ্যাপক ডেনেট মানুষের জন্য একেকটি প্যারাসাইট বলে মনে করেন। মানুষের এই প্যারাসাইট আক্রান্ত মনন স্বীয় বিশ্বাস রক্ষার জন্য চোখ বুজে প্রাণ দেয়, বিধর্মীদের হত্যা করে, টুইন টাওয়ারের উপর হামলে পড়ে, সতী নারীদের পুড়িয়ে আত্মতৃপ্তি পায় ইত্যাদি...। মনোবিজ্ঞানী ডেরেল রে তার 'The God Virus: How religion infects our lives and culture' বইয়ে বলেন, জলাতঙ্কের জীবাণু দেহের ভিতরে ঢুকলে যেমন মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বিকল হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোও মানুষের চিন্তা চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তৈরি হয় ভাইরাস আক্রান্ত মননের। ডেরেল রে তার বইয়ে বলেন -

> Virtually all religion rely upon early childhood indoctrination as the prime infection strategy... Biological virus strategies bear a remarkable resemblance to method of religious propagation. Religious conversion seems to affect personally. In the viral paradigm, the God virus infects and takes over critical thinking capacity of individual with respect to his or her own religion, much as rabies affects specific parts of the central nervous system

কিছু প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস থেকে জানা যায়, যখন কোনো নতুন প্রাসাদ কিংবা ইমারত তৈরি করা হত, তার আগে সেই জায়গায় শিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়া হতো -এই ধারণা থেকে যে, এটি প্রাসদের ভিত্তি মজবুত করবে। অনেক আদিম সমাজেই বন্যা কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুমারী উৎসর্গ করার বিধান ছিল; কেউ কেউ সদ্যজন্মলাভ করা শিশুদের হত্যা করত, এমনকি খেয়েও ফেলত। কোনো কোনো সংস্কৃতিতে কোনো বিখ্যাত মানুষ

মারা গেলে অন্য মহিলা এবং পুরুষদেরও তার সাথে জীবন্ত কবর দেওয়া হত, যাতে তারা পরকালে গিয়ে পুরুষটির কাজে আসতে পারে। ফিজিতে ‘ভাকাতোকা’ নামে এক ধরনের বিভৎস রীতি প্রচলিত ছিল যেখানে একজনের হাত-পা কেটে ফেলে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সেই কর্তিত অংগগুলো খাওয়া হত। আফ্রিকার বহু জাতিতে হত্যার রীতি চালু আছে মৃত-পূর্বপুরুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য। ভারতে সতীদাহের নামে হাজার হাজার মহিলাদের হত্যা করার কথা তো সবারই জানা। এগুলো সবই মানুষ করেছে ধর্মীয় রীতি-নীতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে, অদৃশ্য ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে গিয়ে। এধরনের ‘ধর্মীয় হত্যা' সম্বন্ধে আরো বিস্তৃতভাবে জানবার জন্য ডেভিড নিগেলের ‘Human Sacrifice: In History And Today’ বইটি পড়া যেতে পারে[257]। এগুলো সবই সমাজে ‘বিশ্বাসের ভাইরাস’ নামক আগাছার চাষ ছাড়া আর কিছু নয়। সমকামের প্রতি অহেতুক ঘৃণা-বিদ্বেষ তৈরিতেও ধর্মের বিশাল ভুমিকা আছে। প্রথম দিকের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যকার ধর্মগুলো এত প্রাতিষ্ঠানিক রূপে ছিল না বলে সমকামের প্রতি বিদ্বেষ এতো তীব্রভাবে অনুভূত হয়নি। ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়ার পর থেকেই পাদ্রী, পুরোহিত মোল্লারা ঢালাওভাবে সমকামিতাকে ‘ধর্মবিরুদ্ধ যৌনাচার’, ‘মহাপাপ’, ‘প্রকৃতিবিরুদ্ধ বিকৃতি’ প্রভৃতি হিসেবে আখ্যা দিতে শুরু করে এবং এর ধারাবাহিকতায় শুরু হয় পৃথিবী জুড়ে সমকামীদের উপর লাগাতার নিগ্রহ এবং অত্যাচার। এই অধ্যায়ে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মমত গুলোর দৃষ্টিতে সমকামিতা ব্যাপারটি কিরকম তা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ধর্ম

প্রাচীন কালের অনেক ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে প্রথম থেকেই সমকামিতার স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটেছিল। প্রচলিত ছিল সমকামিতাকে ঘিরে নানা ধরনের আচার অনুষ্ঠান।

---

[257] Nigel Davies, Human Sacrifice--In History and Today, William Morrow & Co, 1981

প্রাচীন গ্রীসের ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ এবং সংস্কৃতিতে সমকাম-স্পৃহার কথা জানা যায় (এই বইয়ের অষ্টম অধ্যায়ে গ্রীক সভ্যতায় সমকামিতা অংশ দ্রষ্টব্য)। ধর্মীয়ভাবে সমপ্রেম এখানে স্বীকৃত ছিল। 'ভেনাস' ছিলেন তাদের কামনার দেবী। এই দেবীই আবার সমকামীদের উপাস্য ছিলেন। এছাড়া 'প্রিয়াপ্রাস' নামেও আরেক দেবীকেও সমকামীরা আরাধনা করত বলে শোনা যায়। তাহিতির বিভিন্ন জায়গায় সমকামে আসক্ত ব্যক্তিদের আরাধ্য দেবতার মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। আনাতেলিয়া, গ্রীস এবং রোমার বিভিন্ন মন্দিরে 'সিবিলি' এবং 'ডাইওনীসস' এর পুজো ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। সিবিলির পুরোহিতেরা গাল্লি নামে পরিচিত ছিলেন। এরা নারীবেশ ধারণ করতেন। মাথায় নারীর মতো দীর্ঘ কেশ রাখতে পছন্দ করতেন। এরা সমকামী ছিলেন বলেও অনুমিত হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১২০০ সালের মধ্যে সিবিলি পুজো ছড়িয়ে পড়ে এশিয়া মাইনরের *হিটটাইট* নামের ইন্দো ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এর পর এশিয়া মাইনর থেকে সিবিলি পুজো পারস্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এ সমস্ত প্রথা পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আফগানিস্তানে খননকার্য চালিয়ে একটি রৌপ্য ফলকের উপর সিবিলির মূর্তি আবিস্কার করেন।

অনুমান করা যেতে পারে যে, আফগানিস্তান হয়ে এই দেবীর পুজো কোনো এক সময়ে ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্তমানে গুজরাটের সঞ্খলপুরে বহুচোরা মাতার যে মূর্তি আছে তা অনেকটা 'সিবিলির' আদলে রচিত। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে পারস্যে 'মনিকিজম' (manichaeism) নামে এক বিশেষ ধর্মমতের উন্মেষ ঘটে। প্রফেট মানি ছিলেন এই ধর্মমতের প্রবক্তা। মানির অনুগামীরা তাদের পুরুষাঙ্গ ছেদন করে নপুংসকে রূপান্তরিত হতেন। এরপর ভ্যালেরিয়াস এর নেতৃত্বে ভ্যালেসি নামে এক খ্রিষ্টান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এরাও ছিলেন নপুংসক। আঠারো শতকের মধ্যভাগে রাশিয়ার স্কোপ্টসি (Skoptsy) নামে আরো এক নপুংসক খ্রিষ্টান

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। পরে এই সম্প্রদায়ের আদর্শ রোমানিয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সব খ্রিষ্টান যাজকদের যৌনজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও তাদের জীবনের সাথে সমপ্রেমের একটা সূক্ষ সম্পর্ক অনুমিত হয়[258]।

আমেরিকার মায়া এবং এজটেক সভ্যতার ধর্মীয় সংস্কৃতিতে সমপ্রেমের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী বিভিন্ন মন্দিরের পুরোহিতেরা অবিবাহিত অবস্থায় জীবন কাটাতেন। তারা অবিবাহিত জীবনে বালক সম্ভোগে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সমকামিতার এই বিশেষ রূপ ধর্মীয়ভাবে সেখানকার সমাজে স্বীকৃত ছিল। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী গ্রীনবার্গের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, জ্যোচিপিল্লি (Xochipilli) নামক এক দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য পুরোহিতেরা সমকামে প্রবৃত্ত হতেন। তবে ধর্মীয়ভাবে সমকামিতার চর্চা বিচ্ছিন্নভাবে করা হলেও সার্বিকভাবে মায়া এবং এজটেক সভ্যতা সমকামিতার প্রতি অসহিষ্ণু ছিল বলেই মনে করা হয়। মায়া সভ্যতায় সমকামের কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও এজটেক সভ্যতার আইনকানুন সমকামিতার প্রতি ছিল অত্যন্ত কঠোর। সমকামিতার অপরাধে সমকামীদের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হতো, নয়তো পুজার বেদীতে উৎসর্গ করা হতো ।

আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে ‘তালিংগিৎ’ (Tlingit) নামে এক উপজাতি বাস করতো। তাদের মধ্যে উপকথা প্রচলিত ছিল যে, উপজাতির এক নারীকে সূর্যদেব বিয়ে করেন। এই নারীর গর্ভে সূর্যদেবের ঔরসে আট সন্তানের জন্ম হয়। অষ্টম সন্তান ছিল এক অর্ধনারীশ্বর। তারা বিশ্বাস করে এর পর থেকে মানব মানবীর মিলনেও অর্ধনারীশ্বরের জন্ম হতে থাকে। এই উপজাতির সকলে বিশ্বাস করতো যে, এই বিশেষ ধরনের মানুষেরা ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল। এছাড়া উত্তর আমেরিকার আলাস্কাসের অ্যালিয়ুট, ক্যালিফোর্ণিয়ার লেচি এবং কানাডার কাসকা জনগোষ্ঠীর

[258] অজয় মজুমদার, নিলয় বসু, সমপ্রেম, পূর্বোক্ত।

মধ্যেও পুরুষ রূপান্তরকামীদের এবং সমকামীদের সন্ধান পাওয়া যায়। এরা বয়স্ক বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হত, এবং উপপত্নীর মর্যাদা পেত। এ সমস্ত সামাজিক রীতিনীতির পেছনে ছিল প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসনের সমর্থন।

বার্দাশদের কথা

আঠারো শতকের গোঁড়ার দিকে ফরাসী পরিব্রাজকের দল উত্তর আমেরিকায় পদার্পন করে নেটিভ ইন্ডিয়ান জনগোষ্টিদের মধ্যে এক অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলেন। এই গোত্রের অনেক পুরুষ নারীবেশ ধারণ করে এবং সঙ্গি হিসেবে পুরুষদের চয়ন করে। তারা এদেরকে বার্দাশ (Berdache) নামে অভিহিত করেন।

ফরাসী পরিব্রাজকেরা হতবিহবল হয়ে লক্ষ্য করেন, এই রূপান্তরকামী এবং সমকামী প্রবৃত্তিকে শুধু সহনশীল দৃষ্টি থেকেই দেখা হয় না, সেই সাথে শ্রদ্ধা এবং সম্মানও করা হয়।

পুরুষ বার্দাশেরা সাধারণত রান্না বান্না, কাপড় চোপড় গোছানো এবং গৃহস্থালির মতো 'মেয়েলী' কাজে নিয়োজিত থাকে, অন্যদিকে মেয়ে বার্দাশেরা অস্ত্র সস্ত্র বানানো এবং শিকারের সরঞ্জাম তৈরিতে নিজেদের নিয়োজিত করে। তারা এমনকি যুদ্ধেও অংশ নিয়ে থাকে। নেটিভ ইন্ডিয়ানদের অনেক গোত্রে পুরুষ বার্দাশদের 'নারী' হিসেবে দেখা হলেও(এবং তাদেরকে নারী হিসেবে গন্য করে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়), তবে অধিকাংশ গোত্রেই এদেরকে নারী কিংবা পুরুষের বাইরে 'তৃতীয় প্রকৃতি' হিসবেই বিবেচনা করা হয়।

বার্দাশদের সমকামী হিসেবে চিহ্নিত করার কারণ আছে। প্রধাণ কারণ হলো বার্দাশেরা বিপরীত লিঙ্গের পোষাক পরিধান করলেও এরা শয্যাসঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় সমলিঙ্গের সদস্যদের। পুরুষ বার্দাশরা সাধারণত ছেলেদের সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করে। অন্যদিকে মেয়ে

বার্দাশদের মধ্যে ‘স্ত্রী রাখার’ কিংবা দীর্ঘদিন ‘নারী সঙ্গী’ রাখার রেওয়াজ আছে। তবে এই রেওয়াজের বাইরেও বয়স্ক পুরুষেরা অল্প বয়সী মেয়েলী স্বভাবের ছেলেদের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে। এই সম্পর্ক গড়ে উঠে সামাজিক অনুমদনের ভিত্তিতে। তবে এক বার্দাশ কখনোই আরেক বার্দাশের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে না, ব্যাপারটিকে সামাজিকভাবে অগম্য ব্যভিচার (incest) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গ হিসবে অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে পাপুয়া নিউগিনিতে সমকামিতা এবং উভকামিতার ব্যাপক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। নৃতত্ত্ববিদ গিলবার্ট হার্ড ১৯৭০ সাল থেকে শুরু করে প্রায় বিশ বছর ধরে এই অঞ্চলে আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে যৌন্তা সংক্রান্ত গবেষণা চালান[259]। তার গবেষণা থেকে বেরিয়ে আসে অভিনব কিছু তথ্য। এই অঞ্চলে সাম্বিয়া নামে এক আদিম জনগোষ্ঠীর বাস করে। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ‘পুরুষত্ব নির্মাণের’ জন্য এদের মধ্যে এক ধরনের সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে। বীর্যকে এরা পুরুষত্বের আধার বলে মনে করে। অতিমাত্রায় বীর্যস্খলনের ফলে পুরুষত্ব হ্রাস পেতে পারে কিংবা মৃত্যুও হতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করে। তাই বিবাহিত জীবনে পুরুষেরা এক বিশেষ ধরনের গাছের রস সেবন করে। সাম্বিয়ারা মনে করে নারী এবং পুরুষ প্রাপ্ত বয়স্ক হয় ভিন্ন ভিন্ন যাত্রাপথের মধ্য দিয়ে। মেয়েদেরকে প্রকৃতিকভাবেই ‘নারী’ বলে মনে করা হয়, কিন্তু ছেলেরা স্বাভাবিকভাবে ‘পুরুষ’ হয়ে উঠে না, তাদেরকে পুরুষ হয়ে উঠবার জন্য ধর্মীয় এবং সামাজিক আচারের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কৈশোর পেরুলেই ছেলে সন্তানদের মায়ের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। এই সময় প্রাপ্তবয়স্ক যুবকদের সাথে মৈথুনে লিপ্ত হতে হয়। সাম্বিয়া গোষ্ঠীর মানুষেরা বিশ্বাস করে ছেলেদের দেহে বাইরে থেকে বীর্য প্রবেশ না করলে তারা সত্যিকার পুরুষ হয়ে উঠবে না। তারা মনে করে সাহস, শক্তি, শিকারের দক্ষতা প্রভৃতি

[259] Gilbert Herdt, Sambia Sexual Culture: Essays from the Field, University Of Chicago Press, 1999

এভাবেই দেহে সঞ্চালিত হয়। বীর্যকে তারা মাতৃদুগ্ধের সমান উপকারী বলে মনে করে। বীর্য এভাবে প্রবেশ না করালে কিশোরদের দেহ ক্ষুদ্রকায় থেকে যাবে বলে তারা আশংকা করে। এ সমস্ত বীর্যদানকারী যুবকেরা পরবর্তীকালে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে। শিশু কিশোরেরাও বড় হয়। একই পদ্ধতিতে তারা তখন অন্য কিশোরের দেহেও বীর্য প্রবেশ করায়। তারপর এরাও পরে বিয়ে করে নারী সংসর্গ উপভোগ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, তারা বিষমকামী হলেও জীবনের একটি সময়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমকামের চর্চা করে। এদেরকে তাই বিশেষ ধরনের উভকামীও[260] বলা যেতে পারে।

পাশাপাশি, আফ্রিকার বেনিনের ফন এবং তানজানিয়ার নিয়াকুসা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমপ্রেমের সন্ধান পাওয়া গেছে। ঘানার পশ্চিমাঞ্চলে ধর্মীয় অনুমোদন সাপেক্ষে সমলিঙ্গের বিয়ে প্রচলিত ছিল। নারী-পুরুষ উভয়েই সমলিঙ্গের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতো। সুদানের আজান্দি সমাজে কিশোর বয়সী বালকদের বয়স্ক পুরুষের সাথে বিয়ে দেয়া হত। এ ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু এবং জোসা আদিবাসীদের মধ্যেও এই একই ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ছোট দেশ লোসাথো এবং বান্টু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও সমকামিতার ধর্মীয় অনুমোদনের সন্ধান পাওয়া যায়। জাম্বিয়ার ইলা নামক আদিবাসীদের মধ্যে 'মাওয়ামী' নামের এক পুরোহিত শ্রেণির মধ্যে রূপান্তরকামিতা এবং সমকামিতা দৃশ্যমান। অ্যাঙ্গোলার অ্যাম্বো, উগান্ডার লুগবারা প্রভৃতি আদিবাসী সমাজেও রূপান্তরকামী পুরোহিত সমাজের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। গবেষকেরা রূপান্তরকামিতা আর সমকামিতার উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন নাইজেরিয়ার হাউসা, সেনেসাল ও গাম্বিয়ার উলোফ ও লেবউ আদিবাসী সমাজেও।

---

[260] বিখ্যাত যৌনবিশেষজ্ঞ জন মানি এই উভকামিতাকে)sequential bisexuality(হিসেবে অভিহিত করেছেন (Ref. John Money, Gay, Straight, and In-Between: The Sexology of Erotic Orientation, Oxford University Press, USA, 1988)।

হিন্দু ধর্ম

হিন্দু ধর্ম আদপে কোনো ধর্ম নয়। এটিকে এক ধরনের সংস্কৃতি বলাই ভালো। হিন্দু ধর্ম আসলে নানা মুনির নানা মতের সমন্বয়ে গড়ে উঠা জগাখিচুড়ি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এতে একেশ্বরবাদ আছে, বহুঈশ্বরবাদ আছে, আছে এমনকি নিরীশ্বরবাদও (যদি চার্বাক দর্শনকে এর অন্তর্ভুক্ত ধরি)। এতে বহুদেব দেবীর অস্তিত্ব যেমন আছে, তেমনি পাশাপাশি আবার আছে 'অদ্বৈত ব্রহ্মের' ধরাণা। এতে মূর্তিপুজারী ভক্ত যেমন আছে, তেমনি আবার আছে মূর্তিহীন শাক্ত এবং ব্রাহ্মরা। এ ধরনের নানা ধরনের পরষ্পরবিরোধী বিচিত্র ধ্যান ধারণার সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে হিন্ধু ধর্ম। এই বৈচিত্রের কারণ ধর্মটিতে সমন্বয় ঘটেছে আর্য, অনার্য, প্রাগার্য, বাহ্লীক, গ্রীকসহ নানা প্রাচীণ সংস্কৃতির মিশ্রণ। জহরলাল নেহেরু 'The Discovery India' বইয়ে হিন্দু ধর্মের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা আমার কাছে সবসময়ই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হয় –

> "HINDUISM as a faith is vague, amorphous, many sided, all things to all men. It is hardly possible to define it, or indeed to say definitely whether it is a religion or not, in the usual sense of the word. In its present form, and even in the past, it embraces many beliefs and practices, from the highest to the lowest, often opposed to or contradicting each other."

হিন্দু শব্দটি পারস্যদেশীয় 'সিন্ধু' থেকে এসেছে বলে অনুমিত হয়। বলা হয়ে থাকে, পারস্যভাষায় 'স' শব্দটিকে 'হ' এর মতো উচ্চারণ করা হয়। তারা সিন্ধু অববাহিকার লোকদের 'হিন্ধু' বলে অভিহিত করতো। কালের পরিক্রমায় এই 'হিন্ধু' শব্দটিই 'হিন্দু'তে রূপান্তরিত হয়। আরবীয় 'আল হিন্দ' শব্দটির মাধ্যমেও 'হিন্দু' শব্দটি জনপ্রিয় হয় বলে ধারণা করা হয়। এই শব্দটির মাধ্যমে 'সিন্ধু নদের তীরে বসবাসকারী জনগণ'কে বোঝানো হত। একসময় হিন্দুস্থান বলতে শুধু উত্তরভারতকে বোঝানো হলেও পরবর্তীতে হিন্দুস্থানের মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষকেই চিহ্নিত করা হয়।

হিন্দুধর্মে সমকামের ব্যাপারে আলোচনা করা একটু কঠিনই, কারণ সমকামিতা কিংবা সমপ্রেমের সুনির্দিষ্ট সমার্থক শব্দ সংস্কৃত শব্দভান্ডারে ছিল না। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী সমকামী যৌনক্রিয়াকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় – (ক) পুরুষে পুরুষে যৌন সম্পর্ক (খ) নারীর সঙ্গে নারীর যৌনক্রিয়া (গ) পায়ু সঙ্গম (ঘ) মুখমৈথুন। প্রথম দুটি ভাগকে সমলিঙ্গের যৌনসম্পর্কিত হিসেবে গন্য করা গেলেও পরের দুটো সমকামিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত নাও হতে পারে। বিষমকামী সম্পর্কেও পায়ু এবং মুখমৈথুনের যোগ থাকতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো প্রাচীন হিন্দুধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এমনকি বিষম যৌনসম্পর্কের মুখ ও পায়ু সঙ্গমকেও সমকামিতার পর্যায়ভুক্ত ধরা হতো। বস্তুত প্রাচীন হিন্দু ধর্মের সমকামিতা আর আজকের সমকামিতার মধ্যে বিস্তর ফারাক। এমনকি প্রাচীন গ্রীসে যে ধরনের সমকাম প্রচলিত ছিল সেটার সাথেও হিন্দু ধর্মে বর্ণিত সমকামে পার্থক্য রয়েছে।

হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলোর মধ্যে মনুসংহিতা অন্যতম। কথিত আছে এটা প্রথম মানব সায়ম্ভব মনু কর্তৃক লিখিত হয়। মনু ব্রহ্মার কাছ থেকে স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করে এটি মরীচি প্রমুখকে পাঠ করান। ভৃগু মনুর আদেশে এই ধর্মশাস্ত্র ঋষিদের নিকট ব্যাখ্যা করেন। এটিই মনুসংহিতা। মনুসংহিতাকে হিন্দু আইনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অত্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক এবং নারীদের জন্য প্রচন্ড অবমাননাকর গ্রন্থের নাম মনুসংহিতা। এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে বর্ণবাদ, শুদ্র সহ নিম্নবর্ণিয় হিন্দুদের মানুষ হিসবেই গন্য করেনি গ্রন্থটি[261]। সমকামীদের প্রতিও গ্রন্থটি অনুদার, যদিও এদের নিয়ে খুব বেশি আলোচনা গ্রন্থটিতে স্থান পায়নি। যে দু'চারটি ক্ষেত্রে সমকামিতার প্রসংগ এসেছে, তার মধ্যে অধিকাংশই নারী সমকামিতাকেন্দ্রিক। মনুসংহিতায় উল্লিখিত আইনে, 'যদি কোনো

---

[261] মনুসংহিতার দৃষ্টিতে হিন্দু নারীর অবস্থান সম্পর্ক বিস্তারিত জানতে ক) সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬ খ) সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১; (গ) কঙ্কর সিংহ, মনুসংহিতা এবং নারী, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০০৫; (ঘ) কঙ্কর সিংহ, আমি শূদ্র, আমি মন্ত্রহীন, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এ ছাড়া মুক্তমনা ওয়েব সাইটে রাখা ই-সংকলন 'বিজ্ঞান ও ধর্ম – সংঘাত নাকি সমন্বয়?' এ রাখা অনন্ত বিজয় দাশের 'সনাতন ধর্মে'র দৃষ্টিতে নারী' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

বয়স্কা নারী অপেক্ষাকৃত কম বয়সী নারীর (কুমারীর) সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে বয়স্কা নারীর মস্তক মুণ্ডন করে দুটি আঙ্গুল কেটে গাধার পিঠে চড়িয়ে ঘোরানো হবে'[262]। যদি দুই কুমারীর মধ্যে সমকামিতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহলে তাদের শাস্তি ছিল দুইশত মূদ্রা জরিমানা এবং দশটি বেত্রাঘাত[263]। সেতুলনায় পুরুষদের মধ্যে সম্পর্কের শাস্তি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বলা হয়েছে দু'জন পুরুষ অপ্রকৃতিক কার্যে প্রবৃত্ত হলে তাদেরকে জাতিচ্যুত করা হবে[264] এবং জামা পরে তাকে জলে ডুব দিতে হবে[265]। 'শুশ্রুত' নামক প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে স্ত্রী-সমকামিতার কথা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, দুই নারী যদি যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হয় তাহলে অস্থিহীন সন্তানের জন্ম হবে। মহাভরতে ভগীরথের জন্মকাহিনীতে (এই বইয়ের অষ্টম অধ্যায় দ্রঃ) এই ধরনের সংস্কারের সমর্থন মেলে।

উপরের দু-চারটি ক্ষেত্রে ছাড়া হিন্দুদের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোতে পরিষ্কারভাবে কিছু না থাকলেও উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ধর্মের দোহাই দিয়ে সমকামিতাকে ভারতবর্ষে অচ্ছুৎ বানিয়ে রেখেছে। হিন্দু ধর্ম সমকামীদের ব্যাপারে অন্য ধর্ম থেকে তুলনামূলক বিচারে 'উদার' হিসেবে দেখা হলেও ধর্মবাদীদের আচরণে তার প্রকাশ পাওয়া যায় না। অন্য সব ধর্মান্ধদের মতই তারা সমকামিতাকে বিকৃতি এবং নিন্দনীয় হিসেবে দেখে। তাদের চাপে সমকামী এবং রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের সামাজিকভাবে হেয় করে রাখা হয়। তাদের ধর্মোন্মাদিতার প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনায়। প্রসঙ্গত ১৯৯৭ সালে দীপা মেহেতার 'ফায়ার' ছবিটি মুক্তি পেলে ধর্মন্মাদিতার ঘৃতে যেন আগুন জ্বালা হয়। নারী সমকামিতাকে উপজীব্য করে বানানো এই ছবিটি সিনেমা হলগুলোতে মুক্তি পাওয়া মাত্রই হিন্দুত্ববাদী দলগুলোর তোপের মুখে পড়ে। তারা দাবি করে এই সিনেমা 'ভারতীয় কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি পরিপন্থি'[266]। শিবসেনা নেতা বাল থ্যাকারে নারী

[262] Manu Smriti chapter 8, verse 370.
[263] Manu Smriti chapter 8, verse 369.
[264] Manu Smriti Chapter 11, Verse 68.
[265] Manu Smriti Chapter 11, Verse 175.
[266] Kidwai, Saleem. "Sena fury on Fire," The Independent", 5 February 1999. Accessed 12 March 2008.

সমকামিতাকে ‘সামাজিক এইডস’ হিসেবে বর্ননা করে একে ‘মহামারী’ চিহ্নিত করেন[267]।
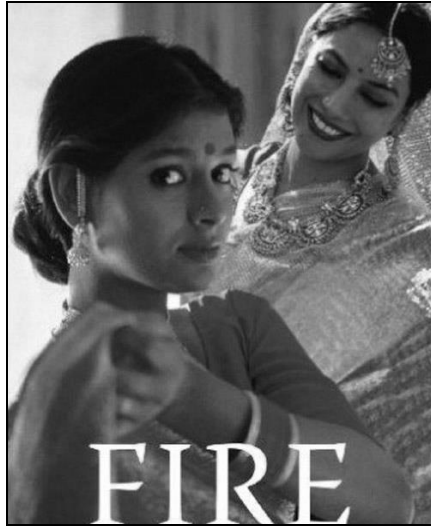
চিত্রঃ **১৯৯৭** সালে দীপা মেহতার ‘ফায়ার’ ছবিটি মুক্তি পেলে হিন্দুত্ববাদীদের রোষের মুখে পড়ে

শুধু তাই নয়, শিব সেনারা দাবি করে যে, হিন্দু ধর্মকে ব্যঙ্গ করার জন্য ইচ্ছে করেই ছবির নায়িকাদের নাম সীতা এবং রাধা রাখা হয়েছিল। সমকামী অধিকার কর্মীরা অবশ্য হিন্দুত্ববাদীদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছিল যে খোদ হিন্দু ধর্মের বহু পুরাণ আর মহাকাব্যগুলোতে সমকামিতার অজস্র উপাদান আছে, আর সমকামিতাকে অপরাধের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে ভারতে বলবৎ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইন, যা খ্রীষ্টিয় মতাদর্শ দিয়ে বেশি অনুপ্রাণিত[268]। তারা দাবি করেন সমকামিতা হিন্দু ধর্মের এবং সর্বোপরি ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

[267] Bearak, Barry (1998-12-24), "A Lesbian Idyll, and the Movie Theaters Surrender", New York Times,
[268] Activists slam attacks on lesbian film, Hindus vow to widen protest," Agence France-Presse, 3 December 1998.

তবে সাম্প্রতিককালে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে অনুমিত হয়। ফায়ারের পরবর্তীকালে নির্মিত 'দোস্তানা' কিংবা 'মেন নট এলাউড' ছবিগুলোর ব্যাপারে ভারতে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। ২০০৮ সালে ভারতের চারটি রাজ্যে (দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা এবং পন্ডিচেরী) প্রথমবারের মতো গে প্রাইড প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। দু হাজারেরও বেশি লোক এই প্যারেডে অংশ নেয়। এর পরের বছর ২০০৯ সালের ২৭ শে জুন ওরিষ্যা রাজ্য প্রথমবারের মতো দেখলো গে প্রাইড প্যারেডের দৃশ্য। ২৮ শে জুন দিল্লী এবং ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত হয় গে প্যারেড। চেন্নাইয়ে হয় এর পরের দিন। ২০০৯ সালের জুলাই মাসের ২ তারিখে নয়াদিল্লির হাইকোর্ট সমকামিতা অপরাধ নয় বলে রায় দিয়ে ১৪৮ বছরের পুরোনো ঔপনিবেশিক আইনের অবসান ঘটায়, শুরু হয় এক নতুন দিগন্তের সূচনা।

বৌদ্ধ ধর্ম

৫৬৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। এই ধর্ম (কিংবা দর্শন) ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি, বরং বুদ্ধের মতে অতৃপ্ত বাসনাই জাগতিক দুঃখের অন্যতম কারণ। এই অতৃপ্ত বাসনার জন্যই মানুষকে পুনর্জন্মের মাধ্যমে পুনরায় ধরাধামে জন্ম নিতে হয়। তাই বাসনা নিবৃত্তির মধ্যেই রয়েছে দুঃখ দূরীকরণের উপায়। তিনি এই অবস্থাকে বলেছেন 'নির্বাণ লাভ'। তবে নির্বাণ লাভের জন্য সব কিছু বাদ দিয়ে কেবল কৃচ্ছসাধনাকে বৌদ্ধ ধর্মে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রচুর ভোগবিলাস যেমন কামনা বাসনার নিবৃত্তি ঘটাতে পারে না, তেমনি কঠোর কৃচ্ছতাসাধনের মধ্য দিয়েও তা সম্ভব হয় না। যৌনতার সাথে কামনা বাসনার সম্পর্ক গভীরভাবে যুক্ত। অতিরিক্ত যৌনসম্ভোগকে তাই বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের অনেকেই নির্বান লাভের পথে অন্যতম বাধা বলে মনে করে। সমকামিতা যৌনতারই একটি বিশেষ দিক। তা সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্ম সমকামিতা সম্বন্ধে আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব। বিমলাকৃতিনির্দেশে বর্ণিত কিছু কাহিনী ছাড়া (অষ্টম অধ্যায় দ্রঃ) বৌদ্ধ সাহিত্যে

সমকামিতার তেমন কোনো উল্লেখ আমরা পাইনা। কিন্তু ধর্ম বা সাহিত্যে খুব বেশি কিছু না থাকলেও প্রায় সব দেশেই বৌদ্ধ ধর্মীয়দের মধ্যে সমকামিতার অস্তিত্ব দেখা যায়। এমনকি আছে মঠবাসী সন্ন্যাসীদের মধ্যেও।

ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী মঠবাসী সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীদের চিরকৌমার্যের ব্রত পালন করতে হয়। জীবিকার প্রয়োজনেই তারা সমলিঙ্গের সদস্যদের সাথে একসাথে বসবাস করে। একসাথে বাস করতে গিয়ে অনেকের মধ্যে সমকামী মানসিকতার পরিস্ফুটন ঘটে। ফলে চিরকৌমার্যের ব্রত পালনের কথা প্রকাশ্যে থাকলেও, সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসীনিরা গোপনে ভিন্নপথে যৌনজীবনের স্বাদ পেয়ে থাকে। বস্তুত মঠজীবনের ওপর সমীক্ষাভিত্তিক বেশ কিছু গবেষণার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মবলাম্বীদের যৌনজীবনের বিভিন্ন রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে[269]।

জাপানের বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে সমপ্রেমের সুস্পষ্ট উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। সমলিঙ্গের প্রেম-ভালোবাসা এখানে অনেক ক্ষেত্রে শুধু সমর্থিত হয়নি, প্রশংসিতও হয়েছে। চোদ্দ শতক থেকে জাপানী বৌদ্ধশাস্ত্রে সমপ্রেম বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে। মঠের বয়স্ক সন্ন্যাসীরা অনেকক্ষেত্রেই কম বয়সী সন্ন্যাসীদের সাথে দৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তেন। এই সব কমবয়সী সন্ন্যাসীরা 'ছিগো' (chigo) বলে পরিচিত ছিল। সমপ্রেমের এই সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী হতো। অনেক সময় আমৃত্যু এই ভালোবাসা অটুট থাকতো। দুজনের কোনো একজনের মৃত্যু হলে বেশ কয়েকদিন ধরে 'বৈধব্য' পালন করে। জাপানের বীর যোদ্ধা সামুরাইদের মধ্যেও সমপ্রেমের নানা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। সতেরো শতকে কিতামুরা কিগিমের (Kitamura Kigim) লেখা 'Iwatsusji' এবং ইহারা সাইকাকুর Nashoku Okagami নামক কাব্যগ্রন্থে পুরুষ সমকামী যৌনসম্পর্কের নানা কাহিনী বিধৃত হয়েছে। জাপানের মতো চীন এবং তিব্বতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যেও সমকামিতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা

[269] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, *সমপ্রেম*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।

গেছে। ১৯০০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে হোমস ওয়েলস তার 'The practice of Chinese Buddhism' গ্রন্থে চীনের বিভিন্ন মঠে বয়স্ক এবং কম বয়সী সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিদ্যমান যৌনসম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী মেলভিন গোল্ডস্টেইনের গবেষণা থেকে *লাডাব এল ডব* নামে পরিচিত তিব্বতী সন্ন্যাসীদের সমকামের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। এ সব কিছুই বৌদ্ধ ধর্মে সমকামিতার প্রামাণ্য দলিল।

ইহুদি ধর্ম

ইহুদিরা খুবই প্রাচীন জাতি। আর ইহুদি ধর্ম হলো পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীণ ধর্ম। হিব্রু বাইবেল বা ওল্ড টেস্টামেন্ট হলো এদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। যিহোভা এদের একমাত্র উপাস্য দেবতা। হিব্রু বাইবেল থেকে সডোম নামক নগরীর কথা জানা যায়। এখানকার পুরুষেরা নারীদের পরিত্যাগ করে পুরুষে উপগত হলো বলে বর্ণিত আছে। এই 'ঘৃণ্য যৌনাচরণের' কারণে ঈশ্বর তাদের উপর রুষ্ট হন, এবং তিনি এই নগরীকে ধ্বংস করেন।

এ ব্যাপারে ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীটি এরকম (আদিপুস্তক ১৯ থেকে বর্ণিত)[270] :

১) সন্ধ্যায় সডোম নগরে দুজন দূত (angel) এসেছিলেন (সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে)। লুত তখন নগরের প্রবেশপথে বসেছিলেন।

২) লুত উঠে গিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'মহাশয়গন একবার অনুগ্রহ করে আমার বাড়িতে আসুন এবং সেবা করার সুযোগ করে দিন'।

৩) দূত দুজন সেখানেই রাত্রিবাস করতে চাইলে লুত নিজের বারীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। দূতেরা শেষ পর্যন্ত লুতের বাড়ি পর্যন্ত গেলেন, লুত তাদের পানীয় এবং রুটি দিলেন।

৪) সন্ধ্যায় ঘুমাতে যাবার ঠিক আগে শহরের নানা প্রান্ত থেকে লোকজন এসে

---

[270] Bengali New Testament Downloads, World Bible Translation Center, http://www.wbtc.com/downloads/bible_downloads/Bengali/Bengali_Bible_01)_Genesis.pdf

লুতের বাড়ি ঘিরে ফেললো, এবং লুতকে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো।

৫) তারা বললো, 'আজ সন্ধ্যায় যারা এসেছে, কোথায় তারা? তাদের বাইরে নিয়ে এস। আমরা তাদের সাথে যৌন সহবাস করতে চাই।

৬) লুত বাইরে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দাঁড়ালো।

৭) আর জনতার উদ্দেশ্যে বলল, 'না বন্ধুরা আমি মিনতি করছি, এমন খারাপ কাজ করো না'।

৮) লুত আরো বললো, 'দেখো আমার দুটি মেয়ে আছে,কোনো পুরুষ তাদের স্পর্শ করেনি। তাদের বরং তমরা নিয়ে যাও। কিন্তু দয়া করে এই অতিথি দুজনের প্রতি তোমরা কিছু করো না। এই দুজন আমার ঘরে এসেছে, এবং আমার অবশ্যই এদের রক্ষা করা উচিৎ।

৯) যে সব লোকেরা লুতের বাড়ি ঘিরে রেখেছিল তারা উত্তর দিলো, 'আমাদের পথ থেকে সরে যাও'।... জনতা লুতের দিকে এদিয়ে যেতে থাকল, ক্রমে দরজা ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম হলো।

১০) কিন্তু যে দুজন লোক (দূত) লুতের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা হঠাৎ দরজা খুলে লুতকে টেনে ভিতরে নিয়ে গিয়ে দরজা আটকে দিলো।

১১) তারপর তারা বাইরের মারমুখো জনতার উদ্দেশ্যে এমন কিছু করলো যে তারা অন্ধ হয়ে গেল। ফলে যারা বাড়ির ভেতরে জোর করে ঢুকার চেষ্টা করছিল, তারা দরজাই খুঁজে পেলো না।

১২) অতিথি দুজন রাতে লুতকে বলল, তার পরিবার পরিজন নিয়ে যেন শহর থেকে চলে যায়।

১৩) আমরা ঈশ্বরের আদেশে এই শহর ধ্বংস করে দেব। এই নগর যে কত খারাপ তা প্রভু শুনেছেন। তাই এই নগর ধ্বংস করার জন্য তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন ...

ইহুদিদের ধর্মীয় আইন ও উপদেশ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার হলো Talmud। এই গ্রন্থে সমকামী পুরুষদের গর্হিত আচরণের জন্য কিছু সুস্পষ্ট শাস্তির বিধানের কথা বলা

হয়েছে। সাধারণত দুই ধরনের শাস্তির কথা জানা যায় – এক, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সমগ্র ইহুদি জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। চরম শাস্তি হিসেবে এই বিচ্ছিন্নতা আসবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তবে 'মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শাস্তি' মানে কাউকে ধরে মেরে ফেলার কথা বোঝানো হয়নি, মনে করা হয়েছে শাস্তি আসবে সয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে। দ্বিতীয় ধরনের শাস্তি হিসেবে অবশ্য মৃত্যুদন্ডের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও কাউকে সমকামের জন্য শারীরিককভাবে মেরে ফেলাকে উৎসাহিত করা হয় না। এর কারণ হলো, ইহুদিদের জন্য মোসেস (মূসা) যে দশটি উপদেশাবলী রেখে গিয়েছেন, তার মধ্যে সপ্তমটিতে ব্যক্তি হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তবে মূসার অনুশাসনাবলীতে সমপ্রেম সম্পর্কিত কিছু কথা স্পষ্টভাবেই বিধৃত আছে। বলা হয়েছে সমকামিতার অভিযোগে যদি কোনো বয়স্ক পুরুষ ধৃত হয়, তবে তার উপর মৃত্যুদণ্ড বর্ষিত হবে। যদি দুজনের মধ্যে একজন বয়স্ক পুরুষ ধৃত হয়, তবে তার উপর মৃত্যুদণ্ড বর্ষিত হবে। যদি দুজনের মধ্যে একজন বয়স্ক এবং অপর জনের বয়স নয় বছর থেকে তের বছরের মধ্যে হয়ে থাকে, তবে বয়স্ক ব্যক্তিটির জন্য মৃত্যুদণ্ড এবং অপরজনকে বেত্রাঘাতের বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমকামী ব্যক্তির বয়স যদি নয় বছরের কম হয়ে থাকে, তবে নাবালক হিসেবে সে কোনো শাস্তির আওতায় পড়ে না। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির জন্য বেত্রাঘাতের বিধান বলবৎ থাকে।

ইহুদি ধর্মে নারী সমকামিতার বিষয়েও কিছু কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু স্ত্রী সমকামিতায় লিঙ্গ-প্রবিষ্টকরণের (Penile penetration) ব্যাপার থাকে না, তাই স্ত্রী সমকামিতাকে এতটা নিন্দনীয় ব্যাপার হিসেবে অনেকেই গণ্য করেন না। ইহুদি ধর্মীয় আইন কানুনেও এর প্রতিফলন ঘটেছে। এখানে স্ত্রী সঙ্গমকে আদৌ প্রকৃত সঙ্গম বলে মনে করা হয় না। ফলে বিবাহ বহির্ভুত যৌন মিলনের তুলনায় তাদের কাছে এই জাতীয় সম্পর্ক অনেক মম দোষাবহ।

ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও ইহুদি ধর্মগুরুদের কথা এক সময় ইহুদিরা যথেষ্টই প্রাধান্য

দিতো। লিভাই নামে এক প্রাচীন ধর্মগুরু ছিলেন। তাঁর বংশধরদের বলা হতো Levite। এরা বিভিন্ন সময়ে ইহুদিদের যৌনজীবন নিয়ে নানা মতামত প্রদান করতেন। এই মতামতের মধ্যে সমপ্রেমকে অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো। তাদের শাস্তি ছিল সোজাসুজি মৃত্যুদণ্ড। তারা মনে করতো, যেহেতু সমকামী সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কোনো সন্তানের জন্ম দেয়া যায় না, সেহেতু এই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কোনো চরম পরিতৃপ্তির পর্যায়ে পৌঁছানো যায় না। আবার Rabbai Acha নামে আরেক ধর্মগুরু ফতোয়া দেন সমকামিতার কারনেই ঈশ্বর নাকি পৃথিবীতে ভূমিকম্প সৃষ্টি করেন। তবে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে এই ধর্মগুরুদের প্রভাব ইহুদি সমাজে অনেক কমে এসেছে। ইহুদিরা যেহেতু জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রসর একটি জাতি, তারা ধর্মগুরুদের চেয়ে বিজ্ঞানীদের কথাকেই গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন বেশি।

সেজন্যই ধর্মীয় আইন কানুনে যাই থাকুক না কেন, কিংবা ধর্মগুরুরা একটা সময় যাই প্রচারণা চালাক না কেন, বর্তমানকালে ইহুদিদের জীবনচর্চায় অনেক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। বিভিন্ন ইহুদি সংগঠনেও লেগেছে 'নতুন দিনের হাওয়া'। ১৯৮৪ সালে Reconstructionist Rabbinical College এর কর্তৃপক্ষ সমপ্রেমী কোনো ব্যক্তিকে তার বিশেষ যৌনপ্রবৃত্তির কারণে এই সংস্থায় ভর্তি থেকে বিরত রাখা যাবে না বলে নির্দেশ জারি করে। এর পর Hebrew Union College এ ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পড়তে ইচ্ছুক ছাত্রদের যৌনপরিচয়কে ভর্তির মানদণ্ড হিসেবে দেখা হবে না বলে ঘোষণা করা হয়। এদিকে ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে ইসরায়েলী পার্লামেন্ট নতুন আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে দুই পুরুষের সমকামী সম্পর্ককে আইনসিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। ফলে ইসরায়েলে সুলামিত এলনি সহ অন্যান্য মানবাধিকার কর্মীরা যে সংসদে দশ বছর ধরে সমকামের স্বপক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা অবশেষে পূর্ণতা পেল।

খ্রিষ্ট ধর্ম

একটা সময় ইহুদি ধর্মের মধ্য থেকেই খ্রিষ্টধর্মের জন্ম হয়। যদিও ইহুদি এবং খ্রীস্টানদের সম্পর্ক কোনো সময়ই মধুর ছিল না, তা সত্ত্বেও খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থগুলোকে বাইবেলের অংশ হিসেবে মেনে নেয়। ফলে ওল্ড টেস্টামেনন্টে (Genesis 19:4-8) সমকামিতার জন্য সডোম নামক ধ্বংসের ব্যাখ্যা খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরাও গ্রহণ করে নেয়, এবং সমকামিতাকে 'বিকৃত পাপাচার' হিসেবে প্রচার করে। এ প্রসঙ্গে বার্ন ফোন তার হোমোফোবিয়া গ্রন্থে বলেন[271] –

> The Sodom story is popularly believed to demonstrate God's abhorrence of homosexual acts and to embody his most profound prohibition against them. It is also generally accepted as a dire warning to mankind, detailing what calamities will befall a society that allows homosexual behavior to flourish, and as scriptural justification for the belief that the extreme punishment is just recompense for the sin. The authority of the Church has supported this reading and has considered it sufficient justification for condemning those whose sin is believed to be like that of the men of Sodom.

এ ছাড়াও সমকামিতার উপর নিষেধাজ্ঞা এবং বিশেদ্গার আছে লেভিটিকাসের 'হোলিনেস কোড' অধ্যায়ে। বলা হয়েছে –

> 'যেভাবে মেয়েদের সাথে শয়ন কর, সেভাবে কোনো পুরুষের সাথে শয়ন কোর না। এটা নিষিদ্ধ' (Leviticus 18:22)।
>
> কিংবা,
>
> 'যদি কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে শয়ন করে, যেরূপ অন্য স্ত্রীর সাথে করে থাকে, তবে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে'। (Leviticus 20:13)।

---

[271] Byrne Fone, Homophobia: A History, Picador, 2001

সমকামিতা নিয়ে বিষেদগার আছে সেন্ট পলের অনেক সূত্রেও (Romans 1:26-2:1, I Corinthians 6:9-11, I Timothy 1:10)। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, যীশু সমকামিতা সম্বন্ধে তেমন কিছুই কোথাও বলেননি।

ইতিহাস থেকে দেখা যায় সমপ্রেম বিষয়ে খ্রিষ্টধর্ম সবসময়ই খড়গহস্ত[272]। সমপ্রেমকে খ্রিষ্টধর্ম প্রথম থেকেই সমর্থন করতে পারেনি। খ্রিষ্টান ধর্মবাদীদের হাতে প্রতিটি যুগে নির্মম নির্যাতন এবং নিপীড়নের শিকার হয়েছে সমপ্রেমীরা। বস্তুত প্রজননহীন যৌনসম্পর্ককে ক্যাথলিক খ্রিষ্টধর্ম সম্পূর্ণ বর্জন করেছে। যেহেতু সমকামী সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সন্তান উৎপাদনের কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই এই জাতীয় সম্পর্ক ধর্মীয় নীতি বিরুদ্ধ। পোপ জন পল ২ (অধুনা মৃত) প্রায়শঃই বলতেন, প্রেম ভালোবাসা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, তাই এই ব্যাপারে চার্চের খবরদারী করাটা আদৌ সঙ্গত নয়। কিন্তু এই পোপ জন পলই সমকামিতাকে মেনে নিতে পারনিনি, সেটাও তিনি বহুভাবেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি একে 'ধর্মবিরুদ্ধ কাজ' বলে বর্ণনা করেছেন। ১৯৭৫ সালের ২৯ এ ডিসেম্বর রোমের প্রধান ক্যাথলিক চার্চ থেকে 'পারসোনা হিউম্যানা' নামে একটি ধর্মবার্তা প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক আইন এবং নৈতিকতার নানা দিক নিয়ে এখানে আলোচনা হয়। আলোচ্য বিষয়ে সমপ্রেমও ছিল। তবে সমপ্রেম (Homosexual love or romance) বিষয়ে খুব একটা উচ্চবাচ্য না করা হলেও সমকামিতাকে (Homosexuality) স্বীকার করা হয়নি, যদিও দেহজ এবং প্রেমজ সম্পর্কের পার্থক্যও ধর্মবার্তায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। আর এই অস্বচ্ছতার সুযোগ নিয়ে অনেকে সমপ্রেমের পেছনে বাইবেলের সমর্থন আছে বলে প্রচার করতে শুরু করে। এই ধরনের ঘোলাটে পরিস্থিতিতে চার্চ তার 'সঠিক' ভূমিকা প্রকাশ করার

[272] "For homosexuals the Judeo-Christian tradition has meant nothing but ostracism and punishment, exile and death…." (Encyclopedia of Homosexuality)

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৬ সালের ১লা অক্টোবর খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে চার্চ থেকে 'অন পেস্টোরাল কেয়ার অব হোমোসেক্সুয়াল পারসন' শীর্ষক একটি পত্র প্রকাশ করে। এখানে সমপ্রেমকে সোজাসুজি এক ধরনের 'কাম বিকৃতি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আরো বলা হয়, নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক ছাড়া অন্য সমস্ত ধরনের সম্পর্ক অত্যন্ত গর্হিত যৌন আচরণ। অবশ্য 'সঠিক' ভূমিকা নেয়ার পরেও বেশ কিছু জায়গার ঘোলাটে অবস্থা চার্চ দূর করতে পারেনি। নৈতিক দিক দিয়ে সমপ্রেমের অধিকারের বিষয়টি প্রতিক্রিয়াশীল চার্চও এড়িয়ে যেতে পারেনি। তারা সেই পত্রে উল্লেখ করে যে, সমপ্রেমী ব্যক্তি যদি নিগ্রহের স্বীকার হয়, তবে তাকে সাহায্য করা প্রয়োজন।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় সমকামের গ্রহনযোগ্যতা থকলেও খ্রিষ্ট ধর্মের উত্থানের সাথে সাথে সেখানে এই গ্রহণযোগ্যতা কমে আসতে শুরু করে। দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে সমপ্রেমকে সমপ্রেমকে খ্রীষ্টিয় সংস্কৃতি বিরুদ্ধ আচরণ হিসেবে গন্য করা শুরু করে। এ সময় থেকেই ক্যাথলিক চার্চ প্রজননহীন যৌনতাকে 'অপরাধ' হিসেবে প্রচার করতে শুরু করে।

মধ্যযুগের শেষ দিকে খ্রিষ্টান ধর্মযাজকেরা নানারকম দুর্নীতি ও অন্যায়ের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর্তের সেবা করা তাদের কাছে গৌণ হয়ে গিয়েছিল। ত্যাগ তিতিক্ষার পরিবর্তে তারা অব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন আমোদ প্রমোদ ও অসৎ জীবনধারায়। চতুর্দশ শতকে জন ওয়াই ক্লিফ, জন হাস ও মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে শুরু হলো ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। বস্তুত রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূত্র ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ মানুষের মনে যে পরিবতন আনে, ধর্ম সংস্কারের পথ সুগম করে। পোপের অনাচারের প্রতিবাদে তৈরি হয়েছিল বলে এই নতুন ধারার খ্রিষ্টধর্মকে 'প্রটেস্ট্যান্ট' নামে অভিহিত করা হয়। প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় শক্তির বিপরীতে প্রটেস্ট্যান্ট শক্তি মাথা তুলে দাঁড়ায়। প্রগতিশীল নানা ভাবনার কথা উঠে আসতে

থাকে। কিন্তু তারপরেও অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সমপ্রেম সম্বন্ধে সে সময়কার ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতৃবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই রক্ষণশীল। সমপ্রেম বা সমলিঙ্গের ভালোবাসাকে মার্টিন লুথার শয়তানের সৃষ্ট বিকৃত মনমানসিকতা বলে অভিহিত করেছিলেন। সে সময়কার অন্যতম সংস্কারক জন কেলভিন মনে করতেন সমপ্রেম ব্যক্তিজীবনকে কলুসিত করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তাই তিনি সমপ্রেমকে সমর্থন করতে পারেননি। আসলে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের মতো প্রটেস্ট্যান্টরাও পায়ুকামকে সমপ্রেমের সমার্থক মনে করতেন। তারাও পূর্বসূরী খ্রিষ্টানদের মতো মনে করতেন পায়ুকামের মতো ঘৃণ্য যৌনপ্রবৃত্তির কারণে ঈশ্বর সডোম এবং গোমরাহ নগরী দুটিকে ধ্বংস করেন। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৬৮০ সালের মধ্যে শুধু জন কেল্ভিনের অনুগামীদের নেতৃত্বে ত্রিশ জন সমকামীকে হত্যা করা হয়। সমপ্রেমীদের উপর পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটতে থাকে অহরহ। বলপূর্বক তাদের হাসপাতালে 'চিকিৎসার জন্য' পাঠানো শুরু হয়। অনেককে কারাবন্দীও করে রাখা হয়।

কিন্তু এত কিছুর পরেও সমকামীদের অধিকার বঞ্চিত করে রাখা যায়নি। আসলে সমকামিতার ব্যাপারটা যে প্রাকৃতিক, তা খ্রিষ্টধর্মের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসলে শুরু করে। ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে থাকে চার্চের যাজকদের মধ্যে অনেকেই সমকামী আছেন। সামাজিক মান সম্মানের ভয়ে এই যাজকেরা নিজেদের যৌনপ্রবৃত্তি প্রকাশ্যে জানাতে পারতেন না। এমনই একজন যাজক হলেন ক্রিস গ্লেসার (Chris Glaser)। 'চার্চ এন্ড সোসাইটি' (জুন ১৯৯৭) নামের এওটি পত্রিকায় 'এ নিউলি রিভিল্ড খ্রিষ্টান এক্সপেরিয়েন্স' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে সরাসরি বলেন, চার্চের অভ্যন্তরে সমকামী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা মানে চার্চ থেকে বিতারিত হওয়া। তিনি প্রশ্ন করেন, মানুষের বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি দেয়াই যদি চার্চের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে সমকামীদের প্রতি চার্চ এত বিরূপ কেন। তিনি চার্চকে 'কবরখানা' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি সে সময় বলেন, সমকামী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে হলে সমকামী যাজকদের চার্চ পরিত্যাগ

করেই এগুতে হবে।

সত্তুরের দশকের পর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের যাজকেরা বিক্ষিপ্তভাবে হলেও নিজেদের যৌনপরিচয়কে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা ধীরে ধীরে আন্দোলনের আকার ধারণ করে। তাঁরা একথাই বলতে চান যে, খ্রীষ্টিয় ধর্মতত্ত্বের সাথে সমপ্রেমের কোনো বিরোধ নেই। এদের অনেকেই মত দেন যে, প্রটেস্ট্যান্টরা সব সময়ই অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে, তাই সমকামিতার অধিকার আন্দোলন তাদের জন্য ব্যতিক্রম হতে পারে না। তারা দাবি, করেন বিংশ এবং একবিংশ শতকে মানুষের চাহিদা আর মূল্যবোধকে সামনে রেখে খ্রিষ্টধর্মকে নতুন দিকে পরিচালিত করতে হবে। তবে সবাই যে এই দাবি সমর্থন করলেন তা নয়। বস্তুত সমকামকে সামনে রেখে প্রটেস্ট্যান্টরা দুটি পরস্পরবিরোধী ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি ধারা সমপ্রেমকে সম্পূর্ণ উৎখাত করতে চায়। অন্যধারা সমপ্রেমের পেছনে ধর্মীয় সমর্থন খুঁজতে থাকে। ফলে চার্চের অভ্যন্তরে যাজকদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তর্ক বিতর্ক শুরু হয়। চার্চের উপর সামাজিক চাপ বাড়তে থাকে। এর ফলে বিভন্ন দেশে দাবি মেনে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৮৮ সালে কানাদার 'ইউনাইটেড চার্চ' কর্তৃপক্ষ সমকামী পরিচয়যুক্ত ব্যক্তিদের যাজক হিসেবে মনোনীত করতে রাজি হয়। এরপর 'ইউনাটেড চার্চ অব ক্রাইস্ট', 'ইউনিটেরিয়ান ইউনিভার্সালিস্ট এসোসিয়েসন' সহ বহু চার্চ এবং খ্রিষ্টধর্মীয় সংগঠণ সমকামী যাজকদের অধিকার এবং পদমর্যাদা মেনে নেয়। তারপরেও সামগ্রিকভাবে প্রটেস্ট্যান্টরা সমপ্রেমকে স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে স্বীকার করে নেয়নি।

এসময় চার্চের রক্ষণশীল ভূমিকাকে সমালোচনা করতে এগিয়ে আসেন উদারপন্থি খ্রিষ্টান বুদ্ধিজীবীরাও। তারা দাবি করেন সমকামিতা সম্বন্ধে বাইবেলের বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। একে তো যীশু খ্রিষ্ট কোথাও সমকামিতা সম্বন্ধে টু শব্দ করেননি, অন্যদিকে বাইবেলের যে অংশগুলোকে সমকামিতার প্রতি নিবর্তন মূলক বলে অভিহিত করা

হয়েছে, সেগুলোকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যেমন, তারা ব্যাখ্যা করেন - সডোম এবং গোমরা নামক শহর দুটো সমকামের জন্য ধ্বংস হয়নি, হয়েছে অতিথিবৎসল না হবার কারণে[273]। অনেকেই ব্যাখ্যা করেছেন যে, সডোম নগরবাসীর লুতের বাড়ি ঘেরাও করে দুজন অতিথিকে জোর করে বের করে যৌনসঙ্গম করার আর্তির মধ্যে 'ধর্ষকামী মনোবৃত্তি' প্রকাশ পেয়ছে। সমকামিতা এখানে গৌন। ঈশ্বর সডোম নগরী ধ্বংস করেছেন এই ধর্ষকামী মনোবৃত্তির জন্য, সমকামিতার জন্য নয়। প্রসঙ্গতঃ বাইবেলে বর্ণিত যিবূষ (Gibeah)নগরীতেও একইভাবে অথিতিবৎসল না হওয়া এবং ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে ঈশ্বর এক সময় পুরো নগর ধ্বংস করে দিয়েছিলেন (Judges 19:22-30)। সেখানে গৃহকর্তার দাসী এবং উপপত্নীকে সারা রাত ধরে ধর্ষণ করা হয়েছিল।সমকামিতাকে সেক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারপরেও নগর রক্ষা পায়নি। কাজেই উদারপন্থি ধর্মতাত্ত্বিকেরা দাবি করেন, সডোমের ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের কাছ থেকে শাস্তি এসেছে ধর্ষকামিতার কারণে, সমকামিতার কারণে নয়। আর তাছাড়া বাইবেলের যে সমস্ত জায়গায় সমকামিতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে, সে সমস্ত জায়গাতে কাঁচা মাংস খাওয়া, একই জমিতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বীজ বপণ করা থেকে শুরু করে গাইয়ে ট্যাটু আঁকা, মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা সহ অনেক কিছুই 'নিষিদ্ধ' করা হয়েছে। এগুলোর বেশিরভাগই আজকের জ্ঞানের সাপেক্ষে হাস্যকর শুনাবে। কাজেই সেগুলো যদি কারো জীবনে সমস্যা না করে থাকে, সমকামিতাই বা করবে কেন সেটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলে তারা মনে করেন। সেজন্যই জন বসওয়েল তার ' Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality ' গ্রন্থে বলেন[274],

The New Testament takes no demonstrable position on

[273] Bailey, Derrick Sherwin. Encyclopedia of Homosexuality. Dynes, Wayne R. (ed.), Garland Publishing, 1990.

[274] John Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century, University Of Chicago Press; 8th Edition. edition (November 1, 2005)

homosexuality. To suggest that Paul's references to excesses of sexual indulgence involving homosexual behavior are indicative of a general position in opposition to same-sex erorticism is as unfounded as arguing that his condemnation of drunkenness implies opposition to the drinking of wine.

১৯৯৮ সালে 'ইউনাটিং চার্চ অব অস্ট্রেলিয়া' একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে জানায় যে, বাইবেলের যুগে সমকামিতা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না, তাই একে বিকৃতির পর্যায়ভুক্ত করে রাখা হয়েছিল। বস্তুত আচরণগত সমকাম এবং প্রবৃত্তিগত সমকামের মধ্যে এই সময় পার্থক্য করা দূরূহই ছিল। ফলে বাইবেলে বর্ণিত সেসময়কার শাস্তিগুলোকে আক্ষরিক অর্থে নিলে চলবে না। ১৯৭৩ সালে *আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন* সমপ্রেম এবং সমকামিতাকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হিসেবে রায় দেয়ার পর এর প্রভাব পড়তে শুরু করে চার্চের উপরে। চার্চ কর্তৃপক্ষ সমকামের ব্যাপারে অনেক নমনীয়তা প্রদর্শন করতে শুরু করে। বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ সমকামী নারী এবং পুরুষদের অধিকারের কথা বলতে শুরু করেছে।

ইসলাম ধর্ম

ইসলামে সমকামিতার বিষয়ে জানতে হলে প্রথমে আমাদের পবিত্র কোরান শরিফের দিকে তাকাতে হবে। মুসলিমরা বিশ্বাস করে কোরান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বাণী। কোরান আল্লাহর কাছ থেকে নবী মুহম্মদ (দঃ) এর নিকট নাজিল হয়েছিল জিবরাইল ফেরেস্তার মাধ্যমে। কোরানে সমকামিতাকে 'জেনা'র সমতুল্য হিসেবে গন্য করা হয়েছে, এবং কোরান, হাদিস এবং শরিয়া অনুযায়ী কঠোর শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে[275]। কোরানের সমকাম-বিরুদ্ধ আইনের ভিত্তি হচ্ছে পূর্বতন ইহুদি-খ্রিষ্ট ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত লুতের কাহিনী। কোরানও ইহুদি এবং খ্রীস্ট ধর্মের অনুকরণে লুতের

[275] Abul Kasem, Sex and Sexuality in Islam, Part 6

ব্যাভিচারের কাহিনীকে নিজেদের ধর্মগ্রন্থে আত্মীকরণ করেছে[276]। কাজেই কোরান অনুসারে সডোমী হচ্ছে হযরত লুতের (আঃ) সম্প্রদায় কতৃক আচরিত একটি প্রথা। লুত ছিলেন ইসলামের আদি পুরুষ হযরত ইবরাহীমের (আঃ) ভ্রাতঃষ্পুত্র। লুতের সম্প্রদায়ের বাসস্থান কোথায় ছিল কোরানে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে ইতিহাসের বিভিন্ন রেফারেন্স থেকে যা বুঝা যায় তাতে মনে হয় যে প্রাচীন সডোম বা গোমরাহ নগরীতে ছিল তাদের বাস । বাইবেল বর্ণিত প্রাচীন এই শহর দুটি যৌনবিচ্যুতির জন্য কুখ্যাত ছিল। কোরানের বিভিন্ন আয়াত থেকে জানা যায়, এই শহর দুটির সমকামী অধিবাসীগণ আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আসমান হতে নিক্ষিপ্ত ব্রাইমষ্টোনের (গন্ধক বা সালফারনির্মিত প্রস্তরখণ্ড) আঘাতে মৃত্যুবরণ করে সডোমবাসীরা। নিহতদের মধ্যে লুতের স্ত্রীও ছিলেন[277]। লুত-সম্প্রদায়ের ধ্বংসবিষয়ক বর্ণনা কোরানে বহু সুরায় আছে (৭:৮০-৮৪, ২১:৭৪-৭৫, ২৬:১৬০-১৬৫, ২৭:৫৪-৫৮, ২৯:২৮-৩৫ ইত্যাদি দ্রঃ)।

আমরা এই বইয়ে কেবল সূরা আ'রাফ এর প্রাসঙ্গিক আয়াতগুলো (৭:৮০-৮৪)উল্লেখ করব[278] -

> ৭:৮০- আর আমি লুতকে নবুয়ত দান করে পাঠিয়েছিলাম, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমরা এমন অশ্লীল কুকর্ম করেছো যা তোমাদের পুর্বে বিশ্বে কেউ আর করেনি।
>
> ৭:৮১- তোমরা স্ত্রীলোকদের বাদ দিয়ে পুরুষদের দ্বারা তোমাদের যৌন ইচ্ছা নিবারণ করে নিচ্ছ।প্রকৃতপক্ষে তোমরা হচ্ছো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

---

[276] লুতের কাহিনী বর্ণনায় কোরানের এবং বাইবেলীয় ব্যাখ্যা প্রায় একই রকম। কেবল একটি জায়গায় বড় পার্থক্য আছে। লুত বাইবেলীয় দৃষ্টিকোনো থেকে কোনো পয়গম্বর না হলেও কোরানের দৃষ্টিতে তিনি একজন পয়গম্বর। বাইবেল অনুযায়ী লুতের সাথে তার দুই কন্যার অবৈধ সম্পর্ক ছিলো, এবং মদ্যপানরত অবস্থায় লুত তার কন্যাদের সাথে মিলিত হন এবং কন্যাদ্র গর্ভবতী করে ফেলেন (Genesis, 19:30-36)। কোরানে লুতের সম্বন্ধে এরকম কোনো কিছু পাওয়া যায় না, তাকে ধার্মিক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

[277] বাইবেল অনুযায়ী অবশ্য লুতের স্ত্রী লুতের সাথে পালানোর সময় পেছনে তাকাতে গিয়ে লবনের স্তম্ভে পরিনত হন।

[278] নূর নূরানী কোরান শরীফ, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ),সোলেমানিয়া বুক হাউজ

৭:৮২- উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বললো, এদের (লুত এবং তার সঙ্গীদের) জনপদ হতে বহিষ্কৃত কর, এরা নিজেদেরকে বড় পবিত্র লোক বলে প্রকাশ করছে।
৭:৮৩- পরিশেষে আমি লুতকে এবং তার পরিবারের লোকদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা করেছিলাম তার স্ত্রী ছাড়া, তার স্ত্রী ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত।
৭:৮৪- অতঃপর আমি তাদের উপর মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, সুতরাং অপরাধী লোকদের পরিনাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য কর।

আল-তিবরানি এবং আল-বায়হাকির বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত মুহম্মদ (দঃ) বলেছেন-

চার ধরনের লোক আছে যারা আল্লাহর তীব্র ক্রোধ মাথায় নিয়ে সকালে ঘুম হতে জাগে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি মাথায় নিয়েই রাতে ঘুমাতে যায়। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো- 'তারা কে, হে আল্লাহর রাসুল'? নবী বলেন- 'সেই সমস্ত পুরুষ যারা মেয়ে সাজতে চেষ্টা করে এবং সেই সমস্ত মেয়ে যারা পুরুষ সাজতে চেষ্টা করে (পোষাক-পরিচ্ছেদ এবং আচার আচরণ দ্বারা) এবং সেই সমস্ত লোক যারা পশুর সাথে সঙ্গম করে এবং সেই সমস্ত পুরুষ যারা পুরুষের সাথে সঙ্গম করে'[279]।

বিভিন্ন ইসলামী সোর্সের উল্লেখ করে আব্দুর রহমান ডইয়ের *শারিয়া দ্য ইসলামিক ল* (১৯৯৮) নামক গ্রন্থটিতে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে যে সমকামীতা কবিরা গুনাহ্ বা মহাপাপ। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে -

"কোনো ব্যক্তি যদি লালসাভরে কোনো বালককে চুমা দেয়, মহান আল্লাহ তাকে এক হাজার বছর দোজখের আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেবেন।" [280]

আব্দুর রহমান ডইয়ের গ্রন্থে আরও দাবি করা হয়েছে যে নবী বলেছেন-

[279] Sharia the Islamic Law, 1998 by Abdur Rahman I. Doi; Publisher A.S. Noordeen, G.P.O. Box No. 10066, Kuala Lumpur, Malaysia.
[280] Also see, "Narated By Abdullah ibn Abbas: The Prophet (pbuh) said: If you find anyone doing as Lot's people did, kill the one who does it, and the one to whom it is done." - Abu Dawud 38:4447

"কোনো ব্যক্তি যদি লালসাভরে কোনো বালককে স্পর্শ করে, তার উপর আল্লাহ তার ফেরেশতাবর্গ ও সমস্ত মানব জাতির অভিশাপ বর্ষিত হয়" ।

তবে আব্দুর রহমান ডইয়ের এই ব্যাখ্যার সাথে সবাই যে একমত হয়েছেন তা নয়। বহু ইসলামী বিশেষজ্ঞ শারিয়া আইনকে ইসলামের অংশ বলেই মনে করেন না, তারা মনে করেন শারিয়া আইন কোরান বিরোধী[281]। শারিয়া আইনের বিরোধিতা করে উদারপন্থি মুসলিম সংগঠন যেমন *আল ফাতিহা ফাউন্ডেশন, ক্যানাডিয়ান মুসলিম কংগ্রেস* সহ অনেক সংগঠনই সমকামিতাকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলে রায় দিয়েছে। তারা মনে করে সডোমবাসীরা মারা গিয়েছিল দুর্নীতি এবং লালসার কারণে, সমপ্রেমের কারণে নয়। লালসামূলক প্রবৃত্তিকে কোরান মূখ্যত সমপ্রেম সম্বন্ধে কোরান নিরবতা পালন করেছে বলে তারা মনে করেন। উদারপন্থি লেখিকা ইরাশাদ মানজী, যিনি নিজেও একজন সমকামী, তিনি মনে করেন ইসলামে সমকামিতা গ্রহণীয়। সেজন্যই প্রতিটি যুগে মুহম্মদ ইবনে আব্বাদ আল মুতাদিদ, অয়াবু নুহাস, ইফতি নাসিমের মতো কবি সাহিত্যিক মুসলিম বিশ্বে সব সময়ই খুঁজে পাওয়া যারা সমকামিতাকে উদযাপন করেছেন।

কোরানে সমকামিতার ব্যাপারে কিছু ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধিতা আছে। কোরান থেকে একদিকে আমরা যেমন দেখতে পাই আল্লাহ সমকামিতার কারণে গোটা একটা শহরকে ধ্বংস করে ফেলছেন, অন্যদিকে তিনি আবার তার পবিত্র গ্রন্থটির কয়েকটি সূরার বেশ কিছু আয়াতে (যেমন, ৫২:২৪, ৫৬:১৭, ৭৬:১৯) ধার্মিকদের জন্য বেহেস্তে উদ্ভিন্নযৌবনা হুরীর পাশাপাশি 'মুক্তা-সদৃশ' কিশোর বালকের সেবা পাওয়ারও আশ্বাস দিয়েছেন। কোরানের বর্ননা মতে, এই মুক্তা সদৃশ কিশোর বালকেরা হবে চিরতরুণ (৭৬:১৯), তাদের আভরণ হবে স্বচ্ছ রেশমের কাপড় (৭৬:২১), এবং তারা অলঙ্কৃত থাকবে রৌপ্য নির্মিত কঙ্কণে (৭৬:২২)। এদেরকে সাধারণভাবে অভিহিত হয়

---

[281] এ প্রসঙ্গে পড়ুন হাসান মাহমুদ, ইসলাম ও শারিয়া (৩য় সংস্করণ), শব্দশৈলী

গিলমান হিসেবে। বেহেস্তে গিলমানদের সত্যিকার দায়িত্ব নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও এদের কাজ যে কেবল পানীয় বিতরণে সীমাবদ্ধ থাকবে না,তা অনেক স্কলারই মনে করেন[282]। আসলে গ্রীক সভ্যতার মতোকিশোর বালকদের সাথে প্রেম করার রীতি পারস্য এবং আরব দেশগুলোতে সে সময় প্রচলিত ছিল। সে সময়কার সাহিত্য-সংস্কৃতির অনেক উপকরণেই এর উল্লেখ পাওয়া যায়। আর সেজন্যেই বেহেস্তের বর্ণনায় আয়তলোচনা হুরদের পাশাপাশি মুক্তাসদৃশ্য চিরকিশোরদের আশ্বাস দেয়া হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন।

এই ধরনের পরস্পরবিরোধিতা থাকার কারনেই সমকামিতার ব্যাপারে শাস্তিপ্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামী পন্ডিতগণ একমত হতে পারেননি, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। কোনো কোনো আইনবিদের মতে ইসলামি আইনানুযায়ী এই অপরাধের জন্যে কোনোপ্রকার নির্ধারিত শাস্তি (হুদুদ) নেই, বরং ঘটনার *তা'জির* বা গুরুত্ব বিবেচনা করে শাস্তি নির্ধারণ করতে হবে। যেমন, ইমাম আবু হানিফার মতে সডোমি ব্যভিচারের সমতুল্য নয়, সুতরাং সডোমির জন্যে কারও উপর হুদুদ শাস্তি প্রয়োগযোগ্য নয়, এক্ষেত্রে অপরাধীদের উপর তা'জিরের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করতে হবে। কিন্তু আবার ইমাম মালিকের মতে সডোমির জন্যে অপরাধীকে হুদুদ আইনানুযায়ী শাস্তি প্রদান করতে হবে, অপরাধী বিবাহিত না অবিবাহিত তা বিচার করা চলবে না। যে হাদিসের সুত্র ধরে ইমাম মালিক মৃত্যুদণ্ড প্রদানের পক্ষপাতি, সে হাদিসটি নিম্নরূপ[283] -

> আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেনঃ 'যদি তোমরা এমন কাউকে পাও যারা লুতের গোত্রের কাজ করেছে (অর্থাৎ সমকামিতা), তাদের উপরের জন এবং নীচের জন উভয়কেই হত্যা

[282] Anwar Shaikh, Islam: Sex and Violence, http://iranpoliticsclub.net/library/english-library/islam-sex01/index.htm; Also see, Syed Kamran Mirza, Islamic Heaven, http://mukto-mona.com/wordpress/?p=396 etc.

[283] Sharia the Islamic Law, 1998 by Abdur Rahman I. Doi; Publisher A.S. Noordeen, G.P.O. Box No. 10066, Kuala Lumpur, Malaysia.

করো'।

আরেক বর্ণনায় তিনি বলেছেন যে -'যে করছে এবং যার সাথে করছে- উভয়কে হত্যা কর'[284]।

আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ি এবং মহম্মদের মতানুযায়ী অপরাধী যদি বিবাহিত হয়, তার শাস্তি হবে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যু, তবে অবিবাহিত হলে *তা'জির* প্রয়োগযোগ্য।
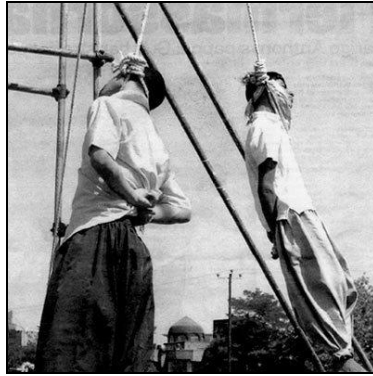
চিত্রঃ ২০০৫ সালে সমকামিতার 'অপরাধে' এমনিভাবেই দুই কিশোরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

[284] Narrated by al-Tirmidhi, 1456; Abu Dawud 38:4447; Ibn Maajah, 2561:; Classed as saheeh by Shaykh al-Albaani in Saheeh al-Jaami', no. 6589

তবে বিশেষজ্ঞদের শাস্তি নিয়ে যতই মতান্তর থাকুক না কেন, অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রে সমকামিতার শাস্তি এখনো নির্মম। উদাহরণ স্বরূপ, ইরানে বছর কয়েক আগে (২০০৫ সালে) দুজন কিশোরকে সমকামিতার অপরাধে ফাঁসি দেয়া হয় তারপর সেই লাশ শহরের সাড়া রাস্তায় ট্রাকে করে ঘোরানো হয়। সেই ছবি ইন্টারনেটে প্রকাশিত হলে সারা বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে[285]। তালিবান নিয়ন্ত্রিত সময়কার আফগানিস্তানে ১৯৯৮ সালে কান্দাহারে তিনজন পুরুষকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে হত্যা করা হয়। তাদের অপরাধ ছিল সমকামিতা[286]। ২০০৯ সালে ইরাকে গুপ্ত হত্যায় সাত মাসে বিরাশিজন সমকামী প্রাণ হারায়[287]। সমকামিতাকেন্দ্রিক বিভিন্ন নৃশংসতার ঘটনা মরোক্কো, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, সুদান, বাংলাদেশ সহ প্রায় প্রতিটি মুসলিম প্রধান দেশে অহরহই ঘটছে।

গবেষক খালেদ দুরানের সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় ইসলামী বিশ্বে সমকামিতার নানা দিক উদভাসিত হয়েছে[288]। তার মতে, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকাংশ মুসলিম সমাজে ছেলে ও মেয়ে স্বতন্ত্রভাবে লালিত হয়, এবং এদের পরবর্তী জীবনচর্চায় এই স্বাতন্ত্র্য নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। কট্টর মুসলিম রাষ্ট্রে এমনকি নারী-পুরুষ একত্রে পড়ারও সুযোগ নেই। সৌদী আরব, তালিবানী আমলের আফগানিস্তান, ইরাণ প্রভৃতি দেশগুলোর কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। এই লিঙ্গ বিভক্তিকরণ (gender segragation) সমাজের উপর অনেক সময় স্থায়ী প্রভাব তৈরি করে বলে তিনি মত দিয়েছেন। তিনি মনে করেন কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের লিঙ্গভিত্তিক বিভেদের প্রাচীর তুলে রাখায় এর প্রভাবে সমকামিতা সাময়িক সময়ের জন্য হলেও বাড়তে সহায়তা

---

[285] Execution of two gay teens in Iran spurs controvers; Saturday, July 23, 2005; http://en.wikinews.org/wiki/Execution_of_two_gay_teens_in_Iran_spurs_controversy

[286] Three Men Buried Alive Under a Pile of Stones & a Wall Pushed on Top of Them, For Sodomy in The Town of Kandahar; http://www.rawa.org/handcut.htm

[287] Militias target some Iraqis for being gay, USA TODAY, http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2009-07-28-gays-in-iraq_N.htm?csp=34

[288] Khalid Duran, Homosexuality in Islam. Homosexuality and World Religions. Valley Forge, Pennsylvania: Trinity P International, 1993. 181-197

করে। মরক্কোর ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা একটা সময় একারণেই গভীরভাবে সমপ্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ে বলে তার গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। দুরানের ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, তের থেকে বিশ বছর বয়সী ছেলেরাই ইসলামী বিশ্বে বেশি সমকামী হয়ে উঠে। তবে বিবাহিত জীবনে প্রবেশের পর এই অভ্যাস অনেকেরই ধীরে ধীরে কেটে যায়।

তবে যে কারণেই সমকামিতার উন্মেষ ঘটুক না কেন, সামাজিকভাবে সমকামিতাকে ইসলামী বিশ্বে হেয় করেই দেখা হয়। হোমসেক্সুয়ালিটি বিষয়ে ইসলামী আইন এখন পর্যন্ত মানবিক এবং যুগোপযুগী নয় বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। অন্য সবার মতোগে এবং লেসবিয়ানদেরও যে একান্তভাবেই নিজস্ব জীবন থাকতে পারে, তাদের অধিকার থাকতে পারে নিজেদের পছন্দানুযায়ী জীবন পরিচালনা করার, সেই ব্যাপারটাই ইসলামী বিশ্বে এখনো অস্বীকৃত। সমকামীদের জীবনধারা যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের অপর অংশের প্রতি ক্ষতিকর না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের অধিকারকে পদদলিত করা কিংবা কিছু ধর্মীয় অনুশাসনের নামে তাদের উপর অত্যাচার করার কিংবা তাদেরকে হত্যা করার অধিকার কারও নেই বলেই আজকের বিশ্বের সচেতন নাগরিকেরা এবং মানবাধিকার কর্মীরা মনে করে। আশার কথা এই যে, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও মুসলিমমদের মধ্যে থেকেই কিছু সংগঠন মানবিক দিকটি সামনে রেখে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে, ইন্টারনেটেও গড়ে উঠেছে বেশ কিছু ‘গে মুসলিম কমিউনিটি’। আশা করা যায় অন্যান্য ধর্মের মতোইসলামেও ধীরে ধীরে উদারনৈতিক হাওয়া লাগবে এবং সমকামীদের প্রতি অহেতুক বিদ্বেষ পোষণ না করে বরং সমাজের বিবেকবোধকে তারা মানবতার পথে পরিচালিত করবে।

দশম অধ্যায়

সমকামিতা ও মানবাধিকার

বিজ্ঞানমনস্ক প্রগতিশীল মননই পারে সংখ্যালঘু মানুষের অধিকার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে। ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা দেখেছি অধিকার-বঞ্চিত অসহায় মানুষেরা কীভাবে দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছে। একটা সময় নারীদের মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো না। তাদের ছিল না কোনো ভোটাধিকার। একইভাবে পাশ্চিমে একটা সময় কালো মানুষদের অধিকার ছিল না সাদা চামড়ার মানুষদের সাথে এক যানবাহনে উঠবার, কিংবা একই ভোজনসভায় যোগদানের। সাদা কালো বিয়ে তো ছিল চিন্তারও বাইরে। কিন্তু মানুষই পেরেছে এই সমস্ত পুরোনো নিয়মগুলো উপড়ে ফেলে মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করতে। ভারতবর্ষেও একটা সময় দলিত এবং শূদ্রদের একঘরে করে রাখা হতো বর্ণাশ্রমের নামে। তাদের হাতের ছোঁয়া লাগলেই গঙ্গাজলে স্নান করার জন্য দৌড় লাগাতো উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। চাকরি বাকরিসহ নানা জায়গায় তো হেনস্তা আর বঞ্চনা ছিলই। এখনো যে পরস্থিতি পুরোপুরি বদলেছে তা নয়, কিন্তু তারপরও আগের মতো আর নির্বিচারে অত্যাচার করা অনেকক্ষেত্রেই আর সম্ভব হয় না। আসলে বিশ্বজুড়ে সংখ্যালঘুরা তাদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হয়েছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

সমকামীরা আজকের বিশ্বে সংখ্যালঘু, খুব প্রকটভাবেই সংখ্যালঘু। আমাদের মতো দেশ গুলোতে তো বটেই, সাড়া বিশ্বেই মোটামুটি তাদের অবস্থা সংকটাপন্ন।

তাদের গায়ে 'বিকৃত রুচির' তকমা এঁটে দেয়া তো হচ্ছেই, অনেক দেশেই তাদের দাঁড়াতে হচ্ছে আদালতে। অভিযুক্তদের ওপর ক্রমাগত এবং যত্রতত্র চলছে নির্যাতন। কখনোবা রাষ্ট্রীয়ভাবেই দেয়া হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড কিংবা নির্বাসন। সমকামীদের একটা বড় অংশকেই সেজন্য লুকিয়ে থাকতে হয়, তাদেরকে শিখে নিতে হয় বিষমকামী হিসেবে জীবন যাপনের অভিনয়ের, কিংবা সামাজিকভাবে অভ্যস্ত হতে হয়ে 'বিবাহিত জীবন যাপনে'। ১৯৫১ সালে ডোনাল্ড ওয়েবস্টার কোরি 'দা হোমোসেক্সুয়াল ইন আমেরিকা' নামের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রথমবারের জন্য যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেগুলো এমনকি আজকের দিনের সমাজের জন্যও খুবই প্রাসঙ্গিক [289] –

> 'We who are homosexuals are a minority, not only numerically, but also as a result like status in society... Our minority status is similar, in variety of respects, to that of national, religious and other ethnic groups: in the denial of civil liberties; in the legal, extra-legal and quasi-legal discrimination; in the assignment of an inferior social position; in the exclusion from the mainstream of life and culture'

যদিও প্রেক্ষাপট বিচারে ১৯৫১ সালের সাথে আজকের বিশ্ব পরিস্থিতির বিস্তর ফারাক, তারপরেও সংখ্যালঘুর তকমা সমকামীদের গায়ে কিন্তু রয়েই গেছে – কি পূবে, কি পশ্চিমে। আর রক্ষণশীল সমাজে তো সমকামীদের অস্তিত্ব স্বীকারই করা হয়না একেবারে। খোদ ইরানেই ১৯৭৯ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত ৪০০০ ব্যক্তিকে সমকামিতার অযুহাতে হত্যা করে হয়েছে[290]। পশ্চিমা 'উন্নত বিশ্বে' মানবাধিকার হয়ত এরকম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পর্যায়ে আর নেই, কিন্তু তারপরেও সমকামী এবং রূপান্তরকামীরা যে সেখানে পরিপূর্ণ শান্তিতে বসবাস করতে পারছে তা বলা যাবে না। আমেরিকার প্রায় চল্লিশটি রাজ্যে সমকামীদের কোনো কারণ না

---

289 Donald Webster Cory, The Homosexual in America: A Subjective Approach, Ayer Co Pub.
290 Violence against LGBT people, From Wikipedia, the free encyclopedia,

দেখিয়ে বিভিন্ন সময়ে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালের একটি জরিপে পাওয়া গিয়েছে যে, কর্মচারীদের মধ্যে কোনো সমকামী থাকলে শতকরা প্রায় ১৮ শতাংশ ম্যানেজার তাকে চাকুরি থেকে বহিস্কার করবেন, শতকরা প্রায় ২৭ শতাংশ ম্যানেজার চাকুরিতেই তাকে নেবেন না, আর শতকরা ২৬ ভাগ তাকে কোনো রকম প্রমোশন দেবেন না[291]। ১৯৮৪ সালে আমেরিকার একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিল যে সমকামীপ্রবৃত্তি সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে অন্তত পাঁচগুন বেশি স্কুল থেকে ঝরে পড়ে, কারণ তারা সবসময়ই নিরাপত্তাজনিত আতঙ্কে ভোগে[292]। ১৯৯৮ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আমেরিকায় এখনো প্রায় শতকরা ৫৪ ভাগ লোক মনে করে সমকামিতা হচ্ছে 'পাপ', এবং ৫৯ ভাগ মনে করে এটি নৈতিক দিক দিয়ে অপরাধ, ৪৪ ভাগ মনে করে সমকামী সম্পর্ককে অবৈধ ঘোষণা করা উচিৎ[293]। আর এ সবের বাইরে তো নিগ্রহ, নির্যাতন এবং ক্ষেত্র বিশেষে হত্যার উদাহরণ তো কমবেশি আছেই। ২০০৩ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আমেরিকায় শুধু সেই বছরেই ছয় জন পুরুষ এবং নারীকে সমকামিতার অযুহাতে মেরে ফেলা হয়েছিল।

তবে সাম্প্রতিককালে বিশ্বকে সবচেয়ে আলোড়িত করেছে আমেরিকায় ম্যাথু শেফার্ড নামের ২১ বছর বয়সী এক ছাত্রকে হত্যার ঘটনা। ওয়াইমিং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্র ১৯৯৮ সালের ৭ই অক্টোবর রাতে বার থেকে ফেরার পথে পরিচয় ঘটে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র জেমস ম্যাককিনি এবং রাসেল হ্যান্ডারসনের। ম্যাককিনি এবং হ্যান্ডারসন তাদের গাড়িতে করে ম্যাথু শেফার্ডকে ছাত্রাবাসে পৌঁছে দেবার নিশ্চয়তা দিয়ে তাদের গাড়িতে উঠায়। গাড়িতে উঠার পর যখন ম্যাককিনি

---

[291] A survey of 191 employers revealed that 18% would fire, 27% would refuse to hire and 26% would refuse to promote a person they perceived to be lesbian, gay or bisexual. --Schatz and O'Hanlan, "Anti-Gay Discrimination in Medicine: Results of a National Survey of Lesbian, Gay and Bisexual Physicians," San Francisco, 1994.

[292] National Gay and Lesbian Task Force, "Anti-Gay/Lesbian Victimization," New York, 1984.

[293] The Advocate, Feb 4, 1997.

এবং হ্যান্ডারসন জানতে পারে যে ম্যাথু শেফার্ড সমকামী, তখন তারা ম্যাথুর উপর চড়াও হয়, পিস্তলের বাট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে, মারধোর করে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে রাস্তায় অচেতন অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। তারপর তারা অচেতন ম্যাথু শেফার্ডের কাগজপত্র থেকে পাওয়া ঠিকানা দেখে গাড়ি নিয়ে ম্যাথু শেফার্ডের বাড়ি লুট করে। প্রায় আঠারো ঘণ্টা পরে ম্যাথুকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করা হয় এবং পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নেয়া হয়। ম্যাথু তখনো মারা যাননি, কিন্তু অচেতন ছিলেন। ডাক্তারের রিপোর্টে দেখা গেলো তার মস্তিষ্কের একটা বড় অংশ (ব্রেন স্টেম) মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার হৃৎপিন্ডের সঞ্চালন, তাপমাত্রা ইত্যাদিও মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। তাকে কৃত্রিম জীবন সঞ্চালন যন্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু ম্যাথুর জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৮ সালের ১২ই অক্টোবর ম্যাথুকে ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করলেন। ম্যাথুর এই ঘটনার প্রভাব পড়ে আমেরিকা জুড়ে। প্রতিবাদের ঝড় উঠে সমকামী অধিকার সংগঠনগুলোর তরফ থেকে। এই একবিংশ শতকেও কেবল সমকামী হবার কারণেই ম্যাথু শেফার্ডকে যেভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে, সেটি আসলে কল্পনাকেও হার মানায়।

আর আমাদের দেশে তো সমস্যা আরো ভয়াবহ। যদিও নিরপেক্ষ গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে সারা দেশে ৬ থেকে ১২ মিলিয়ন সমকামীর অস্তিত্ব রয়েছে[294], তারপরেও সেখানে বলতে গেলে সমকামীদের অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়। কারণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে এটাকে ‘অপরাধ’ হিসেবে গণ্য করা হয়, এই অপরাধের শাস্তি ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড থেকে শুরু করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড[295] - যদিও এই আইনের ব্যাপক প্রয়োগ দেশে খুব একটা লক্ষণীয় নয়। এর কারণ, সমকামীরা নিজেদের যৌনপ্রবৃত্তিকে সাধারণত প্রকাশিত হতে দেয় না। সামাজিক বাধার

[294] Afsan Chowdhury’s report in Himal Magazine, May 2004; republished in Mukto-Mona: http://www.mukto-mona.com/ Articles/tapan_rabi/ gay_bangla 210106.htm

[295] According to Article 377 (Section 377 of the Penal Code) private, adult homosexual sex acts are illegal and will be punished with deportation, fines and/or up to 10 years, sometimes life imprisonment.

কারণেই এটি ঘটে। একটা উদাহরণ দেই। আমার খুব কাছের এক পরিচিত বন্ধু ছিল সমকামী। কিন্তু কখনোই আমি তা জানতে পারিনি। হঠাৎ একদিন শুনলাম অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে। এখন থাকছে এক সমকামী পার্টনারের সাথে। তার এই সমকামী প্রবৃত্তির কথা আমি দেশে থাকতে জানতেও পারিনি। আমি নিঃসন্দেহ অনেকেই এ ধরনের কম বেশি ঘটনার সাথে সম্যক পরিচিত। দেশে অধিকাংশ সমকামীদের আসলে লুকিয়ে থাকতে হয়, কিংবা অন্য সবার মতো বিবাহিত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হতে হয়। যারা এটা পারেন না, তারা অনেকে অবিবাহিতই থেকে যান। আমাদের মুক্তমনা সাইটে বছর কয়েক আগে পিঙ্কু নামে এক ভদ্রলোক তার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি বিশ্লেষণধর্মী লেখা লিখেছিলেন, তার প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'Gays and Lesbians: the hidden minorities of Bangladesh'। তার সেই প্রবন্ধটির উপসংহার ছিল এরকম[296] –

> আমি বহু সমকামী লোকজনদের জানি যারা বিয়ে করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসার করে চলেছেন। অধিকাংশ সময়েই তারা জীবনভর গোপনীয়তা অবলম্বন করে কাটান। তারা এমনকি তাদের খুব ঘনিষ্টজন – স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব, অভিভাবক, সন্তান – সবার থেকেই নিজের প্রবৃত্তি সারাটা জীবন ধরে গোপন করে চলতে বাধ্য হন। আসলে তারা বেড়ে উঠেন একদম একাকী হয়ে। তাদেরকে কেউ জানে না, যদিও চেনে তাদের সবাই। অন্তত এভাবেই আমাদের সমাজ তাদেরকে চিনতে চায়।

হিমেল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত আফসান চৌধুরীর রিপোর্টে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়[297] –

> Being gay in Bangladesh isn’t easy because society responds

[296] Pinku, Dhaka Diary: Gays and Lesbians: the hidden minorities of Bangladesh; http://www.mukto-mona.com/Articles/pinku/gay_bd.htm

[297] Afsan Chowdhury’s report in Himal Magazine, পূর্বোক্ত।

differently to sexuality in public and in private … People involved with gay issues say that between 5 to 10 percent of the population is homosexual. That would mean at least 6 to 12 million Bangladeshis, more than the total population of many countries, prefer the same sex. Even if that estimate is considered to be on the higher side and is reduced by half, the number left would still be significant … One of the reasons that homosexuality is treated so gingerly is that the country's Criminal Code decrees sodomy (homosexuality or advocacy of the same) a crime which is punishable with a jail sentence … Demonstration of homosexual tendencies for short periods is quite common in Bangladeshi society. Those practising it are not ostracised, although if caught, are ridiculed …

'নিভৃত সমকামী'দের বেদনাময় জীবন কাহিনী অনেকসময় কেবল ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে সীমাবদ্ধ থাকে না। সমকামী প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়ে পড়লে অনেক সময় পরিবারের পক্ষ থেকেই নেমে আসে নির্যাতন এবং নিপীড়ন। যেমন, ইন্টারনেটে গে-বাংলা ইয়াহুগ্রুপের কো-মডারেটর জন এশলের -এর একটি মর্মন্তুদ ই-মেল প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে[298]। ই-মেইলটি এরকম -

প্রিয় বন্ধুরা,
আশা করি তোমরা ভালো আছ, কিংবা অন্তত ভালো থাকার অভিনয় করে যেতে পারছ। আমি জন, বাংলাদেশের *ব্যাগ* (বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর গে'স)-এর কো-মডারেটর। আমি সমকামী এবং এজন্য আমি গর্বিত। কিন্তু আমি মোটেই সুখি নই। কারণ আমার বাসার সবাই আমার সমকামী প্রবৃত্তির ব্যাপারটা জেনে গেছে। তারা প্রথমে এ ব্যাপারটিতে তেমন গা করেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের মুখোশ খুলে গেছে। আমি তোমাদের গ্রুপে বেশ অনেকদিন হলো লিখতে পারছি না। কারণ আমাকে আমার পরিবার থেকে

[298] Ashok DEB, A text book case how sexuality is enforced upon in Bangladeshi society,

শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। আমি আহত হয়েছি। নিরূপায় হয়ে আমি একদিন পুলিশ স্টেশনে গেলাম। কিন্তু পুলিশ কোনো কেস ফাইল করতে কিংবা জিডি করতে দেয়নি। আমাকে উল্টো বলল -'তুমি তো দেখছি একটু মেয়েলি ধরনের। ঠিক করে বল - তুমি কি কোতি[299], ড্রাগসেবী নাকি বেশ্যা? আমরা তোমাকে কোনো ফাইল-টইল কিংবা জিডি করতে দেব না। এগুলো তোমাদের মামুলি পারিবারিক ব্যাপার। এ সমস্ত ফালতু বিষয়াদি নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনা। 'তারপর তারা আমার বাবাকে ফোন করে বলল আমাকে বাসায় (মানে নরকে) নিয়ে যেতে। বাসায় নিয়ে যাওয়ার পথেই আমার বাবা, মা বোন এমনকি আমার ছোটভাই পর্যন্ত আমাকে মারতে শুরু করে। আমি হয়ত মরেই যেতাম যদি না আমার পাশের বাসার এক বন্ধু এসে বাঁচাতো। এখন আমার অবস্থা একটু ভালোর দিকে। তারা আমাকে এখন বলছে বাসা ছেড়ে চলে যেতে। আমাকে সাত দিন সময় দিয়েছে বাসা ছাড়ার। আমার পার্টনার এ দেশে থাকে না। সুতরাং সে এ ব্যাপারে একেবারেই নিরূপায়। এখন আমাকে তোমরা বলো - সমকামী মানে কি সুখী নাকি অসুখী? তোমাদের মধ্যে কি কেউ বলতে পারে, কবে এই গৃহস্থালির অত্যাচার আর নিপীড়ন বন্ধ হবে? কখন আমরা সোনার বাংলা আর গে-বাংলা পাব, বলতো? বন্ধুরা, আমাদের অনেক পথ যেতে হবে। আমাদের যাত্রা কিন্তু শেষ হয়নি বরং কেবল শুরু, এবং আমরা এখনো আমাদের গন্তব্য কোথায় তা জানি না। বন্ধুরা তোমরা নিজেদের যত্ন নিও, আর ভালো থাকার অভিনয় করে যেও এমনকি তোমার নিজের পরিবার, সমাজ, ধর্ম এবং রাষ্ট্র দ্বারা নির্যাতিত হবার শেষ সময়গুলোতেও। এখন যাই। তোমাদের পিঙ্ক স্যালুট,

সলিডারিটি

জন, কো-মডারেটর।

---

[299] ভারতে এবং বাংলাদেশে পুরুষ রূপান্তরকামীদের চলতি ভাষায় বলা হয় কোতি।

বিচ্ছিন্নতা এবং আত্মহনন

সামাজিক নির্যাতন এবং নিপীড়নের পাশাপাশি কয়েকটি বিষয় সমকামীদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা হলো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা, বিষন্নতা এবং আত্মহনন। ব্যাপারটি সব দেশের জন্যই কমবেশি প্রযোজ্য। আমাদের মতোদেশগুলোতে এটি আরো বেশি। সমকামিতা, রূপান্তরকামিতা এবং সর্বোপরি জেন্ডার ইস্যু নিয়ে আমাদের সমাজে কোনো স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় সমকামীদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। কৈশরের গোড়া থেকেই সমস্যা শুরু হয়। এ সময় সে লক্ষ করে যে, সমবয়সী অন্যান্য বন্ধুদের মতো সে নারীদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে না, করে ছেলেদের প্রতি। অপরদিকে একজন রূপান্তরকামী ছেলের মধ্যে বিপরীতলিঙ্গের আচরণ অনুকরণ করার তীব্র স্পৃহা জাগে। ছেলের আচরণ ও পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে বিপরীতলিঙ্গের ভাব ফুটে ওঠায় মা-বাবা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েন, নানা ভাবে তাকে বিরত রাখতে চান। সমগ্র আচরণের মধ্যে মেয়েলিভাব প্রকট হয়ে উঠায় সহপাঠী এবং সহযোগীদের কাছ থেকে ক্রমান্বয়ে আসতে থাকে নানারকমের ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ এবং লাঞ্ছনা। পরবর্তীকালে এর থেকে তৈরি হয় নানা ধরনের ট্রমা। এই ট্রমাই তৈরি করে নানা ধরনের মানসিক সংকটের বীজ। ধীরে ধীরে তারা অন্তর্মুখী হতে থাকে। তারপর একটা সময় যখন শরীরে এবং মনে যৌনতার উন্মেষ ঘটতে থাকে তখন মানসিক পরিস্থিতি হয় আরো ভয়াবহ। এই সময় তার সমলিঙ্গের মানুষের সাথে মিলিত হবার বাসনা জাগে। সংখ্যাগরিষ্ঠরা যেখানে বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের প্রতি আসক্ত এবং আকর্ষিত হয়ে চলেছে, সেখানে নিজেকে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখে মুষড়ে পড়ে। ভাবে, তার নিশ্চয় শরীরে বড় কোনো অসুখ আছে, ফলে তার যৌন চাহিদা আর দশটা মানুষের মতো নয়। জন্ম হয়ে সংশয়ের তারপরে হীনম্মন্যতার। মূলস্রোতের বিষমকামী জীবনে অভ্যস্ত সকলের থেকে অনেক সময়ই কথা চেপে যেতে বাধ্য হয়।

ধরা যাক, কয়েকজন ছেলে কলেজের সামনে অন্যান্য বন্ধুদের সাথে মিলে চায়ের স্টলে বসে আড্ডা মারছে। এমনি সময় স্টলের সামনে দিয়ে কোনো সুন্দরী মেয়ে

হেটে গেলো। আর সাথে সাথেই শুরু হলো মেয়েটিকে নিয়ে দলের মধ্যে তুমুল আলোচনা। কিন্তু সমকামী ছেলেটি ওই দলের মধ্যে থেকেও আলোচনায় অংশ নিতে অক্ষম। সে অন্য সবার মতোপারে না ওই চলে যাওয়া তন্বী তরুনীর দেহ-সৌষ্ঠব নিয়ে বাকি সদস্যদের মতো আমোদিত হতে। হয়ত সে আমোদিত হয় দলেরই অন্য একটি ছেলেকে দেখে। কিন্তু নিজের এই 'অস্বাভাবিক' ভালো লাগার কথাটি সে কখনোই বলে উঠতে পারে না। আর এই না-পারা থেকে তৈরি হয় ভয়াবহ অন্তর্দ্বন্দ্বের। সৃষ্টি হয় নানা রকম মানসিক সংকট। ধীরে ধীরে তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধ জেগে উঠে। মানসিকভাবে সে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে আসে বিষন্নতা। নিজের যৌনপরিচয়ের তীব্র সংকট তাকে বিষন্নতার দিকে ঠেলে দেয়। এর উপর মড়ার উপর খারার ঘা হয়ে নেমে আসে পারিবারিক বঞ্চনা, উপেক্ষা, অবহেলা এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে নির্যাতন।

নিজের যৌনপরিচয়ের সংকট এবং তার পাশাপাশি কাছের মানুষ এবং সমাজের নেতিবাচক মনোভাব এবং অবমাননাকর পরিস্থিতি তাকে নিদারুণ বিষন্নতার মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। আর এই বিষণ্ণতার পথ ধরে শেষ পর্যন্ত আসে আত্মহননের চিন্তা, অন্তত অনেকের মধ্যেই। প্রতিবছর আমেরিকাতে গড়ে পাঁচ হাজার লোক আত্মহত্যা করে, আর এর মধ্যে প্রায় ত্রিশ শতাংশই সমান্তরাল যৌনতার মানুষ। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত এ রিপোর্টে[300] এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সমান্তরাল যৌনতার মানুষেরা সামাজিক অবহেলার কারণে বিষন্ন এবং উদ্বিগ্ন থাকে তা এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টে আরো উল্লেখ হয় যে, কৈশোর এবং যৌবনেই সমকামীরা সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা করে। এর কারণ সহজেই অনুমেয় এবং উপরের আলোচনাতেও এ নিয়ে বেশ কিছু ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য এ রিপোর্টটি সহজে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি। মার্কিন আইনসভার রিপাবলিকান দলের সদস্যরা এই রিপোর্টটি যাতে প্রাকাশিত না হয়, তার জন্য নানা রকমের চেষ্টা করেছিলেন। সে সময় চাপে

[300] Report of the Secretary's Task Force on Youth Suicide, 1989

পড়ে তৎকালীন বুশ প্রশাসন এই রিপোর্ট প্রকাশে বিলম্ব ঘটায়[301]। এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সমালোচনামূলক লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। তাই একসময় সরকার রিপোর্ট প্রকাশে বাধ্য হয়। এ ছাড়া গ্রে রেমাফেডির ১৯৯১ সালে লেখা 'Death by Denial: Studies of Preventing Suicide in Gay and Lesbian Teenagers' বইয়ে ১৫০ জন স্ত্রী ও পুরুষ সমকামীর উপর সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এ থেকে জানা যায়, এদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ কৈশোরের কোনো না কোনো সময় আত্মহননের প্রবনতা প্রদর্শন করে।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি প্রাসঙ্গিক গবেষণার কথা উল্লেখ করা যায়। সানফ্রান্সিস্কোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফর এইডস প্রিজারভেশন স্টাডিস' এর গবেষকেরা ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে লস এঞ্জেলেস, সানফ্রান্সিসকো, শিকাগো এবং নিউইয়র্ক শহরের ২৮৮১ জন সমকামীর উপর সমীক্ষা চালান। সমীক্ষায় দেখা গেছে, সমকামীদের মধ্যে যাদের বার্ষিক আয় ২০,০০০ ডলারের কম, তাদের শতকরা ৩৩ ভাগের মধ্যে কোনো না কোনো সময়ে আত্মহননের প্রবণতা জাগে। আর শতকরা ২২ ভাগ আত্মহননের চেষ্টা করে। অন্যদিকে যাদের বাৎসরিক আয় ৮০,০০০ ডলারের বেশি, তাদের মধ্যে শতকরা ১৯ ভাগ আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে উঠলেও শতকরা ৯ ভাগ আত্মহননের চেষ্টা করেও বেঁচে যায়।

এ ছাড়া ১৯৯৮ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে আমেরিকার 'সেন্টারস ফর ডিজিস কন্ট্রোল' (সিডিসি) আমেরিকার কয়েকটি বড় শহরে কিশোর কিশোরীদের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখে যে, প্রতি বছর যে সব কম বয়সীরা আত্মহত্যার চেষ্টা করে বেঁচে যায় তাদের মধ্যে শতকরা ত্রিশ ভাগই সমকামী। ২০০৭ সালের

---

[301] In 1989, the U.S. Department of Health and Human Services issued a stunning report on youth suicide, with a chapter on gay and lesbian youth suicide. Pressure from anti-gay forces within the Bush/Quayle administration led to suppression, not only of the controversial chapter, but also of the entire report; www.leaderu.com/jhs/labarbera.html

সাম্প্রতিক একটি গবেষণাতেও সমামিতার সাথে উচ্চহারে আত্মহননের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে[302]।

বিষন্নতা এবং আত্মহনন সমকামীদের জন্য সমস্যা হলেও এগুলো মোটেই বিভীষিকা নয়। সামাজিক পরিবেশের মানোন্নয়ন করে এগুলো থেকে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মুক্ত করা সম্ভব। দেখা গেছে, সমান্তরাল যৌনপ্রবৃত্তির মানুষেরা যে পরিবেশে নিজেদের 'স্বাভাবিক মানুষ' হিসেবে ভাবতে পারে, সে পরিবেশে এমনিতেই আত্মহননের প্রবণতা অনেক কমে আসে। এটি নিঃসন্দেহ যে, সমকামীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিদারূণ বৈরী পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আমাদের মতো দেশগুলোতে যেখানে সমকামিতাকে সামজিকভাবে হেয় করা হয়, আর আইনগতভাবে অন্যায় হিসেবে দেখা হয়, সেখানে আত্মহননের প্রবণতাকে প্রতিহত করা দূরূহ ব্যাপার। ছোট বেলায় আমাদের স্কুলে মাসুদ রানা নামে আমাদেরই ক্লাসে একটি ছেলে পড়তো পরে ক্যাডেট কলেজে চলে যায়। তার ঘনিষ্ট বন্ধুদের কাছ থেকে শুনতাম মাসুদ নাকি সমকামী। এর কিছুদিন পরেই মাসুদের আত্মহত্যার খবর পাই। আমি ছেলেবেলায় যে এলাকাতে বড় হয়েছি, সেখানেও একটি ছেলে ছিল, আমার চেয়ে দু চার বছরের বড়। ছেলেটিকে এলাকায় 'একটু মেয়েলি' বলে খোঁটা দেয়া হতো। ছেলেটি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সাথে থাকতে এবং তাদের সাথে খেলাধূলা করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতো। আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি ছেলেটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। এ ধরনের বহু ঘটনাই লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। ২০০৪ সালে আমি ভারতের একটি পত্রিকায় একটি আত্মহত্যার খবর দেখেছিলাম, পরে আরেকটি বইয়ে এর উল্লেখ পাই [303] -

---

[302] Kathyrn H. Don and Yezzennya Castro. "The assessment, diagnosis, and treatment of psychiatric disorders in lesbian, gay, and bisexual clients," in Julia D. Buckner, Yezzennya Castro, Jill M Holm-Denoma, and Thomas E Joiner Jr. (eds), Mental Health Care for People of Diverse Backgrounds. Radcliffe Publishing, 2007, p. 52

[303] অজয় মজুমদার, নিলয় বসু, সমপ্রেম, পূর্বোক্ত।

২৬ শে নভেম্বর ২০০৪ তারিখে সকাল ১০ টা নাগাদ উত্তর ২৪ পরগণার বনঁগা স্টেশনের কিছু দূরে অপর্ণা বিশ্বাস (২০) এবং কাজলী ঘোষ (১৮) নামে দুই তরুণী একসঙ্গে ট্রেনের নীচে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই দুই তরুণী ছিলেন সমপ্রেমী। এরা একে অপরকে ভালোবাসতেন গভীরভাবে।
তাদের লেখা সুইসাইড নোট থেকে সমপ্রেমের মর্মান্তিক পরিণতির কথা জানা যায় -

মা আমার তুমি ক্ষমা করো।
আমি কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেলাম। কিন্তু কি করবো মা, আমি যে কাজলীকে খুব ভালোবাসি, ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। এমনকি ও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না; তাই আমরা দুইজনে মৃত্যুপথ বেছে নিলাম। আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

ইতি
অপর্ণা ও কাজলী

আমাদের একটাই অনুরোধ আমাদের ভালোবাসার দাবি হিসেবে একটাই অনুরোধ আমাদের দু'জনকে একই শশ্মানে দাহ করবে, এই আমাদের শেষ ইচ্ছা।

সমকামিতা এবং এইডস

আত্মহত্যা ছাড়াও আরো একটি স্বাস্থ্যগত মিথ্যা প্রচারণার বিষয়ে সমকামীদের প্রতিনিয়ত যুঝতে হয়। সেটি হলো এইডসের সাথে সমকামিতার অনুমিত সম্পর্ক। অনেকেই ভুলভাবে মনে করেন, সমকামিতার মতো বিকৃত যৌনতার কারণেই বোধহয় এইডস হয়ে থাকে। আমার এই বইয়ের কিছু অংশ যখন ধারাবাহিকভাবে মুক্তমনা এবং সচলায়তন ব্লগে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন দু এক জন পাঠক তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছিলেন সমকামিতার মাধ্যমে যেহেতু এইডস ছড়ায়, তো আমি এ ব্যাপারটা কীভাবে দেখি। এর প্রেক্ষিতে আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম তা এখানেও ব্যক্ত করা প্রয়োজনবোধ করছি।

এইডস ছড়ায় এইচ. আই. ভি (এইডস ভাইরাস হিসেবে প্রচলিত) থেকে। বাহক এবং তার যৌনসঙ্গীর দেহে এইডস ভাইরাস না থাকলে বাহক সমকামী হোক আর বিষমকামী হোক, এইডস ছড়াবে না। সমকামিতার কারণে, কারো দেহে 'এইডস'-এর জীবানু জন্ম নেয় না। কাজেই সমকামিতাকে আলাদাভাবে অহেতুক দোষারোপ করার কোনো কারণ নেই। আর সুরক্ষিত যৌনজীবন না থাকলে সমকামী এবং বিষমকামী - যে কেউই এইডসে আক্রান্ত হতে পারে। সেজন্যই আমরা দেখি পতিতাপল্লিতে এইডসের সংক্রমণ বেশি, যদিও সেখানে খুব কম বাহকই সমকামী।

সমকামিতার সাথে এইডসের সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও এইডসকে সমকামিতার সাথে ট্যাগ করে দেওয়ার একটি ইতিহাস আছে। আশির দশকের প্রথম দিকে যখন এইডসের কথা প্রাথমিকভাবে মিডিয়ায় প্রকাশিত হতে শুরু করলো, তখন, সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি চিকিৎসক এবং গবেষকরাও এই রোগের মূল কারণ সম্বন্ধে বলতে গেলে অজ্ঞই ছিলেন। আমেরিকায় সমকামীদের মধ্যে এই রোগের হার বেশি লক্ষ করে 'বিশেষজ্ঞ'রা ধরে নিয়েছিলেন এটা বোধ হয় 'সমকামিতা সংক্রান্ত' কোনো রোগ হবে। রোগটির নামও তারা ঠিক করে রেখেছিলেন

– Gay-related immune disorder (GRID)। প্রচলিত নাম ছিল ‘Gay plague’[304]। তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের এই অবিশেষজ্ঞীয় এবং অবিবেচনাসুলভ অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে সে সময় সাধারণ মানুষদের মনে সমকামীদের সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয়। এমনিতেই তো সমকামীদের উপরে ‘বিকৃত যৌনাচরণের’ তকমা লাগানোই ছিল, তখন এইডসের সাথে সমকামিতার সম্পর্ক ‘খুঁজে পাওয়ার’ ফলে সমকামীসহ সকল সমন্তরাল যৌনতার মানুষদের উপর নেমে আসতে থাকে অবর্ণনীয় নির্যাতন। বিশেষ মহল থেকে সমকামীদের একঘরে করে ফেলার প্রচেষ্টাও চলে। কিন্তু পরবর্তীতে গবেষণার অগ্রগতির সাথে সাথে চিকিৎসকেরা জানতে পারেন যে, এইডস নামক মরণব্যাধিটির পেছনে কারণ হলো একটি ভাইরাস - Human Immunodeficiency Virus বা সংক্ষেপে ‘*এইচ.আই.ভি*। এই এইচ. আই. ভি. ছড়ায় রক্ত, বীর্য (semen), যোনি প্রবহ (vaginal fluid), এমনকি বুকের স্তন্যপানেও। দেখা গেছে, বাহকের দেহে *এইচ.আই.ভি*র জীবাণু থাকলে সমকামী যৌনসংসর্গে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ঠিক ততটুকুই যা বিষমকামী যৌনসংসর্গেও ঘটতে পারে।

এটা ঠিক আমেরিকায় সমকামীদের মধ্যে এইডস রোগের হার বেশি, এখনো[305]। কিন্তু এর পেছনে সমকামিতা যতটা না দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট[306]। পৃথিবীর অন্য অনেক দেশেই সমকামীদের চেয়ে বিষমকামীদের মধ্যে এইডসের হার বেশি। আফ্রিকা মহাদেশটির কথা ভাবা যাক। হতদরিদ্র মহাদেশ -

---

[304] Randy Shilts, And the Band Played On: Politics, People, and the AIDS Epidemic, Stonewall Inn Editions, 2000

[305] As of 1998, fifty-four percent of all AIDS cases in the United States were homosexual men, during the year 2003, the Centers for Disease Control (CDC) estimated that about 63% were among men who were infected through sexual contact with other men

[306] পাশাপাশি সমকামীদের সম্পর্কের বৈধতা এবং আইনি অধিকার অনেক জায়গাতেই না থাকায়, তাদের অনেককেই নির্বিচারী এবং বহুগামী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে হয়। পরিস্থিতির কারণেই তাদের অনেকেরই যৌনজীবন অধিকাংশ বিষমকামীদের মতো সুরক্ষিত থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে এইডসের হার তুলনামূলকভাবে বেশি থাকতে পারে। এর জন্য সমকামিতা দায়ী নয়, দায়ী সমকামিতাকে কেন্দ্র করে মানবসৃষ্ট সামাজিক পরিবেশের জটিলতা।

অথচ এইডসের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। ওখানে সমকামিতার জন্য এইডস ছড়ায়নি। বতসোয়ানার শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ যুবক-যুবতী এখন এইডস আক্রান্ত। সাউথ আফ্রিকায় শতকরা প্রায় ১৯ ভাগ। তাঞ্জানিয়ায় এমন গ্রামও আছে যেখানে গ্রামের প্রায় সবাই এইডস-এ আক্রান্ত। সেই হতভাগ্য শিশুটির কথা ভাবুন, যে কিনা এইচ. আই. ভি. জীবাণু নিয়ে জন্মেছে, কেবল তার বাবা মায়ের এইডস সংক্রমণের কারণে। আমি কি সেই শিশুগুলোর ভাগ্যহীনতার জন্য বাবা-মা'র বিষমকামকে দায়ী করব? সেই এইডস আক্রান্ত হতভাগ্য শিশুগুলোর বাবা মা তো আর সমকামী ছিল না। তাহলে গ্রাম কে গ্রাম এইডসে উজার হয়ে যাচ্ছে কেন? যুক্তি মানতে গেলে আফ্রিকার এইডসের বিস্তারের পেছনে তাহলে বিষমকামকে দায়ী করা উচিৎ। কারণ, আফ্রিকায় বিষমকামীদের মধ্যেই এইডস সংক্রমণ অনেক বেশি। শুধু আফ্রিকা নয়, বিশ্ব জুড়েই বিষমকামীদের মধ্যে এইডসের প্রকোপ সমকামীদের থেকে অনেক বেশি দেখা যায়। সত্যি বলতে কি - এইডস আসলে সমকামিতা-বিষমকামিতায় কোনো বাছ বিচার করে না। আগেই বলা হয়েছে, এইডস সংক্রমণের কারণ *এইচ.আই.ভি* ভাইরাস। আপনার বা যৌনসঙ্গীর দেহে এই জীবাণু না থাকলে এইডস আপনার মাধ্যমে ছড়াবে না, তা আপনি সমকামীই হোন, আর বিষমকামীই হোন। সেজন্যই এরিক মার্কোস তার 'ইস ইট এ চয়েস' গ্রন্থে বলেন –

> Worldwide, the majority of people who have contracted HIV have been – and are – heterosexual. HIV/AIDS does not discriminate. It's an equal opportunity disease that infects people who fail to use the well-understood methods to prevent its spread.

স্টোন ওয়াল রায়ট

সমকামিতার ইতিহাসে স্টোন ওয়াল রায়ট একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। এই রায়টির কথা না জানলে কিংবা না উল্লেখ করলে সমকামিতার ইতিহাস অপূর্ণই থেকে

যাবে। নিউইয়র্ক সিটির গ্রীনউইচ গ্রামের ক্রিস্টপার রোডের ৫১-৫৩ নাম্বারে "স্টোনওয়াল ইন" নামে একটা রেস্তরা সমকামীদের বার ও আড্ডা দেয়ার তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত ছিল বহুদিন ধরেই। ষাট-সত্তুরের দশকে এ ধরনের 'গে বার' গুলো ছিল পুলিশি হামলা এবং ধরপাকরের পয়লা নম্বর লক্ষ্যবস্তু। বলা নাই, কওয়া নাই হঠাৎ করেই পুলিশ এ ধরনের বারে এসে সমকামীদের ওপর চড়াও হয়ে গণহারে এ্যারেস্ট করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেত আর ফাটকে ঢুকিয়ে দিয়ে নিপীড়ন নির্যাতনে মেতে উঠত। আর সে সময় যাবতীয় আইন-কানুন সবই ছিল সমকামীদের বিপক্ষে।

চিত্র: ১৯৬৯ সালের স্টোনওয়াল ইন রেস্তরা
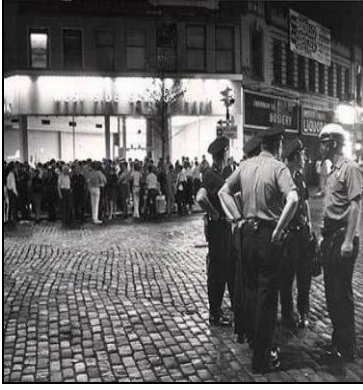
চিত্র: ১৯৬৯ সালের স্টোনওয়াল ইন রেস্তরায় গণবিক্ষোভের কিছু ঐতিহাসিক মুহূর্ত

দিনটা ছিল **১৯৬৯** সালের ২৮ শে জুন। পুলিশ খুব স্বাভাবিক নিয়মেই গ্রীন উইচের গ্রামের গে-বারটিতে হানা দেয়। সাধারণত ধরপাকরের ব্যাপারটা যেটা ঘটতো – খুবই গতানুগতিক এবং নিয়ম মাফিক। বারে হানা দিয়ে বারের সবাইকে বাইরে নিয়ে এসে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যেত। সালের ২৮ শে জুন দিনটা বোধ হয় অন্যরকম ছিল। পুলিশ বারটিতে হানা দিলে সেখানকার লোকেরা পিছু না হটে সরাসরি পুলিশের সাথে সম্মুখ- লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। থালা বাসন, গ্লাস, বোতল – যার

সামনে যা কিছু ছিল তাই নিয়েই পুলিশের মোকাবেলা করে। একটা পর্যায়ে সব পুলিশদের রেস্তরার ভিতরে আবদ্ধ করে ফেলে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়। সেই পুলিশদের উদ্ধার করতে আরো নিরাপত্তারক্ষীদের পাঠানো হয়। কিন্তু তারা আবদ্ধ সহকর্মীদের দুরাবস্থা দেখা ছাড়া খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না। জনগণ ততক্ষণে রেস্তরার আশে পাশের রাস্তাগুলো দখল করে নিয়েছে। পুলিশদের ওভাবেই আবদ্ধ করে রেখে দিনভর আর রাত জুড়ে রায়ট চলতে থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতি ছিল পুলিশের চিন্তারও বাইরে।

এর পরদিন সমকামীদের সমর্থনে গ্রীনউইচ গ্রামের আশপাশ থেকে আরো বহু লোক এবং সংগঠন এগিয়ে আসে। পুলিশদের উদ্দেশ্য পাথর ছোঁড়া থেকে আগুন জ্বালানো, পোড়ানো - কোনো কিছুই বাদ যায়নি। প্রায় চারশ পুলিশ-এর সাথে যুদ্ধ করছিল প্রায় দু হাজার সমকামী। এ এক অভাবনীয় দৃশ্য। যে সমকামীদের এতদিন কেবল মেয়েলি, ফ্যাগ প্রভৃতি খোঁটা হজম করে লুকিয়ে ছাপিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হতো, তারা একজোট হয়ে সূচনা করলেন নতুন এক আন্দোলনের- জন্ম হলো সমকামিতা মুক্তির বা ‘গে লিবারেশন’ (Gay Liberation) -এর। বস্তুত স্টোনওয়াল ইন-এর এই আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল ভবিষ্যতের আন্দোলনের শক্তি এবং সাহস। কবি এলেন গিন্সবার্গ পরে ‘ভিলেজ ভয়েস’ ইস্যুতে লিখেছিলেন -

> You know, the guys there were so beautiful. They’ve lost that wounded look that fags all had ten years ago.

স্টোনওয়াল ইন-এর প্রভাব পরবর্তীকালের আমেরিকান রাজনীতিতে ব্যাপক। নিউইইয়র্কের মেয়র জন লিন্ডসের প্রেসিডেন্টশিয়াল ক্যাম্পেইনের সামনে সমকামীরা দল বেঁধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাদের আন্দোলনের মুখে মেয়র পুলিশকে নির্দেশ দিতে বাধ্য হন - সমকামী বারে হানা দিয়ে লোকজনকে গ্রেপ্তার এবং হেনস্তা না করতে। সংখ্যালঘু যৌনপ্রবৃত্তির কারণে সমকামীরা রাষ্ট্রীয়ভাবে যে নিপীড়নের স্বীকার হচ্ছিলেন, তা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পেলেন তারা।

সমকামী অধিকার কর্মীরা এ সময় নজর দিলেন মনোবিজ্ঞানীদের দিকে, যারা বহুদিন ধরেই সমকামিতাকে এক ধরনের ‘রোগ’ হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছিলেন। এ সময় ডঃ এভেলিন হুকার এবং কিন্সের গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হতে থাকে। তাদের এই গবেষণা থেকে চিকিৎসকেরা বুঝতে পারেন যে, যৌনতার ক্যানভাস আসলে সুবিশাল। মানবজীবনের যৌনতার এই ক্যানভাসে বিষমকামীতা যেমন পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি সমকামিতাও। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের মতো সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের ব্যাপারটাও কারো কারো মধ্যে খুবই স্বাভাবিক। সমকামী হয়েও বহু লোকই সুখী জীবন যাপন করেছে – এ ধরনের বহু উদাহরণ সমকামী অধিকার কর্মীরা সামনে নিয়ে আসেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে **১৯৭৩** সালের **১৫ই** ডিসেম্বর আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোনো মানসিক ব্যধি নয়, বরং এটি যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তারা রোগের তালিকা থেকে সমকামিতাকে বাদ দিয়ে দেন। এটি যে সমকামিতার আইনি অধিকার এবং সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের লড়াইয়ে এক বিরাট মাইলফলক, এক ঐতিহাসিক বিজয় তা এ বইয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে (সপ্তম অধ্যায় দ্রঃ)।

মানবাধিকার সংগঠন এবং সাপোর্ট গ্রুপ

স্টোনওয়াল রায়টের প্রভাব শুধু আমেরিকাতেই পড়েনি, এর প্রভাব পড়েছে বিশ্ব জুড়েই। আমেরিকার মতোই ইউরোপ এবং এশিয়ার সমকামী প্রবৃত্তির লোকেরা নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। সারা দুনিয়া জুড়েই আনাচে কানাচে জায়গায় তৈরি হতে থাকে সমকামীদের নানা ধরনের সংগঠণ। সমকামী, উভকামী এবং রূপান্তরকামীদের মানবাধিকার রক্ষায় আজ এগিয়ে এসেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো খ্যাতনামা সংগঠন। বিশ্বের নিপীড়িত, বঞ্চিত, অসহায় মানুষদের সেবায় ও পুনর্বাসনে অ্যামনেস্টি তার কার্যক্রমের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে পুরোমাত্রায়। মানবাধিকার বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের কারণে অ্যামনেস্টিকে

নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয় ১৯৯৭ সালে। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে যখন সমকামিতা তথা সমান্তরাল যৌনতার মানুষদের উপর বহু নিয়ম নিষেধ শাস্তির বেড়াজালে ছিন্ন ভিন্ন হতে হচ্ছে সেখানে পুরো ব্যাপারটাকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার পক্ষপাতী অ্যামনেস্টি। তারা সমকামিতার কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংগঠিত নির্যাতন এবং নিপীড়নের কড়া প্রতিবাদ জানায়। সমকামিতা নৈতিক নাকি অনৈতিক – সেটা তাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় নয়, তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো– সমকামী যৌনপ্রবৃত্তি থাকার কারণে কেন কিছু মানুষ নিগ্রহ এবং নিপীড়নের স্বীকার হবে। ১৯৯১ সালের সভায় তাদের আন্তর্জাতিক কাউন্সিলের মিটিং-এ তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সমকামিতার কারণে যাদের কারাবরণ করতে হয়েছে, তাদের মুক্তির দাবিতে অ্যামনেস্টি সোচ্চার হবে। তারা আরো মত প্রকাশ করে যে, স্টোনওয়াল ইন-এ যে মর্মান্তিক অত্যাচার চালানো হয়েছিল ১৯৬৯ সালে, তার বলিষ্ঠ কোনো প্রতিবাদ তখন জানানো সম্ভব হয়নি। তার প্রতিদান দেবার সময় হয়েছে আজ, আর সেই লক্ষ্যেই অ্যামনেস্টি কাজ করে যাবে। ১৯৯৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অ্যামনেস্টি ইন্টারনেশনালের কার্যনিবাহী কমিটির সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেও সমকামিতার জন্য যারা পৃথিবীজুড়ে নিগৃহীত হচ্ছে, তাদের জন্য সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেবার সংকল্প নেয়া হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে, ওই সময় ব্রাজিলে দুজন আইনজীবী এক রূপান্তরকামী মানুষের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, এ কারণে তাদের জীবননাশের হুমকি দেয়া হয়। অপর একটি ঘটনায় জিম্বাবুয়ের একজন স্ত্রী সমকামী এক্টিভিস্ট একই ধরনের নিগ্রহের স্বীকার হয়েছিলেন। অ্যামনেস্টি সাংগঠনিকভাবে এই ঘটনাগুলোর সোচ্চার প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রভাব ধীরে ধীরে মার্কিন মুল্লুকেও পড়তে শুরু করে। আমেরিকা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমকামী, উভকামী এবং রূপান্তরকামীরা অত্যাচারিত এবং নির্যাতিত হলে সে দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। এ সংক্রান্ত আইন মার্কিন সিনেটে পাশ হয়েছে। কিন্তু তারপরেও এর

ধরনের বিষয়ে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য আবেদনকারীকে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়, কখনো বা হতে হয় সরকারি কর্মচারী কিংবা কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা হেনস্তা। এ ছাড়া এ ধরনের মামলায় জড়িত আইনজীবীদের রয়েছে প্রশিক্ষণের অভাব। এ ব্যাপারে সামনে এগিয়ে এসেছেন দুই প্রখ্যাত আইনজীবী রজার ডটি (Roger Doughty) এবং স্যারো ডালবেরি (Sarrow Dulberry)। যে সব আইনজীবীরা সমকামীদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে সাওয়াল করতে চান, তাদেরকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে বলে ডটি এবং ডালবেরি মনে করেন। তারা বিগত কয়েক বছর ধরে শতাধিক আইনজীবীকে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আইনজীবীরা অসংখ্য গে এবং লেসবিয়নদের আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণের আইনগত স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু আমেরিকায় নয় - ভারতেও আছে 'ইন্ডিয়া সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস ল' (India Center for Human Rights and Law) নামের একটি সংগঠন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও তৈরি হয়েছে বিভিন্ন আইনি সংগঠন। তারা সমকামীদের আইনি অধিকারের লড়াইয়ে কাজ করে যাচ্ছে নিরলস ভাবে।

একটা সময় পশ্চিমে সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। অস্কার ওয়াল্ড-এর মতো খ্যাতনামা সাহিত্যিক কিংবা এবং অ্যালেন টুরিনের মতো খ্যাতনামা বিজ্ঞানীকে সমকামিতার জন্য দণ্ড পোহাতে হয় একটা সময়। ১৮৯৫ সালে সমকামিতার দায়ে অস্কার ওয়াল্ডের বিচার ও দণ্ডপ্রদান পাশ্চাত্য সমকামিতার ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। লর্ড আলফ্রেডের সাথে ওয়াইল্ডের সমকামী সম্পর্কে ক্ষিপ্ত ডগলাসের বাবা মার্কুয়েস অব কুইন্সবেরি ওয়াইল্ডের বিরুদ্ধে পায়ুকাম বা 'সডোমি'র অভিযোগ আনেন। তিন তিনবার মামলা আদালতে ওঠে। ওয়াইল্ড আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বলেন -

> "The Love that dare not speak its name" in this century is such a great affection of an elder for a younger man as there was

between David and Jonathan, such as Plato made the very basis of his philosophy, and such as you find in the sonnets of Michelangelo and Shakespeare. It is that deep, spiritual affection that is as pure as it is perfect. It dictates and pervades great works of art like those of Shakespeare and Michelangelo, and those two letters of mine, such as they are. It is in this century misunderstood, so much misunderstood that it may be described as the "Love that dare not speak its name," and on account of it I am placed where I am now. It is beautiful, it is fine, it is the noblest form of affection. There is nothing unnatural about it. It is intellectual, and it repeatedly exists between an elder and a younger man, when the elder man has intellect, and the younger man has all the joy, hope and glamour of life before him. That it should be so, the world does not understand. The world mocks at it and sometimes puts one in the pillory for it."

এহেন বগ্মীতা সত্ত্বেও ওয়াইল্ড সেসময় দণ্ড এড়াতে পারেননি। ওয়াইল্ডের অন্যান্য যৌনসঙ্গীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাকে দু' বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

অ্যালেন টুরিন (Alan Turing) ছিলেন আঠারো শতকের বিখ্যাত গণিতবিদ এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানী। তার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের 'টুরিন টেস্টের' জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন, তাকে সমকামীতার জন্য দোষী প্রমাণ করে সায়ানাইড খাইয়ে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়া হয়। তখন তার বয়স ছিল মাত্র চল্লিশ বছর। তার অসামান্য প্রতিভাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া হয় এভাবেই এবং তা করা হয় রাষ্ট্রীয়ভাবেই। বোঝাই যায়, কী দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে সমকামী মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষদের একটা সময় যেতে হয়েছে। যে দণ্ডধারায় সে সময় ওয়াইল্ড বা টুরিনকে

দণ্ড পোহাতে হয়েছিল তা পরিচিত ছিল 'ক্রিমিনাল ল এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট' নামে। এই আইন অনুযায়ী দুই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিল। এই নিষেধাজ্ঞা ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

সে হিসেবে আজকের দিনে পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থা অনেকটাই পাল্টেছে। টুরিনের ওপর সে সময়কার অমানুষিক অত্যাচারের জন্য এতোদিন পর ২০০৯ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছে[307]। আজকের দিনে পশ্চিমা বিশ্বের সমকামী এবং রূপান্তরকামী মানবাধিকার সংগঠনগুলো যে সমস্ত লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে সেগুলো হলো –

১। সাংস্কৃতিক লিঙ্গ পরিচয়ের অধিকার,

২। সাংস্কৃতিক লিঙ্গ পরিচয়কে প্রকাশের অধিকার,

৩। সমকামী কিংবা রূপান্তরকামী মনোবৃত্তির জন্য নিগৃহীত না হবার অধিকার,

৪। সাংস্কৃতিক লিঙ্গানুযায়ী সামাজিক ক্রিয়া সম্পাদনের অধিকার,

৫। নিজের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করার অধিকার,

৬। লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রয়োজনে উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার,

৭। মানসিক রোগী হিসেবে পরিচিত না হবার অধিকার,

৮। যৌনক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যৌন প্রকৃতিকে প্রকাশ করার অধিকার,

৯। বিবাহের অধিকার,

১০। দত্তক গ্রহণ এবং পিতা-মাতা হিসেবে শিশু পালনের অধিকার ইত্যাদি।

শুধু পশ্চিমে নয়, আমাদের উপমহাদেশেও সমকামীসহ সমান্তরাল যৌনতার মানুষগুলোর অধিকার সংরক্ষণের জন্য গড়ে উঠেছে নানা সংগঠন। পত্রিকা প্রকাশ, সম্মেলন আয়োজন এবং জনমত গঠনের মধ্য দিয়ে তাদের কর্মকান্ডের ধারা প্রবাহিত

---

[307] PM apology after Turing petition, BBC coverage of Gordon Brown's apology for Turing's mistreatment by the British Government; http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8249792.stm

হচ্ছে নানা দিকে। গড়ে উঠছে মানবাধিকারের স্বপক্ষে বলিষ্ঠ আন্দোলনের রূপরেখা। রয়েছে উভলিঙ্গ মানবদেরও নানা সংগঠন। ১৯৯০ সালের জুন মাসে মুম্বই থেকে ভারত সমপ্রেমীদের প্রথম পত্রিকা 'বোম্বে দোস্ত' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক অশোক রাও কবি। তিনি ১৯৮৫ সালেই *স্যাভি* (Savvy) পত্রিকায় নিজেকে সমকামী হিসেবে ঘোষণা করেন। পরে ১৯৯৩ সালে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দেন– যা জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অশোক রাও কবির এই সাক্ষাৎকার সমকামীদের অধিকারের বিষয়টিকে সামনে এগিয়ে নেয়। এদিকে ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডনে তৈরি হয় নাজ ফাউন্ডেশনের (Naz Foundation International)। এই সংস্থার উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন শহরে সমকামীদের স্বাস্থ্যসচেতনতার জন্য নানা প্রকল্প চালু হয়। ঐ একই বছর দিল্লীর 'এইডস ভেদভাব বিরোধী আন্দোলন' (ABVA) নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভারতের সমপ্রেমীদের জীবন ও সমস্যার ওপর 'Less than Gay' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। এই গ্রন্থটি সমকামীদের সমানাধিকারের পাশাপাশি সমান্তরাল যৌনতার মানুষদের জন্য আন্দোলনের মজবুত তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে। ১৯৯১ সালেই *বোম্বে দোস্ত* পত্রিকার অনুসরণে কলকাতায় প্রকাশিত হয় 'প্রবর্তক' এবং ১৯৯৩ সালে দিল্লীতে প্রকাশিত হয় 'আরম্ভ'। এরপর কলকাতা থেকে রূপান্তরকামীদের (কোতিদের) জন্য প্রকাশিত হয় 'প্রত্যয়'। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে সমপ্রেমীদের অসংখ্য পত্রিকা। প্রবাশ থেকে প্রকাশিত 'ত্রিকোণ' নামে একটি পত্রিকা উপমহাদেশের সমকামী মানুষের আর্তি, বেদনা এবং সমস্যা তুলে ধরে এবং সেইসাথে সংখ্যালঘু সমান্তরাল যৌনতার মানুষদের প্রতি সামাজিক সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রিন্টেড মিডিয়ায় সমকামীদের অধিকার নিয়ে গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও ম্যাগাজিন প্রকাশিত হলেও ইন্টারনেটে বাংলায় ভালো রিসোর্স তেমনিভাবে ছিল না। একবিংশ শতকে সচলায়তন এবং মুক্তমনাসহ বাংলা ইউনিকোডভিত্তিক ব্লগ সাইটগুলো জনপ্রিয়তা পাওয়ার ফলে ইউনিকোডে বাংলায় এ ধরনের লেখা প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সময় ২০০৬ সালে সিরিজ আকারে প্রকাশিত হতে থাকে আমার 'সমকামিতা কি প্রকৃতি বিরুদ্ধ?' নামের

সিরিজটি। এই সিরিজটির মাধ্যমে সমকামিতাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ তৈরি হয়। প্রাণীজগতের মধ্যে সমকামিতা, উভকামিতা এবং রূপান্তরকামীতার অজস্র উদাহরণ প্রদানের পাশাপাশি আধুনিক গবেষণার আকর্ষণীয় ফলাফলগুলো প্রথমবারের মতো হাজির করা হয় বাঙালি পাঠকদের সামনে। বহু পাঠক সিরিজটি পড়তে পড়তেই মত দিয়েছিলেন যে, প্রবন্ধটি সমকামিতা সম্বন্ধে তাদের সনাতন মনোভাব বদলে দিচ্ছে। পাশাপাশি অন্যান্য ব্লগ সাইটগুলোতেও বিচ্ছিন্নভাবে বেশ কিছু সচেতন লেখকদের অংশগ্রহণ স্পর্শকাতর এই বিষয়টিকে নিয়ে তৈরি করে আলোচনা এবং বিতর্কের নতুন পরিবেশ। যে বিষয়টিকে এতদিন অজ্ঞতার অপশাসনে দীর্ণ করে রাখা হয়েছিল, ব্লগস্ফিয়ারের বিভিন্ন লেখকদের সাহসী লেখালেখিগুলো তার বস্তুনিষ্ঠ উন্মোচন ঘটালো।

এর মধ্যে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে উপমহাদেশের মানবাধিকার আন্দোলন এক নতুন দিকে বাঁক নেয়। ২০০৯ সালের জুন মাসে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৭ নং ধারা – যা সমকামকে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌন আচরণ' হিসেবে অভিহিত করেছে - 'এইডস ভেদভাব বিরোধী আন্দোলন' (ABVA) নামের সংগঠনটি এই ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করে। ABVA-এর পক্ষে রাজেশ তালওয়ার এবং শোভা আগারওয়াল সাওয়াল করেন। এই মামলার তখন নিষ্পত্তি না হলেও এর প্রভাব পড়ে দেশজুড়ে। ১৯৯৪ সালের ২৭-৩১ ডিসেম্বরে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ এশিয়ার সমপ্রেমীদের সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুভাষ সালুঙ্কি। তিনি বলেন –

> Indian is an old and proud culture and hypocrisy is ingrained in our character. We do not wish to accept that we are like any other culture on earth and that numerous kinds of sexualities exist apart from mainstream heterosexual societies.

সালুঙ্কির এই সাহসী বক্তব্য সমকামিতার আইনি স্বীকৃতি অর্জনের আন্দোলনকে

ঋদ্ধ করেছিল। যা হোক বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ২০০৯ সালের জুলাই মাসে ভারতের হাইকোর্ট সমকামিতা অপরাধ নয় বলে এক যুগান্তকারী রায় দেয়, এবং এর ফলে প্রায় দেড়শ বছরের পুরোনো ঔপনিবেশিক আইনে সমকামিতাকে যেভাবে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনতা' হিসেবে গণ্য করে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল - এ রায়ের মধ্য দিয়ে সেটির অবসান ঘটে। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টও সম্প্রতি উভলিঙ্গ মানবদের জন্য সমানাধিকারের আইন পাশ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও সমকামিতার আইনি অধিকার খুব একটা আশাপ্রদ নয়। দেশের সংবিধানের পেনাল কোড ৩৭৭ নং সেকশনে সমকামিতাকে ‘প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনতা’ হিসেবে অভিহিত করে উল্লেখ করা হয়েছে –

> “Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may be extend to ten years, and shall also be liable to fine”.

এই পেনাল কোড ৩৭৭ নং সেকশনের অংশটি সংবিধানের মূলনীতি – ‘*সকল নাগরিকের জন্য সমানাধিকার’* (Part II Article 19) এবং ‘*সকল নাগরিকের জন্য সমান আইন*’ (Part III Article 27)-এর পরিষ্কার লঙ্ঘন। শুধু তাই নয় আজকের পৃথিবীর বিশ্বমানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি চরম অন্যায়। সারা পৃথিবী আজ পুরো বিষয়টিকে যেভাবে দেখছে, তার ছিটেফোটাও রাষ্ট্রপরিচালনার কর্ণধারেরা অনুধাবন করেনি। বাংলাদেশের এক মন্ত্রী সম্প্রতি মত প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিমা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের আইন সংশোধন করার কোনো আগ্রহ আপাততঃ তাদের নেই। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' মুলনীতি হিসেবে স্থাপিত হলো– ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে সংযুক্ত হয় 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা আর বিশ্বাস'কে। উচ্ছেদ ঘটে সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ-এর; ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার সুযোগ দেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলো।

এরশাদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়ে 'ইসলাম'কে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেবার পর সমস্যা আরো ঘোরালো হয়েছে। তার পরবর্তী বছরগুলোতে অবস্থা কেবল খারাপই হয়েছে বলা যায়। বিগত জোট সরকারের আমলে ধর্ম এবং মৌলবাদকে মাত্রাতিরিক্ত তোষণ করার ফলে স্বরূপ কীভাবে বাংলা ভাইয়ের উত্থান হয়েছিল, কীভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পরিকল্পিতভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছিল, কীভাবে প্রতিটি জেলায়, সিনেমা হলে, মাজারে, উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমাবাজির মহড়া চালানো হয়েছিল তা আমরা সবাই দেখেছি। সে সময় দেশে মৌলবাদ এবং জঙ্গিবাদের উত্থান এবং বিকাশ সাম্প্রতিক সময়গুলোতে অবলোকন করেছে সবাই। একই ধারায় 'ইসলামী আইন বাস্তবায়ন সমিতি' এবং 'ইসলামী ঐক্যজোট'-এর মতো চরম রক্ষণশীল কিছু গোষ্ঠী দেশে শারিয়া আইন বাস্তবায়নের পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। জামাতে ইসলামীর মতোদলগুলোও শারিয়ার নিরবিচ্ছিন্ন সমর্থক। এদের পেছনে আছে মধ্যপ্রাচ্য এবং আরবদেশের প্রচ্ছন্ন মদদ এবং অর্থশক্তি। শারিয়াকেন্দ্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সৌদি আরব, ইরান, বাহারাইন, মাউরিতানিয়া, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিওন এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কাজেই, ওই সমস্ত দেশের মতো শারিয়া আইন দেশে কখনো বাস্তবায়িত হলে সৌদী আরব এবং ইরানের মতো প্রকাশ্য রাস্তায় সমকামীদের হত্যা করার কুৎসিৎ রীতি দেখতে হবে বলে অনেকেই মত প্রকাশ করছেন। সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদশে সমকামী আন্দোলনের কর্মীরা নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংকটের মুখোমুখি। তারপরেও আশার কথা এই যে, বয়েস অব বাংলাদেশ (বব), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর গেস (ব্যাগ) নামে দুটি গ্রুপ বাংলাদেশে সমকামিতার উপর মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করে যাচ্ছে। সখিনী নামের একটি সংগঠন কাজ করছে নারী সমকামিতার উপর। 'বাঁধন' হিজড়া সংগঠন কাজ করছে উভলিঙ্গ মানবদের পশ্চিমবঙ্গে স্যাফো, প্রত্যয়, প্লাস, পাম, কোমল গান্ধার, প্রান্তিক বনগাঁসহ বহু সংগঠন সমকামীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ইন্টারনেটে LGBTI Bangladesh, Global Gayz Bangladesh, bengayliz.com, প্রভৃতি সাইট বাংলাদেশী সমকামীদের অধিকার নিপীড়ন, ব্যথা বেদনা নিয়ে লিখছে। তবে

আমরা মনে করি সমপ্রেমীদের মানবাধিকার অর্জনের লড়াই, শুধু তাদের একারই নয়, এ লড়াইয়ে বিষমকামীদেরও সামিল হওয়া প্রয়োজন। আসলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে না পারলে আন্দোলন পূর্ণতা পাবে না। সে জন্যই মুক্তমনার মতো মানবতাবাদী সংগঠনগুলো বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের জন্য সহমর্মিতার হাত, গড়ে দিতে চাইছে আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি। আমরা আশা করব এই বইটির মাধ্যমে বাংলাদেশের সমপ্রেমীদের মানবাধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হবে। হাওয়ার প্রতিকূলে দাঁড় বাইতে থাকা সংখ্যালঘু যৌন-প্রবৃত্তির মানুষেরা তখন লর্ড বাইরনের মতো উচ্চারণ করবে –

> Yet, Freedom! yet thy banner, torn, but flying,
> streams like the thunderstorm against the wind.

পরিশিষ্ট

যৌনতার ব্যয়

বইয়ের এই অংশে গাণিতিক মডেলের সাহায্যে দেখানো হবে যে, যৌনতার ব্যয় হিসেব করলে অযৌনপ্রজরা, যৌনপ্রজদের চেয়ে অত্যন্ত দুই গুন এগিয়ে।
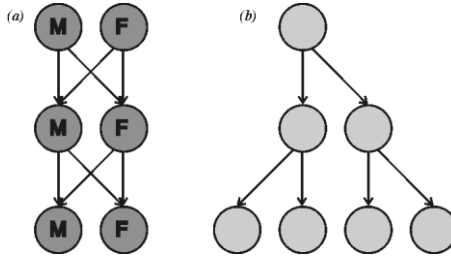
চিত্র: উপরের ছবিটিতে যৌনতার ব্যয়ের একটি হিসেব তুলে ধরা হয়েছে। যদি প্রতিটি ব্যক্তি সমান সংখ্যক (দুই) উত্তরাধিকার তৈরি করে, তবে (a) যৌনপ্রজেরা প্রতিটি প্রজন্মের পর সমান আকারেরই থাকে, এবং অন্যদিকে (b) অযৌনপ্রজেরা দ্বিগুণ আকারে পরবর্তী প্রজন্মে বৃদ্ধি পায়।

এখানে ধরে নেয়া হচ্ছে স্পার্মের একমাত্র কাজ হচ্ছে ডিম্বাণুর নিষেক ঘটানো। যদি স্পার্ম উৎপাদন এবং ডিম্বাণুর উৎপাদনের ব্যয় যথাক্রমে c_s এবং c_e হয়, এবং অভিভাবকের সীমিত সম্পদ Q কে স্পার্ম V এবং W তে ভাগ করা হয়, তবে,

$$c_s V + c_e W \approx Q$$

সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিম্বাণু যা একজন ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত হতে পারে –

$$W_m \approx \frac{Q}{c_e}$$

কিন্তু এই পরিমাণ ডিম্বাণু উৎপাদনের অর্থ হলো – পুরো সম্পদ Q কেবল মাত্র ডিম্বাণু উৎপাদনেই ব্যয়িত হবে, এবং কোনো স্পার্ম এখানে থাকবে না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় স্পার্ম এবং ডিম্বাণুর মিথষ্ক্রিয়া বজায় থাকে। আমাদের কাজ হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য কতটি স্পার্মের জন্য কতগুলো ডিম্বাণু লাগবে তা সিমুলেশন করে বের করা। ডিম্বাণুর একটি অপটিমাম সংখ্যা আমরা পাব, যার মান W_m এর চেয়ে ছোট হবে। ধরা যাক এই অপটিমাম সংখ্যা হলো W_o ।

যদি এখানে বিবেচিত ডিপ্লয়েড ব্যক্তির জেনেটিক সিস্টেম একটি লোকাস বিশিষ্ট দুটি অ্যালেল - A_1 এবং A_2 এর সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে, তবে t সময়ে জেনোটাইপ A_{ij} এর ফ্রিকোয়েন্সি $X_{ij,t}$ । যেখানে, $X_{11,t} + X_{12,t} + X_{22,t} = 1$ । t সময়ে সমগ্র জনপুঞ্জের আকার N_t, এবং এর গতিপ্রবাহ যদি কেবল ডিম্বাণুর উৎপাদন দ্বারা নির্ধারিত হয়, তবে –

$$N_{t+1} = \overline{W_t} N_t$$

এখানে t সময়ে ব্যক্তি কর্তৃক গড়পরতা ডিম্বাণু উৎপাদনের পরিমান –

$$\overline{W_t} = W_{11} X_{11,t} + W_{12} X_{12,t} + W_{22} X_{22,t}$$

ধরা যাক, একটি জনপুঞ্জে বিচ্ছিন্নভাবে (randomly) স্পার্মের দ্বারা একটি ব্যক্তির ডিম্বাণুর নিষেক ঘটতে পারে। t সময়ে একজন ব্যক্তির গড়পরতা স্পার্ম উৎপাদন –

$$\overline{V_t} = V_{11} X_{11,t} + V_{12} X_{12,t} + V_{22} X_{22,t}$$

স্পার্ম পুলে A_1 -এলেলের ফ্রিকোয়েন্সি -

$$p_{s,t} = \frac{V_{11}}{V_{tt}} X_{11,t} + \frac{1}{2}\frac{V_{12}}{V_t} X_{12,t}$$

একই ভাবে A_2-এলেলের ফ্রিকোয়েন্সি -

$$q_{s,t} = \frac{V_{22}}{V_{tt}} X_{22,t} + \frac{1}{2}\frac{V_{12}}{V_t} X_{12,t}$$

ডিম্বাণুর ক্ষেত্রেও একই ভাবে লেখা যায় –

$$p_{e,t} = \frac{W_{11}}{W_{tt}} X_{11,t} + \frac{1}{2}\frac{W_{12}}{W_t} X_{12,t}$$

এবং,

$$q_{e,t} = \frac{W_{22}}{W_{tt}} X_{22,t} + \frac{1}{2}\frac{W_{12}}{W_t} X_{12,t}$$

নির্বিচারী বহুগামী (Promiscuous) সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সম্পর্কগুলো প্রযোজ্য –

$$X_{11,t+1} = p_{s,t}p_{e,t}$$

$$X_{12,t+1} = q_{s,t}p_{e,t} + p_{s,t}q_{e,t}$$

$$X_{22,t+1} = q_{s,t}q_{e,t}$$

যদি A_1 অ্যালেল-বিশিষ্ট একটি জনপুঞ্জে একটি বিরল অ্যালেল A_2 বিস্তৃত হতে থাকে, তবে দেখা গেছে –

$$V_{11}(W_{12} - W_{11}) + W_{12}(V_{12} - V_{11}) > 0$$

এবং সেক্ষেত্রে –

$$V_{11} = V$$

$$V_{12} = V + dV$$

$$W_{11} = W$$

$$W_{12} = W + dW$$

তাহলে জনপুঞ্জে বিরল এলেল বৃদ্ধির শর্ত দাঁড়াবে –

$$VdW + WdV > 0$$

সম্পূর্ণ ডিফারেনশিয়াল (total differential) আকারে সমীকরণটিকে লিখলে লেখা যায় –

$$d[VW] > 0$$

V – এর মান প্রথম সমীকরণে বসিয়ে পাওয়া যায় –

$$W_0 = \frac{1}{2}\frac{Q}{C_e}$$

Or, $W_0 = \frac{1}{2}W_m$

অর্থাৎ, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ডিম্বাণু উৎপাদনের হার সর্বোচ্চ ডিম্বাণুৎপাদনের হারের অর্ধেক। অন্য কথায়, অযৌনপ্রজদের ডিম্বাণু উৎপাদনের হার যৌনপ্রজদের ডিম্বাণু উৎপাদনের দ্বিগুন হারে বৃদ্ধি পায়।

সেক্স এবং জেন্ডার [308]

সেক্স

সেক্স বা 'জৈব লিঙ্গ' হচ্ছে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈশিষ্টসূচক ভিন্নতা যা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী-পুরুষের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে। এটি শারীরবৃত্তীয়ভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়। তবে সেক্স বলতে শুধু 'নারী' বা 'পুরুষ' এই দুই ভাগে ভাগ করার সার্বজনীন ব্যাপারটি সম্প্রতি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে[309]। পশ্চিমা বিশ্বের বহু জায়গায়

---

[308] এ অংশটি গৌতম রায়ের 'সেক্স এবং জেন্ডার- পার্থক্যটা যেখানে' (সচলায়তন, বুধ, ২০০৯-০৮-১৯ ১৩:৩৫) থেকে উদ্ধৃত এবং এই বইয়ের লেখক কর্তৃক সংযোজিত এবং পরিমার্জিত। এ ছাড়া কিছুটা অংশ সংযোজিত হয়েছে সেলিনা হোসেন এবং মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত 'জেন্ডার বিশ্বকোষ' (প্রথম খণ্ড) থেকে।

[309] এ প্রসঙ্গে ইন্টারনেটে দেখুন, 'চাই নারী পুরুষের বাইরেও অন্যান্য লিঙ্গের সামাজিক স্বীকৃতি' (অভিজিৎ রায়, মুক্তমনা, ২০০৯)।

ইতোমধ্যেই কেবল নারী-পুরুষ– এই দ্বিলিঙ্গভিত্তিক সমাজ ঘুচিয়ে দিয়ে বহুলিঙ্গভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। এই ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশ জীববিজ্ঞানীই। যেমন, এ প্রসঙ্গে **১৯৯২** সালে সায়েন্স পত্রিকায় প্রকাশিত Anne Fausto-Sterling এর The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough প্রবন্ধটি উল্লেখ্য। তিনি 'নারী' এবং 'পুরুষ' এই দুই পদের পাশাপাশি হার্মস (ট্রু হার্মাফ্রোডাইট), নার্মস (মেল সুডো হার্মাফ্রোডাইট) এবং ফার্মস (ফিমেল সুডো হার্মাফ্রোডাইট) -এর প্রস্তাব করেছেন[310]। এ প্রসঙ্গে লেখকের 'সেক্সিং দ্য বডি' বইটি পড়ে দেখা যেতে পারে।

জেন্ডার

জেন্ডার বা ‘সাংস্কৃতিক লিঙ্গ’ হচ্ছে নারী ও পুরুষের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পরিচয় যা একইসাথে সামাজিকভাবে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও ভূমিকাকে নির্দেশ করে। এতে নারী ও পুরুষের সাথে সম্পর্কিত মনস্তাত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোধটি প্রাধান্য পায় বেশি। ফলে সমাজ, পরিবেশ ও স্থান বদলের সাথে সাথে জেন্ডার-ধারণা পরিবর্তিত হতে পারে।

সেক্স বনাম জেন্ডার: পার্থক্য কোথায়?

সমাজবিজ্ঞানী অ্যান ওকলের মতে, সেক্স শারীরিক বৈশিষ্ট্য বহন করে। আর জেন্ডার একটি নির্দিষ্ট সমাজে সামাজিক ও মনস্তাত্বিকভাবে নির্ধারিত বিশিষ্টতা নির্দেশ করে। একজন নারী ও পুরুষের কার কী রকম পোশাক-পরিচ্ছদ হবে; কে কী রকম আচার-আচরণ করবে; আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা কার কী রকম হবে; সমাজের নানা ধরনের কাজে একজন নারী বা একজন পুরুষের ভূমিকা কী হবে;মানসিক গঠনের

---

[310] কিছু সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ফাউস্টো স্টারলিং তার সায়েন্স পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি সম্প্রতি কিছুটা পরিমার্জিত করেছেন। The five sexes, revisited (Sciences (New York) 40 (4): 18–23. PMID 12569934) দ্রঃ

দিক দিয়ে একজন নারী বা পুরুষ কী রকম হবে; সমাজ ও সংস্কৃতি নির্ধারিত এই বিষয়গুলোর ব্যাখ্যাদাতা হচ্ছে জেন্ডার।

উপর্যুক্ত বক্তব্য অনুযায়ী, সেক্স বিষয়টি পুরোপুরি শরীরের উপর নির্ভরশীল কিন্তু জেন্ডার নির্ভরশীল সমাজের উপর। যেহেতু নারী বা পুরুষের দায়িত্ব, কাজ ও আচরণ মোটামুটি সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত হয়, তাই সমাজ পরিবর্তন বা সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে জেন্ডার ধারণা বদলে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ- আমরা যখন কাউকে 'নারী' বা 'পুরুষ' হিসেবে চিহ্নিত করি, তখন সেখানে জৈব-লিঙ্গ নির্দেশ করাটাই মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাড়ায়। কিন্তু 'মেয়েলি' বা 'পুরুষালি' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে জেন্ডার প্রপঞ্চকে যুক্ত করা হয় যেখানে নারী বা পুরুষের লিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে স্বভাব-আচরণগত ইত্যাদি বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। আর এ কারণে সেক্সকে *জৈবলিঙ্গ* এবং জেন্ডারকে *সামাজিক বা সাংস্কৃতিক লিঙ্গ* বলে অনেকে অভিহিত করেন। এই বইয়ে জেন্ডার বলতে সাংস্কৃতিক লিঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সেক্সের সাথে সম্পর্কযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো শারীরিক বা জৈবিক, সর্বজনীন, অপরিবর্তনীয় এবং প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়, আর অন্যদিকে জেন্ডারের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক; সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে তা ভিন্ন হতে পারে এবং এটি পরিবর্তনীয়।

শ্রমবিভাজনেও সেক্স ও জেন্ডারের মধ্যকার পার্থক্যগুলো সুস্পষ্ট। নারী ও পুরুষ তার শারীরিক গঠনের কারণে যে কাজ বা ভূমিকা পালন করে, সেগুলোকে সেক্সভিত্তিক শ্রম বিভাজন বলা হয়। যেমন- বংশরক্ষায় নারী ডিম্বাণু সরবরাহ করে,শিশুকে স্তন পান করায়, অপরদিকে পুরুষ শুক্রাণু সরবরাহ করে। অন্যদিকে নারী ও পুরুষ সামাজিক বা সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও বিশ্বাসের কারণে সে কাজ বা ভূমিকা পালন করে সেগুলোকে বলা হয় জেন্ডারভিত্তিক শ্রম বিভাজন। যেমন- খুব প্রচলিতভাবে অনেকেই আমাদের দেশে ধরে নেন, নারী ঘরের ভিতরে কাজ করবে,

পুরুষ কাজ করবে ঘরের বাইরে ইত্যাদি এবং অনেক সময় দাবি করেন এটাই ‘প্রাকৃতিক’। নারীবাদীরা এই ধরনের মনোভাবকে ‘পিতৃতান্ত্রিক’ শোষণ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করতে চান। বলা বাহুল্য, এখানে লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করা বলতে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈষম্যগুলোই দূর করার কথা বলা হয়। অর্থাৎ, নারী পুরুষে জৈবিক বা ‘সেক্সুয়াল’ পার্থক্য মেনে নিয়েই জেন্ডারগত বৈষম্যগুলো দূর করার জন্য কাজ করেন।

সুতরাং শব্দগত দিক দিয়ে দুটো শব্দ পুরোপুরি ভিন্নার্থ বহন করে। বাংলাদেশে একসময় সেক্স ও জেন্ডার- উভয়ক্ষেত্রেই লিঙ্গ শব্দটি ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে অর্থগত দিক দিয়ে ভিন্নতা বহন করায় সেক্সের প্রতিশব্দ হিসেবে লিঙ্গ এবং জেন্ডারের জন্য আলাদা কোনো প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে জেন্ডার শব্দটিই হুবহু ব্যবহার করা হচ্ছে। শারীরিক বা জৈবিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত কোনো আলোচনায় লিঙ্গ এবং এর বাইরের সব ধরনের আলোচনায় জেন্ডার শব্দটি ব্যবহার করাই শ্রেয় বলে মনে করা হয়। বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে জেন্ডার সম্পর্কিত ধারণার অণুপ্রবেশের প্রবেশের ফলে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে বিচার বিবেচনা করা সম্ভব হচ্ছে।

সেক্সচেঞ্জ বা সেক্স রিএসাইনমেন্ট অপারেশন

সেক্স চেঞ্জ আসলে খুব জটিল প্লাস্টিক সার্জারি অপারেশন। এই অপারেশনে যারা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন হ্যারি বেঞ্জামিন, স্টিনাক, আব্রাহাম, জন মানি প্রমুখ। রূপান্তরকামী এবং উভলিঙ্গ মানবদের চাহিদাকে মূল্য দিয়ে ডাক্তাররা সার্জারির মাধ্যমে সেক্সচেঞ্জ অপারেশন করে থাকেন। যেহেতু রূপান্তরকামীতাকে কোনো অসুখ মনে করা হয় না, তাই ঔষধ প্রয়োগ করে এই মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বদলে ফেলা সম্ভব নয়। একমাত্র সেক্সচেঞ্জ অপারেশনের মধ্য দিয়েই অনেকে মানসিক পরিতৃপ্তি পেয়ে থাকেন। পুরুষ রূপান্তরকামী অর্থাৎ

যারা পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত হতে চায়, তাদের জন্য এক ধরনের অপারেশন, আর নারী রূপান্তরকামীদের জন্য ভিন্ন অপারেশন। মুলতঃ শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে চামড়া ও টিস্যু নিয়ে গ্রাফটিং এর মাধ্যমে যোনিপ্রদেশ গঠন করা হয়, হরমোন থেরাপির সাহায্যে স্তন গ্রন্থির হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটানো হয়, সিলিকন টেস্টিকেলের সাহায্যে অন্ডকোষ তৈরি করা হয়, ইত্যাদি।

অনেক ক্ষেত্রেই সেক্স চেঞ্জের পর পরিপূর্ণ পুরুষ বা নারী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করতে পারেন, এমনকি সন্তানও ধারণ করতে পারেন। তবে অনেক জটিল পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নাও হতে পারে।

পরিণত বয়সে কারো চাহিদাকে মূল্য দিয়ে সেক্সচেঞ্জ অপারেশন পশ্চিমা বিশে গ্রহণযোগ্যতা পেলেও জন্মের পর পরই উভলিঙ্গ কিংবা অজ্ঞাত যৌনতাবিশিষ্ট শিশুকে সেক্সচেঞ্জ করে একটি নির্দিষ্ট জেন্ডারের বলয়ে জোর করে প্রবেশ করার চেষ্টাকে সম্প্রতি নৈতিক দিক দিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। শিশুটির বোধ বুদ্ধি কিংবা জেন্ডার সংক্রান্ত ধারণা জাগ্রত হবার আগেই তাকে জোর করে একটি নির্দিষ্ট জেন্ডারাবদ্ধ করাকে অনেক সামাজিক এবং মানবাধিকার বিষয়ে সোচ্চার সংগঠনগুলো 'শিশু নিপীড়ন' বলে অভিহিত করেছেন। বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে শিশু বয়সে জোর করে জেন্ডার বদল করার পরিনতি পরবর্তীতে মোটেই শুভ হয়নি। ডেভিড রেইমারের বিয়োগান্তক পরিনতির (মূল বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় দ্রঃ) পর এবং যৌনতা সংক্রান্ত ধ্যান ধারণা পালটে যাবার পরিপ্রেক্ষিতে বহুচিকিৎসক তাদের সনাতন মনোভাব ত্যাগ করেছেন।

মানব প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিগুলো কি জন্মগত নাকি আচরণগত?

আমরা যদি প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন উপকরণের দিকে তাকাই তা হলে দেখব, এর মধ্যে অনেককিছুই জন্মগত– আচরণ দিয়ে আমরা সেগুলো বদলে দিতে পারিনা রাতারাতি। চোখের রঙ, আঙ্গুলের ছাপ, ডান হাতি নাকি বাঁ হাতি– এগুলো সেরকম

কিছু উদাহরণ। আধুনিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যৌনপ্রবৃত্তিও অনেকসময়ই কারো 'চয়েস' এর ব্যাপার থাকে না[311], বরং এটি জৈবিকভাবেই অঙ্কুরিত। আমরা বিষমকামীরা যেভাবে বিপরীত লিঙ্গের মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য দেখে উদ্বেলিত হই, হই কামায়িত, তেমনি সমকামিরাও একই তাড়নায় ভোগেন – তবে তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না, বরং আকর্ষিত হন সমলিঙ্গের প্রতি। আমি আমার কাছের সমকামী বন্ধুদের সাথে কথা বলে দেখেছি, ব্যাপারটা কেউ তাদের শিখিয়ে দেয় নি। এই প্রবৃত্তি বয়ঃসন্ধিকালে তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল আপনা আপনি। বছর কয়েক আগে 'সমকামিতা কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ' [312] নামে একটি সিরিজ লিখেছিলাম মুক্তমনায়, সেখানে বহু দৃষ্টান্ত হাজির করে দেখিয়েছিলাম যে, সমকামিতার ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রেই স্রেফ পরিবেশ নির্ভর নয়, বরং 'বায়োলজিকালি হার্ডওয়্যার্ড'। একটা সময় ছিল যখন, সমকামিতাকে ঢালাওভাবে মনোরোগ বা বিকৃতি বলে ভাবা হত। ভাবা হতো সমাকামিতা বোধ হয় কিছু বখে যাওয়া মানুষের বেলাল্লাপনা ছাড়া আর কিছু নয়। আজকের দিনে সেই ধারণা (অন্তত পশ্চিমে) অনেকটাই পাল্টেছে।এ প্রসঙ্গে জানানো যেতে পারে যে, ১৯৭৩ সালের ১৫ ই ডিসেম্বর American Psychiatric Association (বহু চিকিৎসক এবং মনোবিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সংগঠন) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোনো নোংরা ব্যাপার নয়, নয় কোনো মানসিক ব্যধি। এ হলো যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ১৯৭৫ সালে American Psychological Association একইরকম অধ্যাদেশ দিয়েছিলেন। সকল আধুনিক চিকিৎসকই আজ এ বিষয়ে একমত।

তবে সমকামিতাই একমাত্র উদাহরণ নয়। আমাদের চারপাশে চোখ মেললেই আমরা মানব প্রকৃতির এ ধরনের আরো মজার মজার উদাহরণ দেখতে পাব। একই

---

[311] Is It a Choice? Answers to the Most Frequently Asked Questions About Gay & Lesbian People, Third Edition, Eric Marcus, HarperOne; 3 Revised edition, August 30, 2005

[312] সমকামিতা (সমপ্রেম) কি প্রকৃতি বিরুদ্ধ? , মুক্তমনা ওয়েব সাইইট, লিঙ্ক: http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/shomokamita1.htm

রকম কিংবা প্রায় একই রকম পরিবেশ দেয়ার পরও অভিভাবকেরা লক্ষ্ করেন - তাদের কোনো বাচ্চা হয় মেধাবী, অন্যটা একটু শ্লথ, কেউ বা আবার অস্থির, কেউ বা চাপা স্বভাবের, কেউ বা কোমল কেউ বা হয় খুব ডানপিটে। কেউ বা স্কুলের লেকচার থেকে চট পট অংকের সমস্যাগুলো বুঝে ফেলে, কেউ বা এ ধরনের সমস্যা দেখলেই পালিয়ে বাঁচে, কিংবা মাস্টারের বেতের বাড়ি খেয়ে বাসায় ফেরে। ছোট বেলা থেকেই কেউ পিয়ানোতে খুব দক্ষ হয়ে উঠে, কেউ বা রয়ে যায় তাল কানা। কেউ বা খেলাধূলায় হয় মহা চৌকষ, কারো বা ব্যাটে বল লাগতেই চায় না। কেউ ছোটবেলা থেকেই গল্প-কবিতা লেখায় খুব পারদর্শী হয়ে উঠে,তার কেউ সাহিত্য শব্দটা উচ্চারণ করতে গেলেই দাঁত খুলে আসে কিংবা একটা চার লাইনের কবিতা লিখতে গেলেই কলম ভেঙ্গে পড়ে। এ ধরনের ব্যাপার স্যাপারের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত।

কাজেই, আমরা কিছু উদাহরণ পেলাম যেগুলো হয়ত অনেকাংশেই পরিবেশ নির্ভর নয়। অন্তত পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে আমরা সেগুলোর প্রকৃতি রাতারাতি বদলে দিতে পারি না। আইনস্টাইনকে শিশু বয়সে আর্জেন্টিনা বা ব্রাজিলে বড় করলেই কি তিনি ম্যারাডোনা বা পেলে হয়ে উঠতে পারতেন? তা কিন্তু হলফ বলা যাবে না। তার মানে ভালো বা 'উপযুক্ত' পরিবেশ দেয়ার পরও বাঞ্ছিত ফলাফল আমরা পাই না বহু ক্ষেত্রেই। তখন কপাল চাপড়ানোই সার হয়।কিন্তু তার মানে কিন্তু এটা মনে করা ভুল হবে যে, জীবন গঠনে পরিবেশের কোনো প্রভাব নেই। অবশ্যই আছে। জীবন গঠনে পরিবেশের ভূমিকা যে অনস্বীকার্য, সেটা তো আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি। সে জন্যই প্রত্যেক পিতামাতা তার সন্তানকে একটা ভালো পরিবেশ দিয়ে বড় করতে চান। শিশুর মানসপটে পরিবেশের প্রভাব আছে বলেই ভালো একটা পরিবেশ প্রদানের জন্য কিংবা ভালো একটা স্কুলে বাচ্চাকে ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকেরা অহর্নিশি চিন্তিত থাকেন। তারপরও কি তারা সবসময় প্রত্যাশিত ফল পান? না, অনেক সময়ই পান না।

এখন কথা হচ্ছে - পরিবেশই যদি মানব প্রকৃতি গঠনের একমাত্র নিয়ামক না হয়ে থাকে, তাহলে আর বাকি থাকে কি? বাকি থাকে একটা খুব বড় জিনিস। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা বলেন, মানব প্রকৃতি গঠনে পরিবেশের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে আরেকটা জিনিসের প্রভাব। সেটা হচ্ছে বংশানু বা 'জিন'। মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণে 'জিন'কে নিয়ে আসায় অনেকের চোখই হয়ত কপালে উঠে যাবে। ভুরুও কুঁচকে যেতে পারে কারো কারো। তবে আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করব যে, 'পরিবেশ' এবং 'জিন' - মানব প্রকৃতি গঠনে কোনোটার প্রভাবই কোনোটার চেয়ে কম নয়। আমরা প্রায়শই এক সন্তানদের দেখিয়ে বলি – 'ছেলেটা বাপের মতই বদরাগী হয়েছে', কিংবা বলি 'মেয়ে হয়েছে মার মতই সুন্দরী। চোখগুলো দেখেছ – কি রকম টানা টানা?' এগুলো কিন্তু আমরা এমনি এমনি বলি না। বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই এগুলো বলি, আর সেজন্যই এই উপমাগুলো আমাদের সংস্কৃতিতে এমনিভাবে মিশে গেছে। কেবল শারীরিক সৌন্দর্য নয়, আবেগ, অনুরাগ, হিংসাত্মক কিংবা বদরাগী মনোভাব এমনকি ডায়াবেটিস কিংবা হৃদরোগের ঝুঁকি পর্যন্ত আমরা বংশপরম্পরায় বহন করি 'জেনেটিক তথ্য' হিসবে আমাদের অজান্তেই। বাবার হৃদরোগের উপসর্গ থাকলে ছেলেকেও একটু বাড়তি সচেতন হতে পরামর্শ দেন আজকের ডাক্তারেরা। কার্ব আর রেড মিট ছেড়ে দিতে বলেন। পরিবারে কারো ডায়াবেটিস থাকলে কিংবা কাছের কোনো আত্মীয়রের দেহে এ রোগ বাসা বেধে থাকলে অন্যান্যরাও নিয়মিত 'সুগার চেক' করা শুরু করে দেন। এগুলো কিন্তু আমরা সবাই জানি। শারীরিক গঠন কিংবা রোগ-বালাইয়ের ক্ষেত্রে তাও না হয় মানা যায়, কিন্তু মানুষের চরিত্র গঠনে 'জিন'-এর প্রভাব থাকতে পারে, এ ব্যাপারটা মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি ছিল, এখনো আছে বহুজনেরই। আর আপত্তি আছে বলেই আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রটিকে পরিষ্কার দুইভাগে ভাগ করে ফেলেছি - জীববিজ্ঞান আর সমাজবিজ্ঞান নামের অভিধায়। প্রাণিদেহের এবং সর্বোপরি মানুষের শারীরিক গঠন, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মিউটেশন ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করবেন জীববিজ্ঞানীরা, আর

সমাজ সংস্কৃতি আর মানুষের মন নিয়ে গবেষণা করবেন সমাজবিজ্ঞানীরা কিংবা মনোবিজ্ঞানীরা। এ যেন দুই সতন্ত্র বলয়। জীববিজ্ঞানের আহৃত গবেষণা সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা নিরব থাকবেন। আবার সমাজিক বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সামাজিক গবেষণা সম্পর্কে জীববিজ্ঞানীরা উদাসীন থাকবেন। এটাই চিরন্তন নিয়ম হয়ে গিয়েছে যেন। কিন্তু এই বিভেদ কি যৌক্তিক? এই দুই বলয়ের মধ্যে কি কোনোই সম্পর্ক নেই? আধুনিক চিন্তাবিদরা কিন্তু বলেন, আছে। খুব ভালোভাবেই সম্পর্ক আছে। আসলে সংস্কৃতি বলি, কৃষ্টি বলি, দর্শন বলি, কিংবা সাহিত্য – এগুলো কিন্তু মানব মনের সম্মিলিত প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। আবার মানব মন কিন্তু মানব মস্তিষ্কেরই (Human brain) অভিব্যক্তি, যেটাকে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার তার 'হাও মাইন্ড ওয়ার্ক্স' বইয়ে খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে – 'Mind is what the brain does'। আর এ কথা তো সবারই জানা যে, দীর্ঘকালের বিবর্তনীয় প্রক্রিয়াতেই তৈরি হয়েছে মানব বংশানু যা আবার মস্তিষ্কের গঠনের অবিচ্ছেদ্য নিয়ামক। কাজেই একধরনের সম্পর্ক কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। আমরা চাইলেও আর সামাজিক আচার ব্যবহার কিংবা মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণে জীববিজ্ঞানকে আর সমাজবিজ্ঞান থেকে আজকে আলাদা করে রাখতে পারি না। এ ব্যাপারটাই স্পষ্ট করেছেন জন ব্রকম্যান তার সাম্প্রতিক 'সায়েন্স এট এজ' (২০০৮) বইয়ের ভূমিকায় –

> Connection do exist: our arts, our philosophies, our literature are the product of human minds interacting with one another, and the human mind is a product of human brain, which is organized in part by the human genome and has evolved by the physical process of evolution.

মানব-প্রকৃতি বিশ্লেষনে জিন বা বাংশানুকে গোনায় ধরা উচিত– এ ব্যাপারটি প্রথম স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন এডওয়ার্ড ও উইলসন তার বিখ্যাত 'Sociobiology'

(১৯৭৫) নামক বিখ্যাত পুস্তকে। সে সময় উইলসনের গবেষণার বিষয় ছিল পিঁপড়ে এবং পিঁপড়েদের সমাজ। পিঁপড়েদের চালচলন গতিবিধি এবং সমাজব্যবস্থা নিয়ে অনেকদিন ধরেই ভদ্রলোক রিসার্চ করছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি এ নিয়ে একটি সুন্দর একাডেমিক বইও লিখেছিলেন 'দ্য ইনসেক্ট সোসাইটি' নামে। ১৯৭৫ সালের 'সোশিওবায়োলজি' বইটিতেও তিনি পিঁপড়েদের আকর্ষণীয় জীবন যাপন আর সমাজের নানা রকমের গতিবিধিই মূলত ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি যদি সেখানেই থেমে যেতেন, তবে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু তিনি সেখানে থেমে না গিয়ে শেষ অধ্যায়ে তার ধ্যান ধারণা একেবারে মানবসমাজ পর্যন্ত নিয়ে যান। পরে সেই ধারণাকে উইলসন আরো বিস্তৃত করেন তার পরবর্তী বই 'On Human Nature' (১৯৭৮)-এ। তিনি বলেন আজকে আমরা যাদের আধুনিক মানুষ নামে অভিহিত করি, সেই হোমোস্যাপিয়েন্স প্রজাতিটির মূল মানসপটের বির্নিমান আসলে ঘটেছিল অনেক আগে- যখন তারা বনে জঙ্গলে শিকার করে আর ফলমূল কুড়িয়ে জীবন যাপন করত। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সেই আদি স্বভাবের অনেক কিছুই কিছুই এখনো আমরা আমাদের স্বভাবচরিত্রে বহন করি - যেমন বিপদে পড়লে ভয় পাওয়া, দল বেধে বিপদ মোকাবেলা করা, অন্য জাতি/গোত্রের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, সবার আগে নিজের পরিবারের বা গোত্রের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হওয়া ইত্যাদি। এগুলোর সাথে এখন যুক্ত হয়েছে বর্তমান সভ্যতার জটিল সাংস্কৃতিক উপাদান। এই জিন এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের সুষম মিশ্রনেই গড়ে উঠে মানব প্রকৃতি, যাকে উইলসন তার বইয়ে চিহ্নিত করেন 'জিন-কালচার কোএভুলুশন' (Gene-culture coevolution) নামে।

যখন অধ্যাপক উইলসনের বইটি প্রকাশিত হয়, তা একাডেমিয়ায় তুমুল বিতর্কের জন্ম দেয়। সমাজবিজ্ঞানীরা অধ্যাপক উইলসনের কাজকে দেখেছিলেন তাদের গবেষণার ক্ষেত্রে 'অযাচিত' হস্তক্ষেপ হিসেবে। আর তাছাড়া সামাজিক ডারউইনিজম আর ইউজিনিক্সের দগদগে ঘা তখনো মানুষের মন থেকে শুকোয়নি। মানব প্রকৃতি

ব্যখ্যা করতে গিয়ে 'জিন' বা বংশানুকে নিয়ে আসায় উইলসনকে অভিযুক্ত হতে হয় নিও-সোশাল ডারউইনিস্ট অভিধায়। অভিযোগ করা হয়- উইলসন নিজের জাতিবিদ্বেষী মনোভাবকে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরে উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন। উইলসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার ছিলেন সে সময়কার ‘আদর্শবাদী’ চিন্তাবিদেরা। তাদের অধিকাংশই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ছাড়া অন্য কোনো বিশ্লেষণ দিয়ে মানব-প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসকে মেনে নিতে বরাবরই অনাগ্রহী ছিলেন। Science for the People নামের বাম ভাবাদর্শে দীক্ষিত একটি সংগঠন উইলসনের বিরুদ্ধে সে সময় সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৮৪ সালে রিচার্ড লেওনটিন, স্টিফেন রোজ এবং লিওন কামিন - এই তিন মাস্কেটিয়ার্স ১৯৮৪ সালে 'নট ইন আওয়ার জিনস'বইয়ে উইলসন এবং অন্যান্য সামাজিক জীববিজ্ঞানীদের আক্ষরিক অর্থেই তুলোধুনো করেন। তারা তাদের বইয়ে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, বিজ্ঞান এখন জাত্যাভিমানী পশ্চিমা পুঁজিবাদি সমাজের প্রোপাগান্ডা মেশিনে পরিণত হয়েছে, আর উইলসন সেই বৈষম্যমূলক ‘পুঁজিবাদী বিজ্ঞান’কে প্রমোট করছেন। তারা উইলসনের যমজ নিয়ে পরীক্ষা,পরিগ্রহণ পরীক্ষা প্রভৃতির উপর পদ্ধতিগত আক্রমণ পরিচালনা করেন, শুধু তাই নয় তাদের মার্কসবাদী দার্শনিক বিশ্বাস থেকে প্রস্তাব করেন জীববিজ্ঞানেও মার্ক্সবাদের মতো‘দ্বান্দিক’বা ডায়লেক্টিকাল পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। এ নিয়ে অধ্যাপক রিচার্ড লেওনটিন একটি বইও লেখেন সে সময় – ‘ডায়লেক্টিকাল বায়োলজিস্ট’ নামে।

এর প্রতিক্রিয়ায় বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স ১৯৮৫ সালে রিচার্ড লেওনটিন, স্টিফেন রোজ এবং লিওন কামিনের কাজের তীব্র সমালোচনা করে তাদের বইকে ‘স্থুল,আত্মাভিমানী,পশ্চাৎমুখী এবং ক্ষতিকর’ হিসবে আখ্যায়িত করে *নিউ সায়েন্টিস্ট* পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ[313] লেখেন। অধ্যাপক ডকিন্স অভিযোগ করেন

[313] Not in Our Genes: Biology, Ideology and Human Nature, Reviewed by Richard Dawkins in "Sociobiology: the debate continues", New Scientist 24 January 1985, On line link: http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/WorldOfDawkins-archive/Dawkins/Work/Reviews/1985-01-24notinourgenes.shtml

যে, লেওনটিনরা নিজস্ব দার্শনিকভিত্তি থেকে মদদপুষ্ট হয়ে সামাজিক জীববিজ্ঞানীদের উপর যেসমস্ত অভিযোগ করেছেন এবং যে ভাবে ভিত্তিহীন আক্রমণপরিচালনা করেছেন তা স্ট্রম্যান হেত্বাভাষ দোষে দুষ্ট। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করা, কোনো 'বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদ'কে প্রমোট করা নয়।

সোশিওবায়লজি বইটি প্রকাশের তিনদশক পরে আজ এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, উইলসন সামাজিক বিবর্তনবাদ নিয়ে যে কাজ শুরু করেছিলেন তা মৌলিক ছিল নিঃসন্দেহে। উইলসন সেই কাজটিই করেছিলেন যেটি ডারউইন পরবর্তী যে কোনো জীববিজ্ঞানীর জন্য হতে পারে মাইলফলক। তখন তিনি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেও পরে অনেকেই তার কাজের গুরুত্ব অনুভব করতে পেরেছিলেন। উইলসন মানবপ্রকৃতি নিয়ে তার ব্যতিক্রমধর্মী কাজের কারণে দু-দুবার পুলিৎসার পুরস্কার পেয়েছিলেন।শুধু তাই নয় উইলসন যে কাজটি সামাজিক জীববিজ্ঞানকে এখন দেখা হয় বিবর্তনের সাম্প্রতিক গবেষণার অন্যতম সজীব একটি শাখা হিসেবে, যা পরবর্তীতে আরো পূর্ণতা পেয়েছে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান (evolutionary psychology) নামের ভিন্ন একটি নামে। উইলসনের সোশিওবায়লজি বইটির পর বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের জগতে অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ্ হলো রিচার্ড ডকিন্সের 'সেলফিশ জিন' (১৯৭৬) নামের অনন্যসাধারণ একটি বই। এই বইয়ের মাধ্যমেই ডকিন্স সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলেন কেন জেনেটিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। তিনি তার বইয়ে দেখালেন যে, আমরা আমাদের এই দেহের পরিচর্যা নিয়ে যতই চিন্তিত থাকিনা কেন- দেহ কিন্তু কোনো প্রতিলিপি তৈরি করেনা; প্রতিলিপি তৈরি করে বংশানু বা জিন। তার মানে হচ্ছে আমাদের দেহ কেবল আমাদের জিনের বাহক (vehicle) হিসেবে কাজ করা ছাড়া আর কিছুই করে না। আমাদের খাওয়া, দাওয়া, হাসি কান্না, উচ্ছ্বাস, আনন্দ, সিনেমা দেখা, খেলাধূলা বা গল্প করা– আমাদের দেহ যাই করুক শেষ পর্যন্ত 'অত্যন্ত স্বার্থপর'ভাবে জিনকে রক্ষা করা আর জিনকে পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছে দেয়াতেই উদ্দেশ্য খুঁজে নিতে বাধ্য করে,

বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের কোনো 'উদ্দেশ্য' যদি থেকে থাকে তবে সেটাই সে উদ্দেশ্য। মা বাবারা যে সন্তানদের সুখী দেখতে পাবার জন্য পারলে জানটুকু দিয়ে দেয়– এটা কিন্তু জৈবিক তাড়না, আরো পরিষ্কার করে বললে জিনগত তাড়না থেকেই ঘটে। শুধু মানুষ নয় অন্য যে কোনো প্রানীর মধ্যেই সন্তানদের প্রতি অপত্য স্নেহ প্রদর্শন কিংবা সন্তানদের রক্ষা করার জন্য মা বাবারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। অর্থাৎ, নিজের দেহকে বিনষ্ট করে হলেও পরবর্তী জিনকে রক্ষা করে চলে। 'পরবর্তী জিন' রক্ষা না পেলে নিজের দেহ যত সুষম, সুন্দর, শক্তিশালী আর মনোহর কিংবা নাদুস-নুদুস হোক না কেন, বিবর্তনের দিক থেকে কোনো অভিযোজিত মূল্য নেই। এক ধরনের ইঁদুর আছে যারা শুধু সঠিক সঙ্গী খুঁজে জিন সঞ্চালন করার জন্য বেঁচে থাকে। যৌনমিলনের পর পরই পুরুষ ইঁদুরটি মৃত্যুবরণ করে। অথচ এই মৃত্যুকূপের কথা জেনেও পুরুষ ইঁদুরটি সকল নিয়ে বসে থাকে 'সর্বনাশের আশায়'। এক প্রজাতির 'ক্যানিবাল' মাকড়শা আছে যেখানে স্ত্রী মাকড়শাটি যৌনমিলনের পর পরই পুরুষ মাকড়শাটিকে খেয়ে ফেলে। সাক্ষাৎ এই মৃত্যুর কথা জেনেও দেখা গেছে পুরুষ মাকড়শাগুলো জিন সঞ্চালনের তাড়নায় ঠিকই তাড়িত হয়। অর্থাৎ, দেহ এবং জিনের সংঘাত যদি উপস্থিত হয় কখনো– সে সমস্ত বিরল ক্ষেত্রগুলোতে দেখা গেছে জিনই জয়ী হয় শেষপর্যন্ত। আমাদের দেহে 'জাংক ডিএনএ' কিংবা 'সেগ্রেগেশন ডিস্টরশন জিন'-এর উপস্থিতি সেই সত্যটিকেই তুলে ধরে যে– শরীরের ক্ষতি করে হলেও জিন অনেক সময় নিজেকে টিকিয়ে রাখে– অত্যন্ত 'স্বার্থপর ভাবে'ই। ডকিন্সের এ বইয়ের মূল্য একাডেমিয়ায় অনেক। এই বইয়ের মাধ্যমেই আসলে জীববিজ্ঞানীরা সমাজ এবং জীবনকে ভিন্নভাবে দেখা শুরু করলেন। পরার্থতা, আত্মত্যাগ, দলগত নির্বাচনের মতো যে বিষয়গুলো আগে বিজ্ঞানীরা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন না, সেগুলো আরো বলিষ্ঠভাবে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যখ্যা করতে পারলেন তারা। তবে তার চেয়েও বড় যে ব্যাপারটি ঘটল, সেটা হলো মানবসমাজের বিভিন্ন সামাজিক প্যাটার্ন ব্যখ্যা করার নতুন এক দুয়ার খুলে গেল জীববিজ্ঞানীদের জন্য। সেজন্যই 'Richard Dawkins: How a Scientist

Changed the Way We Think: Reflections by Scientists, Writers, and Philosophers' নামের একটি বইয়ে তার সমসাময়িক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরা বলেছেন, ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিশিজ' –এর পর কোনো জীববিজ্ঞানীর লেখা বই যদি মানসপট এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে, তো সেটি ডকিন্সের 'সেলফিশ জিন'। এ ব্যাপারে ২০০১ সালে প্রকাশিত 'The Triumph of Sociobiology' গ্রন্থে জন অ্যালকের মন্তব্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক –

> 'প্রাণীজগতের আচরণ নিয়ে বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে কেউ 'সোশিওবায়োলজি' কিংবা 'সেলফিশ জিন' শব্দগুলো নিয়ে বেশি কথা বলার কিংবা নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনবোধ করেন না – কারণ এগুলো এখন বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছে'।

ডারউইন ১৮৫৯ সালে যখন তার সেই বিখ্যাত গ্রন্থ 'অরিজন অব স্পিশিজ' লিখেছিলেন, তখন তিনি পুরো বইটিতে মানুষের বিবর্তন নিয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। হয়ত অনাকাংখিত বিতর্ক এড়াতে গিয়েই এই কৌশল নিয়েছিলেন ডারউইন, যদিও বইয়ে মানব সমাজ এবং বিবর্তন নিয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এই বলে –' Light will be thrown on the origin of man and history'। এবং একই প্যারাগ্রাফে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন –'In the distant future... Psychology will be based on a new foundation.'

মজার ব্যাপার হলো- ডারউইন যেমন তার 'অরিজন অব স্পিশিজ' বইয়ে মানববিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে 'বিতর্কিত' হতে চাননি, ঠিক তেমনি তার একশ বছরেরও পরে বই লিখতে বসে ডকিন্স এবং উইলসনরাও তাদের হাটু কাঁপুনি থামাতে পারেননি। তারাও তাদের বইয়ে মানব সমাজ নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করে 'বিতর্ক'-এর কেন্দ্রবিন্দুতে আসতে হয়ত চাননি। ডকিন্সের 'সেলফিশ জিন' সুস্থ বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং আলোচনায় ভরপুর, কিন্তু প্রায় পুরোটাই তিনি সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন নিম্নস্তরের প্রানীজগতের ক্ষেত্রে। উইলসন তার ৫২৬ পৃষ্ঠার ঢাউস

আকারের বইটির পুরোটুকুতেই পিঁপড়া আর পোকামাকড় নিয়েই পড়ে ছিলেন, মানুষ নিয়ে কথা বলেছিলেন শেষ ২৮ পৃষ্ঠায় এসে। তারপরও ডারউইন যেমন বিতর্ক এড়াতে পারেননি, আধা মানুষ আর আধা বানরের কার্টুনের কেরিক্যাচার হজম করতে হয়েছে, ঠিক তেমনি ডারউইনের উত্তরসূরীদের নানা ধরনের কটুক্তি হজম করতে হচ্ছে ডারউইনেরই ভবিষ্যদ্বানী– 'সাইকোলজি উইল বি বেসড অন এ নিউ ফাউন্ডেশন'-কে পূর্ণতা দিতে গিয়ে।

তবে আধুনিক 'বিবর্তন মনোবিদ্যা'র জন্ম এদের কারো হাতে হয়নি, এর জন্ম হয়েছে মূলত এক সেলিব্রিটি দম্পতি জন টুবি (নৃতত্ত্ববিদ) এবং লিডা কসমাইডস (মনোবিজ্ঞানী)–এর হাত দিয়ে। তারা ১৯৯২ সালে 'The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture' যে বইটি লেখেন সেটিকে আধুনিক বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিমূল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তারা এই বইয়ের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সমাজবিজ্ঞানের প্রচলিত মডেলকে (standard social science model, সংক্ষেপে (SSSM) প্রশ্নবিদ্ধ করেন এবং সামাজিক বিবর্তন এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপরেখা জৈববিজ্ঞানীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। এই দৃষ্টিকোণটিকে আজ অনেকেই অভিহিত করছেন 'মনের নতুন বিজ্ঞান' ('the new science of the mind') নামে। যারা জন টুবি এবং লিডা কসমাইডসের এই 'নতুন বিজ্ঞানের' সাথে পরিচিত হতে চান, তারা অন লাইনে 'Evolutionary Psychology: A Primer' [314] প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নামের সাম্প্রতিক এই শাখাটি তাহলে আমাদের কি বলতে চাচ্ছে? সাদামাঠা ভাবে বলতে চাচ্ছে এই যে, আমাদের মানসপটের বিনির্মাণে দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ার একটি ছাপ থাকবে, তা আমরা যে দেশের, যে

---

[314] Evolutionary Psychology: A Primer, Leda Cosmides & John Tooby, Center for Evolutionary Psychology. Online link: http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/primer.html

সমাজের বা যে সংস্কৃতিরই অন্তর্ভূক্ত হই না কেন। ছাপ যে থাকে, তার প্রমাণ আমরা দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুতেই কিন্তু পাই। মিস্টিযুক্ত কিংবা চর্বিযুক্ত খাবার আমাদের শরীরের জন্য খারাপ, কিন্তু এটা জানার পরও আমরা এ ধরনের খাবারের প্রতি লালায়িত হই। সমাজ- সংস্কৃতি নির্বিষেশেই এটা ঘটতে দেখা যায়। কেন? বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, একটা সময় মানুষ জঙ্গলে থাকত, খুব কষ্ট করে খাবার দাবার সংগ্রহ করতে হত। শর্করা এবং স্নেহজাতীয় খাবার এখনকার মতো এত সহজলভ্য ছিল না। শরীরকে কর্মক্ষম রাখার প্রয়োজনেই এ ধরনের খাবারের প্রতি আসক্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তখন তো আর কারো জানার উপায় ছিল না যে, হাজার খানেক বছর পর মানুষ নামের অদ্ভুত এই 'আইলস্যা' প্রজাতিটি ম্যাকডোনাল্ডসের বিগ-ম্যাক আর হার্শিজ হাতে নিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে বসে ব্লগ আর চ্যাট করে অফুরন্ত অলস সময় পার করবে আর গায়ে গতরে হোদল কুৎকুতে হয়ে উঠবে। কাজেই খাবারের যে উপাদানগুলো একসময় ছিল আদিম মানুষের জন্য শক্তি আহরণের নিয়ামক কিংবা ঠান্ডা থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ, আজকের যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সেগুলোর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার হয়ে উঠেছে তাদের জন্য মরণ-বিষ। কিন্তু এগুলো জেনেও আমরা আমাদের লোভকে সম্বরণ করতে প্রায়শঃই পারি না; পোলাও বিরিয়ানি কিংবা চকলেট বা আইসক্রিম দেখলেই হামলে পড়ি। আমাদের শরীরে আর মনে বিবর্তনের ছাপ থেকে যাবার কারণেই এটি ঘটে। এধরনের আরো উদাহরণ হাজির করা যায়। আমরা (কিংবা আমাদের পরিচিত অনেকেই) মাকড়শা, তেলাপোকা কিংবা টিকটিকি দেখলে আঁতকে উঠি। কিন্তু বাস ট্রাক দেখে সেরকম ভয় পাই না। অথচ কে না জানে, প্রতি বছর তেলাপোকার আক্রমণে যত মানুষ না মারা যায়, তার চেয়ে ঢের বেশি মানুষ মরে ট্রাকের তলায় পড়ে। অথচ ট্রাককে ভয় না পেয়ে আমরা ভয় পাই নিরীহ তেলাপোকাকে। এটাও কিন্তু বিবর্তনের কারণেই ঘটে। বনে –জঙ্গলে দীর্ঘদিন কাটানোর কারণে বিষধর কীটপতংগকে ভয় পাবার স্মৃতি আমরা নিজেদের অজান্তেই আমাদের জিনে বহন করি। সে হিসেবে, বাস ট্রাকের ব্যাপারগুলো আমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত নতুন, তাই এগুলোকে ভয় পাবার

কোনো স্মৃতি আমরা এখনো আমাদের জিনে (এখনো) তৈরি করতে পারিনি। সেজন্যই বোধ হয় বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লিডা কসমিডস এবং জন টুবি আধুনিক মানুষকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন – 'Our modern skull house a stone age of mind'।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান অনেক কিছু খুব পরিষ্কার এবং বোধগম্যভাবে ব্যাখ্যা করলেও, এর অনেক উপসংহার এবং অনুসিদ্ধান্ত এতই বিপ্লবাত্মক (Radical) যে এটি অবগাহন করা সবার জন্য খুব সহজ হয়নি, এখনো হচ্ছে না। এর অনেক কারণ আছে। একটা বড় কারণ হতে পারে- আমাদের মধ্যকার জমে থাকা দীর্ঘদিনের সংস্কার। অধিকাংশ মানুষ মনে করে, শিশুরা জন্ম নেয় একটা স্বচ্ছ স্লেটের মত, মানুষ যত বড় হতে থাকে– তার চারপাশের পরিবেশ ও পারিপার্শিকতার মাধ্যমে ঐ স্বচ্ছ স্লেটে মানুষের স্বভাব ক্রমশ লিখিত হতে থাকে। অর্থাৎ, ভালো-মন্দ সবকিছুর জন্য দায়ী হচ্ছে একমাত্র পরিবেশ। খারাপ পরিবেশে থাকলে স্লেটে লেখা হবে হিংস্রতা কিংবা পাশবিকতার বীজ, আর ভালো পরিবেশ পেলে স্লেটও হয়ে উঠবে আলোকিত। ব্রিটিশ দার্শনিক লক (১৬৩২ -১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দ) এই 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। এখনো অনেকেই (বিশেষতঃ যাদের আধুনিক জেনেটিক্স কিংবা বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান পড়া হয়ে উঠেনি) এই মতবাদে বিশ্বাস করেন। বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের মধ্যে এই ধারণাটি বোধগম্য কারণেই খুবই জনপ্রিয়। এই কিছুদিন আগেও ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার তার এক বক্তৃতায় বললেন –

> 'একটি শিশু যখন ৬ বছর বয়সে প্রথম স্কুলে যেতে শুরু করে তার মন থাকে যেন শুন্য এক বাস্কেট। তারপর ধীরে ধীরে তাদের বাস্কেট ভর্তি হতে শুরু করে। ১৮ বছর বয়স হতে হতে তাদের শূন্য বাস্কেট প্রায় পুরোটাই ভর্তি হয়ে উঠে। এখন কথা হচ্ছে কাকে দিয়ে শিশুটির এই বাস্কেট পূর্ণ হবে? এটা কি ভালো একজন শিক্ষক, অভিভাবক, বন্ধু নাকি অসৎ মানুষজনদের দিয়ে?'

এই ব্ল্যাঙ্ক স্লেট তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানে খুবই জনপ্রিয় এবং বোধ্য কারনেই। সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা এমিল ডার্খেইম ১৮৯৫ সালেই বলেছিলেন যে, 'সমাজবিজ্ঞানের প্রধান অনুকল্পই হলো প্রতিটি মানুষকে ব্ল্যাঙ্ক স্লেট হিসেবে চিন্তা করতে হবে। মানুষ হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক স্লেট– অন হুইচ কালচার রাইটস'। এর পর থেকে 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' দর্শনটি সমাজবিজ্ঞানের জগতে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবেই পরিগন্য হয়– 'সব মানুষ আসলে জন্মগতভাবে সমান, খারাপ পরিবেশের কারণেই মানুষ মূলত খারাপ হয়ে উঠে'।

কিন্তু এই 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট'-এর ধারণা কি আসলে মানবমনের প্রকৃত স্বরূপকে তুলে ধরে? এম.আই.টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের (বর্তমানে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের) অধ্যাপক অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার ২০০৩ সালে একটি বই লেখেন 'The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature' শিরোনামে। তিনি বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে গেঁথে যাওয়া এবং জনপ্রিয় এই 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট'তত্ত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে একে একধরনের 'ডগমা' হিসবে আখ্যায়িত করেন (ইন্টারনেটে ইউটিউবে অধ্যাপক পিঙ্কারের কিছু লেকচার রাখা আছে[315], উৎসাহী পাঠকদের জন্য নিঃসন্দেহে হবে মনের খোরাক)।

পিঙ্কার দাবি করেন, আমাদের কানে যতই অস্বস্তিকর শোনাক না কেন, কোনো শিশুই আসলে 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' হয়ে জন্ম নেয় না। বরং একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, প্রতিটি শিশু জন্ম নেয় কিছু না কিছু জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে পুঁজি করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ছাপ পরিণত অবস্থাতেও রাজত্ব করে অনেক ক্ষেত্রেই। শুধু মানুষ কেন - প্রানী জগতের দিকে দৃষ্টি দিলেও ব্যাপারটা খুব ভালোমতই বোঝা যাবে। গুবরে পোকাকে ধরবার জন্য ইঁদুর যত তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে, কবুতর তত তাড়াতাড়ি

[315] অধ্যাপক পিঙ্কারের বক্তৃতার ইউটিউবের লিঙ্ক : http://www.youtube.com/watch?v=CuQHSKLXu2c

পারে না। বিড়াল যত ভালোভাবে রাতে দেখতে পায়, মানুষ তা পায় না। এই বিষয়গুলো কোনোভাবেই 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ব্যাখ্যা করা যায় না একই প্রজাতির মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যগুলোও। একই প্রজাতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও কেউবা শ্লথ, কেউবা ক্ষিপ্র, কেউবা বাঁচাল, কেউবা শান্ত, কেউবা অস্থির, কেউ বা রয়ে যায় খুব চুপচাপ। জিনগত পার্থক্যকে গোনায় না ধরলে করলে প্রকৃতির এত ধরনের প্রকরণকে কোনো ভাবেই সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। ১৯৮০র দশকে টম ইনসেল নামে এক বিজ্ঞানী প্রেইরি ভোলস এবং মোন্টেন ভোলস নামে দু' প্রজাতির ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে হরমোনের প্রভাবে তাদের যৌন-প্রবৃত্তির পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞানীরা এ ধরনের আরো গবেষণা করে দেখেছেন, জিন ম্যানিপুলেশন করে নিম্ন স্তরের প্রাণীদের মধ্যে আগ্রাসন, নমনীয়তা, হিংস্রতা, ক্ষিপ্রতা বা শ্লথতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলির তারতম্য তারা ঘটাতে পারেন। অর্থাৎ, বংশানুর বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের কারণে প্রাণিদের স্বভাবেও পরিবর্তন আসে। এখন কথা হচ্ছে, মানুষও কিন্তু প্রকৃতিজগত এবং প্রাণীজগতের বাইরের কিছু নয়। অথচ, বংশাণুজনিত পার্থক্যের কারণে মানুষে মানুষে স্বভাবগত পার্থক্য হতে পারে - মানুষের ক্ষেত্রে এই রূঢ় সত্যটি মানতে অনেকেই আপত্তি করবেন।

বংশানুর বৈশিষ্ট্যের তারতম্য যদি মানুষের স্বভাবের পরিবর্তনের বলিষ্ঠ ব্যাখ্যা হয়, তবে কাছাকাছি বা প্রায় একই বংশানুযুক্ত লোকজনের ক্ষেত্রে একই স্বভাবজনিত বৈশিষ্ট পাওয়া উচিত। স্টিভেন পিঙ্কাররা বলেন তাই পাওয়া যাচ্ছে। পিঙ্কার তার 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' বইয়ে অভিন্ন যমজদের (আইডেন্টিকাল টুইন) নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণার বেশ কিছু মজার উদাহরণ হাজির করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, অভিন্ন যমজদের একে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ভিন্ন পরিবেশে বড় করা হলেও তাদের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য থেকেই যায়, শুধু চেহারায় নয়- আচার, আচরণ, অভিরুচি, খাওয়া দাওয়া এমন কি ধর্ম কর্মের প্রতি আসক্তিতেও। ইউনিভার্সিটি অব মিনিসোটার গবেষকেরা একসময় পঞ্চাশ জোড়া অভিন্ন যমজদের নিয়ে গবেষণা

করেন, যে যমজেরা জন্মের পর পরই কোনো না কোনো কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ভিন্ন ধরনের পরিবেশে বড় হয়েছিল। তাদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে গবেষকেরা লক্ষ্য করলেন, তারা আলাদা পরিবেশে বড় হলেও তার বিচ্ছিন্ন হওয়া সহোদরের সাথে আচার-আচরণে অদ্ভুত মিল থাকে। সবচেয়ে মজার হচ্ছে অভিন্ন যমজ সহোদর অস্কার এবং জ্যাকের উদাহরণটি। জন্মের পর পরই বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্কার বড় হয়েছিল চেকোশ্লাভাকিয়ার এক নাৎসী পরিবারে, আর জ্যাক বড় হয়েছিল ত্রিনিদাদের ইহুদি পরিবারে। তারপরও তারা যখন চল্লিশ বছর পরে প্রথমবারের মতো মিনিসোটায় একে অপরের সাথে দেখা করতে আসলেন, তখন দেখা গেলো তারা দুজনেই গাঢ় নীল রঙের শার্ট পড়ে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের দু'জনের হাতের কব্জিতেই রাবারব্যান্ড লাগানো। দু'জনেই কফিতে বাটার টোস্ট ডুবিয়ে খেতে পছন্দ করতেন; তাদের দু'জনেই বাথরুম ব্যবহার করতে গিয়ে টয়লেট ব্যবহারের আগেই একবার করে ফ্ল্যাশ করে নিতেন, এমনকি দু'জনেরই একটি সহজাত মুদ্রাদোষ ছিল– দু’জনেই এলিভেটরে উঠে হাঁচি দেয়ার ভঙ্গি করতেন, যাতে লিফটের অন্য সহযাত্রীরা আঁতকে উঠে দু'পাশ থেকে সরে যায়। থমাস বুচার্ড নামের আরেক গবেষকের গবেষনায় জিম স্প্রিঙ্গার এবং জিম লুইস নামের আরেকটি অভিন্ন যমজের চাঞ্চল্যকর মিল পাওয়া গিয়েছিল যা মিডিয়ায় রীতিমতো হৈ চৈ ফেলে দেয়। জন্মের পর ভিন্ন পরিবেশে বড় হবার পরও জিম-যমজদ্বয় যখন একত্রিত হল, দেখা গেল– তাদের চেহারা এবং গলার স্বরে কোনো পার্থক্যই করা যাচ্ছে না। একই রকম বাচনভঙ্গি, একই রকম চাহনি, একই রকম অবসাদগ্রস্থ চোখ। তাদের মেডিকেল-হিস্ট্রি থেকে জানা গেল, তারা দুজনেই উচ্চ রক্তচাপ, হেমোরইডস এবং মাইগ্রেনের সমস্যায় ভুগছেন। তারা দু’জনেই সালীম সিগারেটের ভক্ত, দুজনেরই টেনশনে নখ কামড়ানোর অভ্যাস আছে এবং দুজনের জীবনের একই সময় ওজন বাড়া শুরু হয়েছিল। শুধু তাই নয়– তাদের দুজনের কুকুরের নাম ‘টয়’। তাদের দুজনের স্ত্রীদের নাম ‘বেটি’, এবং তাদের দুজনেরই আগে একবার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছিল। এবং এদের প্রাক্তন স্ত্রীদের নামও কাকতালীয় ভাবে এক - ‘লিন্ডা’। এখানেই শেষ নয়-

দুজনের প্রথম সন্তানের নামও ছিল একই– ‘জেমস অ্যালেন’; যদিও নামের বানান ছিল একটু ভিন্ন। আরেকটি ক্ষেত্রে দেখা গেল দুই যমজ মহিলা হাতে একই সংখ্যার আংটি পড়ে এসেছিলেন। তাদের একজন প্রথম ছেলের নাম রেখেছিলেন রিচার্ড এন্ড্রু, আর অপরজন রেখেছিলেন এন্ড্রু রিচার্ড। সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এসমস্ত মিলগুলোকে নিতান্তই ‘কাকতালীয়’ কিংবা ‘অতিরঞ্জন’ ভাবার যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও মূল উপসংহার কিন্তু ফেলে দেয়ার মতো নয়– আমরা আমাদের স্বভাব-চরিত্রের অনেক কিছুই হয়ত আসলে বংশানুর মাধ্যমে বহন করি এবং দেখা গেছে অভিন্ন যমজদের ক্ষেত্রে এই উপরের ‘কাকতালীয়’ মিলগুলো অসদ যমজদের থেকে সবসময়ই বেশি থাকে। শুধু মিনিসোটার যমজ গবেষণা নয়; ভার্জিনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ড, সুইডেন এবং ব্রিটেনের গবেষকেরাও তাদের গবেষণা থেকে একই ধরনের ফল পেয়েছেন। এ ধরনের বেশকিছু গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ আছে উইলিয়াম ক্লার্ক এবং মাইকেল গ্রুন্সটেইনের ‘Are We Hardwired?: The Role of Genes in Human Behavior’ নামের বইটিতে। লেখকদ্বয় বলেছেন –

> ‘For nearly all measures personality, heritability is high in western society: identical twins raised apart are much more similar than the fraternal twins raised apart.’।

সাইকোপ্যাথ এবং সিরিয়াল কিলারদের নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোও আমাদের জন্য অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছে পুরোমাত্রায়। আমেরিকায় প্রতি ২৫ জনে একজন মনোবিকারগ্রস্থ সাইকোপ্যাথ আছে বলে মনে করা হয়। মনোবিজ্ঞানী মার্থা স্কাউট তার ‘The Sociopath Next Door’ বইয়ে অন্তত তিনটি জার্নাল থেকে রেফারেন্স হাজির করে দেখিয়েছেন যে, আপনার প্রতিবেশিদের মধ্যেই হয়ত লুকিয়ে আছে একজন মনোবিকারগ্রস্থ সাইকোপ্যাথ। তারা আমার আপনার মতো একই রকম ‘ভালো পরিবেশে’ বাস করছে, দৈনন্দিন জীবন যাপন করছে কিন্তু আপনার আমার মতো সচেতনতা জিনিসটাকে মাথায় ধারণ করে না। এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছেন

রবার্ট হেয়ার তার ‘Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us’ বইয়ে। কোনো নিয়ম, নীতি, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ তাদের মধ্যে তৈরি হয় না। আসলে এসমস্ত ‘মানবিক’ বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে একজন সাইকোপ্যাথের কাজকে ব্যাখ্যার চেষ্টাই হবে বোকামি। অত্যন্ত স্বার্থপর ভাবে মনোবিকারগ্রস্থ সাইকোপ্যাথ তার মাথায় যেটা থাকে, সেটা করেই ছাড়ে। যখন কোনো সাইকোপ্যাথের মাথায় ঢোকে কাউকে খুন করবে, সেটা সম্পন্ন করার আগ পর্যন্ত তার স্বস্তি হয় না। পিঙ্কার তার বইয়ে জ্যাক এবট্ নামক এক সাইকোপ্যাথের উদ্ধৃতি দিয়েছেন খুন করার আগের মানসিক অবস্থা তুলে ধরে–

> ‘তুমি টের পাবে যে তার জীবন-প্রদীপ তোমার হাতে ধরা ছুরির মধ্যে দিয়ে তির তির করে কাঁপছে। তুমি বুঝতে পারবে হত্যার জিঘাংসা তোমাকে ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে। তোমার শিকারকে নিয়ে একটু নিরালয়ে চলে যাবে যেখানে গিয়ে তুমি তাকে একেবারে শেষ করে দিতে পারো। ... মাখনের মধ্যে ছুরি ঢুকানোর মতই সহজ একটা কাজ– কোনো ধরনের বাধাই তুমি পাবে না। তাদের চোখে শেষ মুহূর্তে এক ধরনের অন্তিম কাতরতা দেখবে, যা তোমাকে আরো উদ্দীপ্ত করে তুলবে’।

জ্যাক দ্য রিপার, 'বিটিকে কিলার' ডেনিস রেডার,'গ্রীন রিভার কিলার' গ্রে রিজ ওয়ে, 'সন অব স্যাম' ডেভিড বার্কোউইজ, 'বুচার অব রুস্তভ' আঁদ্রে চিকাতিলো, চার্লস এং, ডেরিক টড লি, জন ওয়েন গেসি প্রমুখ বড় সাইকোপ্যাথের উদাহরণগুলোর কথা আমরা সবাই কম বেশি জানি। কিন্তু সবচেয়ে অস্বস্তিকর যে বিষয়টি তুলে এনেছেন তার বইয়ে পিঙ্কার, সেটি হলো- ‘‘মনোবিকারগ্রস্তদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরাময় করা যায় না’’। তিনি বলেন,

> Psychopaths, as far we know, cannot be 'cured'. Indeed, the psychologists Marine Rice has shown that has shown that certain harebrain ideas for therapy, such as boosting their self esteem and teaching them social skills, can even

make more dangerous.

সমাজের নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ শেখানোর মাধ্যমে যে মনোবিকারগ্রস্থ মানুষদের স্বভাব অনেক সময়ই পরিবর্তন করা যায়না সেই ‘সত্যটি’ (?) পিঙ্কার তার বইয়ে তুলে ধরেছেন উপরে উল্লিখিত জ্যাক এবট্-এর একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করে। ঘটনাটি এরকম: পুলিতজার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক নর্মান মেইলার জেলখানায় বন্দী দাগি আসামী জ্যাক এবট্ -এর কিছু চিঠি পড়ে এতই মুগ্ধ হন যে, যে তিনি নর্মান মেইলারকে জামিনে মুক্তি পেতে সাহায্য করেন। নর্মান মেইলার সে সময় গ্যারি গিলমোর নামের আরেক অপরাধীকে নিয়ে একটি বই লেখার কাজ করছিলেন। জ্যাক এবট্ তার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লেখককে সহায়তা করার প্রস্তাব দেন। জ্যাক এবট্-এর রচনা এবং চিন্তা ভাবনা নর্মান মেইলারকে এতটাই অনুপ্রাণিত করেছিল যে, তিনি এবট্কে ‘প্রথাবিরুদ্ধ বুদ্ধিজীবী এবং সম্ভাবনাময় লেখক’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন; শুধু তাই নয়, তাঁকে লেখা এবটের চিঠিগুলো সংকলিত করে তিনি ১৯৮০ সালে এবটের একটি বই প্রকাশ করতে সহায়তাও করেন, বইটির নাম ছিল -‘In the belly of the beast’।

বইটি সে সময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। নর্মান মেইলারের তদ্বিরে ছাড়া পাওয়ার পর এবট্ বেশ নামীদামী মহলে অনেক বিদগ্ধ লোকজনের সাথে নৈশভোজেও আমন্ত্রিত হতেন। অথচ এর মধ্যেই- ছ' সপ্তাহের মাথায় নিজের সাইকোপ্যাথেটিক চরিত্রের পুনঃপ্রকাশ ঘটালেন এবট এক রেস্তোরার বেয়ারাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। ভাগ্যের কি পরিহাস- এবট যেদিন দ্বিতীয় হত্যাকান্ড সম্পন্ন করে পুলিশের খাতায় নাম লেখাচ্ছিলেন, ঠিক তার পরদিনই তার বই -‘In the belly of the beast’ -এর চমৎকার একটি রিভিউ বেরিয়েছিল নিউইয়র্ক টাইমস-এ। পত্রিকার সম্পাদক খুব আগ্রহ ভরেই সেটি ছাপিয়েছিলেন এবটের আগের দিনের হত্যাকান্ড সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থেকে।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা খুব স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেই

মনোবিকারগ্রস্থ কিংবা শিশুনিপীড়নকারীরা নিজেদের শিশুবয়সে নিপীড়নের শিকার হয়েছিল, সেজন্যই বোধহয় তারা বড় হয়ে অন্য মানুষদের মেরে কিংবা শিশুদের ধর্ষণ করে নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করে। এ ব্যাপারটি অনেকাংশেই ঠিক নয়। আমি যে বিটিকে খুনি ডেনিস রেডার, 'গ্রীন রিভার কিলার' গ্রে রিজ ওইয়ের উদাহরণ দিয়েছি, তারা কেউই শিশু বয়সে নিপীড়নের শিকার হয়নি। ডেনিস রেডার ছোটবেলায় খুব ভালো পরিবেশেই বড় হয়েছিলেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন, স্ত্রী, এবং দু ছেলে নিয়ে আর দশটা সাধারণ পরিবারের মতই জীবন যাপন করতেন। উৎসাহী পাঠকেরা বিটিকে সিরিয়াল কিলার ডেনিস রেডারের উপর একটা ডকুমেন্টরী ইউটিউব [316] থেকে দেখে নিতে পারেন।

গবেষক জোয়ান এলিসন রজার্স তাঁর ‘Sex: A Natural History’ বইটিতে লিখেছেন যে বেশির ভাগ শিশু যৌন নিপীড়নকারীদের নিজেদের জীবনে শিশু নিপীড়নের কোনো ইতিহাস নেই বলেই প্রমাণ মেলে। বংশাণুবিজ্ঞানী ফ্রেড বার্লিনের উদ্ধৃতি দিয়ে রজার্স তার বইয়ে বলেছেন যে, ‘ বিকৃত যৌন আচরণ শেখান নয়, এটা জৈবিকভাবেই অঙ্কুরিত’। অবশ্য তিনি এটাও বলতে ভুলেননি যে, সমাজকে রক্ষা করার জন্যই অপরাধীদের অবশ্যই শাস্তি দেয়া হয়, কিন্তু একই সাথে ঐ আচরণকে অর্থাৎ এ ধরনের প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টাও আমাদের চালিয়ে যাওয়া উচিৎ। স্টিভেন পিঙ্কারও তাঁর বইয়ের ৩১১ পৃষ্ঠায় বলেন যে কানাডীয়রা আমেরিকানদের মতো একই টিভি শো দেখে কিন্তু কানাডায় অপরাধজনিত হত্যার হার আমেরিকার ১/৪ ভাগ মাত্র। তার মানে সহিংস টিভি শো দেখে দেখে আমেরিকানরা সহিংস হয়ে উঠেছে– এই সনাতন ধারণা ঠিক নয়। আমাদের দেশে আমরা প্রায়ই বলি ‘হিন্দি ছবি দেখতে দেখতে পোলাটা বখে গেছে’ কিংবা বলি ‘ছোটবেলায় বাবা মা পিস্তল জাতীয় খেলনা কিনে দেয়াতেই আজকে পোলা মাস্তানি করে বেড়াচ্ছে’। কিন্তু এ ধরনের ‘বিশ্লেষণ’ আসলে কতটুকু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে তুলে ধরে? সত্যি বলতে কি- ‘জেনেটিক

---

[316] বিটিকে কিলার, ইউটিউবের লিঙ্ক - http://www.youtube.com/watch?v=OZ7BwKOA_7Q

ডিটারমিনিজম’ ঠেকাতে আমরা নিজের অজান্তেই ‘কালচারাল ডিটারমিনিজমের’ আশ্রয় নিয়ে নেই। খুন খারাবির পেছনে জেনেটিক কোনো প্রভাব থাকতে পারে, এটা অস্বীকার করে আমরা দোষারোপ করি ছোটবেলার খেলনাকে। কিংবা ধর্ষণের পেছনে পর্ণগ্রাফিকে। কিন্তু এই মনোভাবও যে আসলে উন্নত কোনো কিছু নয় তা ম্যাট রীডলী তার ‘এজাইল জিন’ বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে – ‘Cultural determinism can be as cruel as genetic determinism’। একই কথা বলেছেন নারীবাদী ডারউইনিস্ট হেলেনা ক্রনিন তার ‘Getting Human Nature Right’ প্রবন্ধে একটু অন্যভাবে- ‘কেউ যদি বংশানু নির্ণয়বাদকে ভয় পায়, তবে তার একই কারণে পরিবেশ নির্নয়বাদকেও ভয় পাওয়া উচিত’। পিঙ্কারও তার বইয়ে সহিংসতা নিয়ে আমাদের সনাতন ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বলেন, এ সমস্ত শিশুরা যুদ্ধ বা সহিংস খেলনার সাথে পরিচিত হবার অনেক আগেই সহিংস প্রবণতার লক্ষণ দেখায়। কাজেই শিশুরা আসলে আমাদের সমাজবিজ্ঞানীরা যেরকম ভাবে অনাদিকাল থেকে শিখিয়ে আসছেন– সেরকম ব্ল্যাঙ্ক স্লেট হয়ে জন্মায় না কখনই। আধুনিক বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের গবেষণার আলোকে অনেক ক্ষেত্রেই এর স্বপক্ষে সত্যতা পাওয়া গেছে। তারপরেও ‘ব্ল্যাঙ্ক স্লেট’ ডগমা আমাদের মানসপট আচ্ছন্ন করে আছে বহু কারণেই। বাংলায় ‘ব্ল্যাঙ্ক স্লেট ডগমাকে’ খণ্ডন করে মানব প্রকৃতির উপর জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা একেবারেই নেই বললেই চলে। মুক্তান্বেষার ২য় সংখ্যায় (জানুয়ারী ২০০৮) প্রকাশিত ‘মানব প্রকৃতি কি জন্মগত নাকি পরিবেশগত?’ নামের প্রবন্ধটি এ দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বলা যায়। আমার উপরের পরিসংখ্যানগুলোর অনেক কিছু অপার্থিবের লেখাতেও পাওয়া যাবে।

পাঠকদের মনে হয়ত চিন্তা আঁকিবুকি করতে শুরু করেছে এই ভেবে যে, এবটের মতো উদাহরণগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তো আমাদের কপালে ঘোর ‘খারাবি’ আছে। সব কিছু যদি ‘জিন’ই নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে তবে তো তা আমাদের ‘জেনেটিক ডিটারমিনেজম’ বা বংশানু নির্ণয়বাদের দিকে ঠেলে দেবে। চিন্তা করে

দেখুন- সব কিছু যদি জিনেই লেখা থাকে তাহলে আর আমাদের চেষ্টা করেই বা কি লাভ? ‘জিনেই লেখা আছে ছেলে বড় হয়ে সিরিয়াল কিলার হবে’, আর ‘মনোবিকারগ্রস্থ মানুষদের স্বভাব পরিবর্তন করা যায়না’- তা তো উপরেই দেখলাম। এই আপ্তবাক্যদ্বয় মেনে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে আর ভাগ্যবাদীদের সাথে পার্থক্য থাকল কোথায়?

না রসিকতা করছি না একেবারেই। আমার এই কথাকে হাল্কা কথা ভেবে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলে কিন্তু ভুল হবে। আমি হাল্কাভাবে ভাগ্যের কথা বললেও জেনেটিক্সের এই সমস্ত নতুন দিক বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই একদল ‘বিশেষজ্ঞ’ মানুষের আচার ব্যবহার, আনন্দ, হাসি কান্না, দুঃখ যাবতীয় সবকিছুকেই ‘জিনের’ মধ্যে খুঁজে পাওয়া শুরু করে দিলেন। এক দিকে রইলো ব্ল্যাঙ্ক স্লেট ওয়ালারা - যারা সবকিছু পরিবেশ বদল করেই সমাধান করে ফেলতে চান, আর আর অন্যদিকে তৈরি হলো আরেক চরমপন্থি ‘জেনেটিক ডিটারমিনিস্ট’-এর দল– যারা পরিবেশ অস্বীকার করে সব কিছু বংশানু দিয়েই ব্যাখ্যা করে ফেলেন। এই গ্রুপের একদল আবার আরো এক কাঠি সরেস হয়ে ‘জিন কেন্দ্রক ভাগ্যবাদ’ কিংবা ‘বংশানু নির্ণয়বাদ’ প্রচার করা শুরু করে দিলেন। যেমন, জিনোম প্রজেক্ট শেষ হবার পর পরই যুগল-সর্পিলের আবিষ্কারক অধ্যাপক জেমস ওয়াটসন বলা শুরু করলেন –

> ‘আগে মানুষ ভাবত আকাশের তারায় বুঝি ভাগ্য লেখা আছে। এখন মানুষ বুঝবে, ভাগ্য তারায় লেখা নেই, তার ভাগ্য লেখা রয়েছে জিনে’!

কিন্তু সত্যই কি তাই? ব্যাপারটা কি এতই সরল? ওয়াটসনের কথা মতো মানুষের সমস্ত ভাগ্য কি তাহলে জিনেই লেখা আছে?

না এতটা ভাগ্যবাদী কিংবা নৈরাশ্যবাদী হবার কোনো কারণ নেই। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বংশানুগুলো আমাদের মানসপটের বিনির্মাণ করলেও

সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোহার দরাজের মতো অনড় নয়, বরং অনেকক্ষেত্রেই কাদামাটির মতই নরম। পরিবেশের প্রভাবে এদের সক্রিয়করণ (activation) বা নিষ্ক্রিয়করণ (deactivation) ঘটানো যায়- অনেকটা বিদ্যুতের বাতির সুইচ অন অফ-এর মতই। যে বংশানুগুলোকে কয়েক বছর আগেও মনে করা হতো একদমই অনমনীয়, মনে করা হতো বংশানুর গঠনের সিংহভাগই ভ্রূণে থাকা অবস্থায় তৈরী হয়ে যায়, ভাবা হতো পরবর্তীকালের পরিবেশে এদের রদবদল হয় সামান্যই, আধুনিক 'এপিজেনেটিক্স'এর গবেষণা হতে পাওয়া ফলাফল এর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে বলেই এখন মনে করা হচ্ছে। জীববিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটি থেকে আমরা ক্রমশ জানতে পারছি পরিবেশ থেকে সংকেত নিয়ে দেহ কীভাবে তার অভ্যন্তরস্থ জিনের প্রকাশভঙ্গিকে (genetic expression) বদলে ফেলে। এজন্যই অনেক বিজ্ঞানী এদের চিহ্নিত করেন 'নমনীয় জিনোম' (Malleable Genome) হিসেবে, কেউ বা নাম দিয়েছেন 'এজাইল জিন'। সায়েন্টিফিক মাইন্ডের 'Determining Nature vs. Nurture: Molecular evidence is finally emerging to inform the long-standing debate' (2006) প্রবন্ধে আধুনিক 'এপিজেনেটিক্স'এর বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ডঃ ডাওসন চার্চ তার সাম্প্রতিক 'The Genie in Your Genes' বইয়ে পরিষ্কার করেই বলেছেন –

> 'Science is discovering that while we may have fixed set of genes in Chromosomes, which of those Genes is active has great deal to do which our subjective experiences, and how we process them'।

পিঙ্কারের উদাহরণে আরেকটিবার ফেরত যাই। সাইকোপ্যাথ জ্যাক এবটের অনমনীয় মনোভাবের যে উদাহরণ পিঙ্কার তার বইয়ে হাজির করেছেন তা হয়ত অত্যধিক 'চরম মাত্রার' উদাহরণ। আমাদের চারপাশের উদাহরণগুলো এমনতর চরম সীমায় অবস্থান করে না তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবেশ পরিবর্তন

করে করে কিংবা কড়া সামাজিক নিয়ম নীতি প্রয়োগ করে মানুষের ব্যবহার যে পরিবর্তন করা যায়, তা কিন্তু পরীক্ষিত সত্য। আমার জীবন থেকেই একটা উদাহরণ হাজির করি-

প্রথম আমেরিকায় আসার পর নতুন নতুন গাড়ি চালানো শুরু করেছি। প্রায় দু'বছর বড় ধরনের কোনো এক্সিডেন্ট ছাড়া সময় পার করে দেবার পর সাহস গেল অতিমাত্রায় বেড়ে। হাইওয়ে ছেড়ে বাসার উপরের ছোট্ট রাস্তায় ঢুকতে হলে যে একটু গতি কমিয়ে ঢুকতে হবে– তা মাথায়ই থাকতো না। যে রাস্তায় চলাচলের গতিসীমা সর্বোচ্চ ৩৫, সে রাস্তায় আমি ঢুকতাম প্রায় ৫০ মাইল বেগে। ফলে যা হবার তাই হল, এক বিকেলে অফিস থেকে ফেরার পথে ঘাপটি মেরে বসে থাকা পুলিশের গাড়ির খপ্পরে পড়ে গেলাম। ব্যাস জড়িমানা গুনতে হল। দিন কয়েক খুব সাবধানে গাড়ি চালালাম। তারপর ক'দিন বাদেই আবার যেই কি সেই। একদিন সকালে উঠে দেখলাম ঘড়িতে বাজে সাড়ে আটটা। ঠিক নয়টায় অফিসে একটা জরুরি মিটিং আছে। গাড়ি বের করে দেখলাম তেল নেই। তেল নিতে গিয়ে আরো মিনিট দশেক নষ্ট হল। এবারে বুঝলাম মিটিং আর ধরা যাবে না। পেট্রল পাম্প থেকে গাড়ি বের করে সেই রাস্তাটায় উঠে যেই না এক্সিলেটরে পা রেখে মেরেছি এক ধুন্ধুমার টান– অমনি পাশ থেকে পুলিশ বাবাজীর অভ্যুদয়। আবারো জড়িমানা। এক মাসের ব্যবধানে একই রাস্তার উপরে দু'দুবার টিকেট পাওয়ার পর বোধ হয় চৈতন্য ফিরলো। ফিরবে নাই বা কেন - এমন টিকেট আর বার দুয়েক পেলেই আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটাই চলে যাবে। এখন হাইওয়ে থেকে রাস্তায় উঠলেই দেখি যতই আনমনা থাকি না কেন, স্পীডোমিটারের কাঁটা কখনই ত্রিশ অতিক্রম করে না। শাস্তির ভয়ে কিংবা কঠোর নিয়ম নীতি আরপের ফলে যে মানুষ তার বহুদিনের অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারে এটাই তো একটা ভালো উদাহরণ।

আরেকটা উদাহরণ দেই। আমার পরিচিত এক বাংলাদেশী ভদ্রলোক (সঙ্গত

কারণেই নামটি উল্লেখ করছিনা) বাংলাদেশ থেকে বিয়ে করে বউ নিয়ে আমেরিকায় এসেছেন। স্বভাবে একটু বদরাগী। রাগের সময় মাথা ঠিক থাকে না অনেক সময়ই। ঝগড়ার সময় বউকেও চড় থাপ্পর মেরে বসেন। বউও প্রথম প্রথম সহ্য করত, কিংবা হয়ত মানিয়ে নিতে চাইত। কাউকে বলতো না। সবাই ভাবতো সুখের সংসার বুঝি তাদের। আর বউকে নেহাৎ গোবেচারা পেয়ে স্বামীরও সাহস গেল বেড়ে। নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলছিল। একদিন বউ থাকতে না পেরে নাইন-ওয়ান-ওয়ানে সোজা কল করে দিলো। পুলিশ এসে স্বামী বাবাজিকে ধরে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক বোধ হয় ভেবেছিলেন বউয়ের গায়ে একটু আধটু হাত তোলা আর এমন কি অপরাধ। দেশে তো সবাই করে! কিন্তু আমেরিকায় এগুলো আইন কানুন খুবই কড়া। তারপরও পুলিশ ভদ্রলকের কান্নাকাটি দেখে হয়ত মায়া করে গারদে না ঢুকিয়ে বকা ঝকা দিয়ে শেষপর্যন্ত ছেড়ে দিলেন। মনে করিয়ে দিলেন এরপর যদি গায়ে হাত তোলার অভিযোগ আসে, তাহলে তার কপালে বিপত্তি আছে। ভদ্রলোকও ছাড়া পেয়ে ভাবলেন ‘যাক! অল্পের উপর দিয়ে ফাঁরা কাটানো গেছে’। কিছু দিন ভালো থাকলেন, সংসার ধর্ম পালন করলেন। কিন্তু কথায় বলে বউ পেটানর স্বভাব নাকি মজ্জাগত, একবার যে বউয়ের গায়ে হাত তুলে, সে নাকি আবারো তুলে। ভদ্রলোকও আরেকদিন ঝগড়ার সময় বউয়ের গালে থাপ্পর মেরে বসলেন। আর বউও কল করলেন পুলিশে। এবারে ফলাফল হলো ভয়াবহ। স্বামী প্রবরকে ধরে নিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হলো সোজা জেল হাজতে। কেউ ছাড়াতে এলো না। এমনকি কাছের বন্ধু-বান্ধবেরাও নয়। দু’দিন হাজতবাসের পর শেষ পর্যন্ত স্বামীর কান্নাকাটিতে বোধ হয় বউয়ের দয়া হল। ভবিষ্যতের কথা ভেবে হোক, আর সামাজিকতার চাপেই হোক শেষ পর্যন্ত তিনি স্বামীর উপর থেকে অভিযোগ তুলে নিয়ে স্বামীকে জেল থেকে বের করে আনলেন। তবে পুলিশের মন এত সহজে গললো না। একেবারে ঠিকুজি কুঠি সমস্ত বৃত্তান্ত ফাইলবন্দী করে রাখলেন। বলে রাখলেন, তাকে নজরবন্দী রাখা হচ্ছে। ভবিষ্যতে কোনো ধরনের উল্টো-পাল্টা আচরণ দেখলেই সোজা ডিপোর্ট করে দেয়া হবে। তা বউ-পেটানো স্বভাব মজ্জাগত হোক আর শয্যাগতই হোক, পুলিশের ধাতানির উপর

তো আর কারো কথা নাই, কারণ বাঘে ছুলে পনের ঘা, আর পুলিশে ছুলে নাকি আঠারো ঘা। আর তাছাড়া ডিপোর্ট হবার ভয় আসলেই বাঙ্গালীর বড় ভয়। সবকিছু মিলিয়ে ভদ্রলোক এমন চুপসানো চুপসালেন যে, তার সেই পরিচিত আগ্রাসী চরিত্রই গেল বদলে। কারো সামনে আর মুখ তুলে কথা বলেন না। বউয়ের উপর এখন রাগ করা তো দূরের কথা- বউকে তোয়াজ করা ছাড়া এক পা চলেন না। বাংলায় যাকে বলে 'স্ত্রৈণ পুরুষ'– সেটাতেই রূপ নিয়ে নিলেন পুরোমাত্রায়।এই ঘটনার পর বহুবছর কেটে গেছে। বউয়ের উপর নির্যাতনের আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কাজেই জিন-ওয়ালাদের দাবি অনুযায়ী বউ পেটানোর অভ্যাস যদি কারো মজ্জাগত কিংবা বংশানুক্রমিক হয়েও থাকে, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় চাপ অর্থাৎ সর্বোপরি পরিবেশ বাধ্য করে তার প্রকাশভঙ্গিকে বদলে ফেলতে।

আমার গাড়ি চালানোর উদাহরণটা কিংবা উপরের 'ভদ্রলোকের' বউ-পেটানোর উদাহরনটি নেহাৎ খুব ছোট স্কেলে, বড় স্কেলে ঘটা উদাহরণগুলোতে একটু চোখ বুলাই। দেশে যখন খুন-খারাবী কিংবা রাহাজানি বেড়ে যায়, তখন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইন শৃংখলা বাড়ানোর প্রচেষ্টা নেয়া হয়, কখনো বিশেষ আইন প্রবর্তন করা হয় বা ট্রাইবুনালের ব্যবস্থা নেয়া হয়। আশির দশকে যখন বাংলাদেশে এসিড নিক্ষেপের হার ভয়ানকভাবে বেড়ে গিয়েছিল, তখন সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ আইন প্রবর্তন করে তা বন্ধের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল, জনসচেতনতা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল– যেন এধরনের অমানুষিকতা বন্ধ হয়। বছর খানেকের মধ্যে দেখা গেল এসিড নিক্ষেপের হার অনেক কমিয়ে আনা গিয়েছে। দেশের বাইরে এ ধরনের উদাহরণ আরো অনেক বেশি। বহু দাগী আসামী যারা তারুন্যে সহিংস কিংবা জনবিরোধী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ছিল, কিংবা পরিচিত ছিল গ্যাংস্টার হিসেবে তাদের অনেককেই পরবর্তীতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে তাদের ব্যাবহার পরিবর্তন করেই। এদের অনেকেই তাদের অতীতের কর্মকান্ড লিপিবদ্ধ করে বইও লিখেছেন, কেউ বা আজ এক্টিভিস্ট হিসবে কাজ করছেন; মানুষকে তাদের অতীত

থেকে শিক্ষা নিতে অনুপ্রাণিত করেছেন। দাবি-দাওয়া পূরণ করে ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের কারখানায় ফিরিয়ে নেওয়া, সারের দাম কমিয়ে কৃষকদের শান্ত করার উদাহরণ আমরা প্রতিদিনের পত্রিকাতেই পড়ি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কার্ফু জারি করে উন্মত্ত জনতাকে স্বাভাবিক আর শৃঙ্খলিত জীবনে ফিরিয়ে আনা যায় তা আমরা বহুক্ষেত্রেই দেখেছি।

তাই জিন আমাদের মানসিক কাঠামোর বীজ বপন করলেও কখনোই আমাদের গন্তব্য নির্ধারণ করে না। পরিবেশের একটা প্রভাব থেকেই যায়। চাকরির টেনশন, স্ট্রেসফুল জীবন যাপনের প্রভাব শরীরে যে পড়ে সেটা পরীক্ষিত সত্য। ধূমপান, অত্যধিক মদ্যপান, ড্রাগ সেবনের প্রভাব শরীরে আছে বলেই ডাক্তাররা সেগুলো থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে পরামর্শ দেন। সেজন্যই একই ধরনের জিন শরীরে বহন করার পরও অনেক সময় দেখা যায়, অভিন্ন যমজদের একজন দিব্যি সুস্থ সবল রয়েছে, অন্যজন বেহিসেবী জীবন যাপনে শরীরকে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। ২০০৬ সালের আগাস্ট মাসে প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় 'Live Long? Die Young? Answer Isn't Just in Genes'[317] প্রবন্ধে কলামিস্ট জিনা কোলাটা দুই যমজ বোনের উদাহরণ হাজির করে দেখিয়েছেন এক বোন ৯২ বছর বয়সেও দিব্যি সুস্থ সবল এবং রোগমুক্ত জীবনযাপন করছে, অথচ অন্য যমজ বোনটির অবস্থা আক্ষরিক অর্থেই 'কেরোসিন'! সম্প্রতি রোগাক্রান্ত বোনটির 'হিপ রিপ্লেসমেন্ট' করতে হয়েছে, 'ডিজেনেরেটিভ ডিসঅর্ডারে' দৃষ্টিশক্তি প্রায় পুরোটাই চলে গেছে। দেহের অস্থিক্ষয়ের পরিমাণও উল্লেখ করার মতই। আসলে জীবন-যাপন এবং অভ্যাসের প্রভাব যে দেহের উপর পড়ে তা অস্বীকার করা উপায় নেই। সে জন্যই চিকিৎসক অধ্যাপক মাইকেল রেবিনফ বলেন,

'অভিন্ন যমজেরা একই ধরনের জিন বিনিময় করলেও সেই জিনগুলো দেহে

---

[317] Live Long? Die Young? Answer Isn't Just in Genes, GINA KOLATA, The NewYork Times, August 31, 2006, Online link: http://www.nytimes.com/2006/08/31/health/31age.html

একই ধরনের রোগের প্রকাশ অনেকসময়ই ঘটায় না, যদিও সাধারণভাবে ব্যাপারটিকে খুবই জেনেটিক বলে মনে করা হয়।'

আরেকটি চাঞ্চল্যকর ফলাফল পাওয়া গেছে সম্প্রতি অধ্যাপক র‍্যান্ডি জার্টেল এর ইঁদুর নিয়ে গবেষণা থেকে। তিনি দেখেছেন, Agouti নামের যে জিনটি মানুষের ওবিসিডি এবং টাইপ২ ডায়াবেটিসের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয় সেটি এক ধরনের ইঁদুরের মধ্যেও প্রবলভাবে দৃশ্যমান। হলুদ বর্ণের এই এগুটি ইঁদুর জন্মের পরপরই রাক্ষসের মতো কেবল খেয়েই চলে। এবং এদের অধিকাংশই মানুষের মতো ক্যান্সার এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি মারা যায়। এমনকি তাদের বাচ্চা জন্ম নিলেও তারা এ সমস্ত রোগের ঝুঁকি নিয়েই জন্মায়। অধ্যাপক জার্টেল কিছু ইঁদুরকে আলাদা করে ল্যাবের কাঁচের জারে রেখে তাদের খাদ্যাভাসের পরিবর্তন ঘটালেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দেখলেন ইঁদুরদের জেনেটিক প্রকাশভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে, এবং বাচ্চা যা জন্ম নিচ্ছে তা অধিকাংশই রোগের ঝুঁকিমুক্ত। এমনকি সদ্য জন্মানো বাচ্চার গায়ের রঙেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পেলেন গবেষকেরা। আনবিক স্তরে জেনেটিক কোডের কোনো ধরনের পরিবর্তন না করে শুধু খাদ্যাভাস এবং পরিবেশ বদলে দিয়ে দেহজ বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের এক অনন্য নজির পেলেন তারা। তারা বুঝলেন মানুষের ক্ষেত্রে জেনেটিকভাবে হৃদরোগ কিংবা ডায়াবেটিস এর ঝুঁকি নিয়ে আমাদের অনেকেই জন্মানোর পরও ডাক্তারদের কথা শুনে কম শর্করা আর চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়ার অভ্যাস করে, নিয়মিত ব্যায়াম করে, ধূমপানমুক্ত জীবন যাপন করে কীভাবে আমরা এ সমস্ত রোগের ঝুঁকি কমিয়ে নিতে পারি।

এখন কথা হচ্ছে, পরিবেশ বদলে দিয়ে দেহজ বৈশিষ্ট্য যদি পরিবর্তন করা যায় তা না হয় দেখলাম, কিন্তু পরিবেশ বদলে দিয়ে একইভাবে মানসিক প্রকাশভঙ্গিকেও কি বদলানো সম্ভব? বিজ্ঞানীরা বলেন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব। মোজে সিজফ এবং

মাইকেল মেনি– এ দুজন বিজ্ঞানীও জার্টেলের মতই ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তারা দেখলেন একধরনের ইঁদুর আছে যাদের মা ইঁদুরেরা তাদের বাচ্চাদের জন্য জন্য কোনো ধরনের যত্ন-আত্তি করে না। মা'দের আরেক দল আছে যারা আবার বাচ্চা জন্মানোর পর থেকেই জিব দিয়ে গা চেটে আর অতিরিক্ত আদর যত্ন করে বাচ্চাদের বড় করে। দেখা গেছে যে বাচ্চাগুলোর আদর যত্ন নেয়া হয় তারা অনেক সাহসী, সামাজিকভাবে বন্ধুভাবাপন্ন আর শান্ত হয়ে বেড়ে উঠে। আর মায়ের অবলায় থাকা বাচ্চারা বেড়ে উঠে অস্থির আর ভীতু স্বভাবের হয়ে। তাদের দু দলের ব্রেনেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন বিজ্ঞানীরা। আদর পাওয়া বাচ্চাদের মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস নামের প্রত্যঙ্গটি থাকে অনেক বিবর্ধিত, আর তাদের স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের (cortisol) উপস্থিতি অনেক কম পাওয়া গেল। আর অবহেলায় বড় হওয়া বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই হরমোন পাওয়া গেল অনেক বেশি। মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যারা খুব স্ট্রেস্ফুল জীবন যাপন করে থাকে, তাদের দেহে কর্টিসলের উপস্থিতি থাকে মাত্রাতিরিক্ত বেশি। তাদের হৃদরোগের ঝুঁকিও থাকে অনেক প্রবল। ডঃ সজফ এক অদ্ভুত কাজ করলেন। তিনি ওই ভীতু ইঁদুর দলের ব্রেনে এমন এক ধরনের এনজাইম (এসিটাইল গ্রুপ) প্রবেশ করালেন যা কর্টিসলের উৎপাদনকে বাধা দেয়। দেখা গেল ইঁদুরদের স্বভাবে পরিবর্তন এসেছে। তারা এখন অনেক সাহসী হয়ে উঠেছে। আবার একইভাবে আদরে বড় হওয়া সাহসী ইঁদুরের দল থেকে ইঁদুর নিয়ে তাদের মাথায় মিথাইল গ্রুপ প্রবেশ করিয়ে ভীতু আর অস্থির বানিয়ে দিলেন তারা। এদের গবেষণাকে ফিচার করে সম্প্রতি একটি নিবন্ধ লেখা হয়েছে জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকা ডিস্কভার-এ। প্রবন্ধের শিরোনাম - DNA Is Not Destiny [318]।

ইঁদুরের ক্ষেত্রে (উপরের উদাহরণে) দেখা গেছে, যে সব বাচ্চাকে আদর যত্ন

[318] DNA Is Not Destiny, The new science of epigenetics rewrites the rules of disease, heredity, and identity; Ethan Watters, Discover Magazine, Nov. 2006 issue, Online link: http://discovermagazine.com/2006/nov/cover/?searchterm=Randy%20Jirtle

নেয়া হয়েছে তারা অনেক সাহসী, সামাজিকভাবে বন্ধুভাবাপন্ন আর শান্ত হয়ে বেড়ে উঠেছে। তারা থাকে অন্যদের প্রতি অনেক সংবেদনশীল। আর মা বাবার আদর যত্ন না পেয়ে বড় হওয়া বাচ্চাগুলো হয়ে উঠে অস্থির, ভীতু এবং অসামাজিক। মানুষের ক্ষেত্রেও কি এটা ঘটা সম্ভব নয়? যে বাচ্চারা মা বাবার আদর যত্ন না পেয়ে অবহেলায় বড় হয় তাদের মধ্য থেকেই একটা অংশ হয়ত বড় হয়ে অসামাজিক কাজ কর্মে জড়িয়ে পড়ে? ব্যাপারটা সরলীকরাণ মনে হলেও এটা ঘটা সম্ভব খুবই সম্ভব। সেজন্যই বোধ হয় প্রতিটি মা বা শিশুকে একটা ভালো পরিবেশ দিয়ে আদর যত্ন করে বড় করতে চান। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক এরিক নেস্টলার দীর্ঘদিন ধরে বিষন্নতায় ভোগা রোগীদের মাথার ভিতরে হিপোক্যাম্পাস পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, তাদের হিপোক্যাম্পাসের আকার এবং আয়তন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক সঙ্কীর্ণ থাকে। শুধু তাই নয়, তাদের হিপোক্যাম্পাসের মধ্যকার একধরনের প্রোটিনে (হিস্টোন) মিথাইল গ্রুপের অস্তিত্ব আবিস্কার করেছেন (অনেকটা ওই ভীতু ইঁদুর দলের মতই)। বিজ্ঞানীরা এখন জানেন কীভাবে মানুষের বিষন্নতা সারাতে হয়। তারা ওষুধের মাধ্যমে এসিটাইল গ্রুপকে হিস্টোনের সাথে সংযুক্ত করে দেন, যা মিথাইল গ্রুপের কাজকর্মকে বাধা দেয়। এজন্যই এন্টি-ডিপ্রেসেন্ট ওষুধগুলো এত সহজে কাজ করে– বিষন্নতা দূর করে মনকে ফুরফুরে করে তোলে। শিকাগোর ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেনিস গ্রেসন স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্তান্ত রোগীদের উপর এসিটাইল গ্রুপের ঔষধ প্রয়োগ করে অনেক রোগীকেই সারিয়ে তুলতে পেরেছেন। অনেক বিজ্ঞানীই এখন মনে করেন শিশু বয়েসের পরিবেশ, পরিচর্যা আমাদের মানসজগত গঠনে সাহায্য শুধু করে না, পরবর্তীতে জিনের প্রকাশভঙ্গিকে বদলে দেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখে। যতই এপিজেনেটিক্সের আধুনিক গবেষণার ফলাফল বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে, ততই মানব প্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনে জেনেটিক্সের পাশাপাশি পরিবেশ এবং পরিচর্যার গুরুত্ব আরো বেশি করে বোঝা যাচ্ছে, আর এগুলো মানব প্রকৃতি বিষয়ক বিতর্কে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। সায়েন্টিফিক আমেরিকান মাইন্ডের ২০০৬ সালের

অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যায় এ জন্যই বলা হয়েছে –

> নতুন গবেষণার ফলাফলের আলোকে এখন বোঝা যাচ্ছে মায়ের পরিচর্যার রীতি শিশুর জিনের প্রকাশভঙ্গির উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

এপিজেনেটিক্স ছাড়াও ব্রেনের নিউরোপ্লাস্টিসিটি নিয়ে পল ব্যাচি রিটা, মাইকেল মার্জেনিচ, ভিলায়ানুর রামাচন্দ্রনের আধুনিক গবেষণাগুলোও খুব পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে কীভাবে পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের মস্তিষ্কও নিজেকে বদলে ফেলতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরো বিষদভাবে জানতে হলে উৎসুক পাঠকেরা নর্মান দইজের The Brain That Changes Itself (২০০৭) বইটি পড়ে নিতে পারেন।

তাহলে পরিবেশ নির্নয়বাদ বনাম বংশানু নির্ণয়বাদের এই দড়ি টানাটানি থেকে তাহলে কি উপসংহার বেরিয়ে এলো? বেরিয়ে এলো যে, সম্পূর্ণ বংশানুনির্ণয়বাদী হওয়া কিংবা সম্পূর্ণ পরিবেশ নির্ণয়বাদী হওয়া- দুই ক্ষেত্রই ভুল। মানব প্রকৃতি গঠনে জিন বা বংশানুর প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে পরিবেশের। জিনের গুরুত্ব এ কারণে যে, আমরা বংশগতভাবে যে সমস্ত জিনগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছি, তার টার্ন অন বা অফের মাধ্যমে জেনেটিক এক্সপ্রেশন বদলাতে পারি পরিবেশ থেকে বিবিধ সিগন্যাল নিয়ে। কিন্তু কোনো কারণে সেই মুল জিনটিই যদি আমার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে, আমি যত সিগন্যাল পাঠাই না কেন তা বদলানো সম্ভব হবে না। আবার পরিবেশের গুরুত্ব সবসময়ই থাকবে কারণ জিনের প্রকাশভঙ্গী বদলানোর ব্যাপারটা নির্ভর করছে পরিবেশ থেকে কি ধরনের সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে তার উপর [319]। আমাদের আমাদের শরীরের ওজনের কথাই ধরা যাক। অনেক ক্ষেত্রেই দেহের

---

[319] কিছু কিছু ব্যাপারকে পুরোপুরি জেনেটিক বলে মনে করা হয়। যেমন, যেমন, হান্টিংটন রোগ - এই রোগটি ১০০% জেনেটিক। এটা পরিবেশ নির্ভর নয়। আবার শিশুদের মাতৃভাষা রপ্ত করার বিষয়টিকে পুরোপুরি পরিবেশ নির্ভর হিসেবে দেখা হয়। কারণ দেখা গেছে যেকোনো শিশুকে যে কোনো দেশে রেখে বড় করা হলে – সেই দেশের ভাষা রপ্ত করে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না। জিনগত বৈশিষ্ট্য মূখ্য ভুমিকা পালন করলে এমনটি হতে পারতো না। তবে – পুরোপুরি জেনেটিক এবং পুরোপুরি পরিবেশ - এই দুই চরমসীমার মধ্যকার অধিকাংশ বিষয় আশয়কেই আসলে জিন এবং পরিবেশের সুষম মিথস্ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

কাঠামো মোটা হবে না চিকন হবে- তার অনেক কিছুই কিন্তু জেনেটিক। কিন্তু তা বলে জিনের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমরা বসে থাকি না। আপনার যদি একটুতেই 'মুটিয়ে' যাবার প্রবণতা থাকে, তবে আপনি খাবারের উপর আরো যত্নবান হবেন, ব্যায়াম করবেন, চর্বি জাতীয় খাবার কম খাবেন- এইটাই ধর্তব্য। তা না করে আপনি যদি বেহিসেবী জীবন কাটাতে থাকেন, খানা পিনা পানীয় -এর প্রতি লালায়িত থাকেন, সমানে ভুরিভোজ করে যেতে থাকেন- হয়ত আপনার দেহের জিনগুলো আনন্দে আত্মহারা হয়ে আপনার দেহকে নাদুস নুদুস করে তুলবে। কাজেই জিনের অভ্যন্তরস্থ জিনগত প্রকাশভঙ্গি কীভাবে বদলাবেন- তার অনেক কিছুই কিন্তু আপনার দেয়া পরিবেশের উপরই নির্ভর করবে।

একই কথা মানব প্রকৃতি এবং মানুষের অর্জিত ব্যবহারের জন্যও খাটে। মানব প্রকৃতি গঠনে জিন যেমন ভূমিকা রাখে, তেমনি রাখে পরিবেশ। অনেক সময় প্রকৃতিকে পরিবেশ থেকে আলাদাও করা যায় না; আলাদা করার চেষ্টাও হয়ত অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত। ম্যাট রিডলী তার 'এজাইল জিন' বইয়ে সেজন্যই বলেছেন –

> 'আমার কথা আরো একবার স্পষ্ট করে বলি। আমি মনে করি, মানুষের ব্যবহার বিশ্লেষণ করতে হলে প্রকৃতি এবং পরিবেশ দুটোকেই গোনায় ধরতে হবে।... নতুন আবিস্কারের আলোকে বোঝা যাচ্ছে কীভাবে জিনগুলো মানুষের ব্যবহারকে প্রভাবিত করে, আবার কীভাবে মানুষের ব্যাবহার জিনগুলোর প্রকাশভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। কাজেই বিষয়টা আর প্রকৃতি বনাম পরিবেশ (nature versus nurture) নয়, বরং পরিবেশ দিয়ে প্রকৃতি (nature via nurture)।

বংশানু আর পরিবেশ– আসলে আয়তক্ষেত্রের দুটি বাহুর মতো। একটি দৈর্ঘ্য,আরেকটি প্রস্থ। মানব প্রকৃতি নির্মাণে কার ভূমিকা বেশি- জিন না পরিবেশ? এ পশ্ন কেউ করলে এর জবাব হবে- আয়তক্ষেত্র তৈরিতে কার ভূমিকা বেশি- দৈর্ঘ্য

নাকি প্রস্থ?

তাহলে সমকামিতার ব্যাপারটি জন্মগত নাকি পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত?

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে 'জন্মগত' বোলতে আমরা ঠিক কি বুঝব। জেনেটিক ফ্যাকটরকে যদি 'জন্মগত' ধরা হয়, তাহলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পাশাপাশি পরিবেশের প্রভাবটিও থেকে যাচ্ছে পুরোমাত্রায়। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে মুখ্য কারণ হিসেবে প্রতিপন্ন করাটা এই মুহূর্তে আসলে সরলীকরণই হবে। এ নিয়ে মূল বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন এপিজেনেটিক্স নিয়ে অতি সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে ভালো পথ দেখাবে। শুধু একটি জিনের টার্ণ অন বা অফের মাধ্যমেই যে জীবদেহে খুব বড় ধরনের পরিবর্তন হতে পারে এটা আমরা উপরের গবেষণাগুলো থেকেই দেখেছি। নোভা চ্যানেলে একবার একটা একটা ডকুমেন্টরী প্রদর্শিত হয়েছিল- 'গোস্ট ইন ইয়োর জিনস' নামে। সেই ডকুমেন্টরীতে সদৃশ যমজদের একটা ঘটনা দেখানো হয়েছিল যেখানে একই আইডেন্টিকাল টুইন (যারা ১০০% সদৃশ জিন দেহে বহন করে) হওয়া সত্ত্বেও , তাদের মধ্যে একজন খুব স্বাভাবিক হয়ে বেড়ে উঠেছিল, অন্যজন হয়েছে মানসিক প্রতিবন্ধী। সব কিছুই যদি জিনকেন্দ্রিক হতো, তবে এটার আসলেই কোনো ব্যাখ্যা নেই। সব কিছু আসলে জিনকেন্দ্রিক নয়, আসলে খুব পরিষ্কার করে বললে- একই জিন হয়ত একেক জনের দেহে একেক ভাবে ক্রিয়া করে- পরিবেশ থেকে পাওয়া সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে। এপিসেনেটিক্স সেই রহস্যের দুয়ারই উন্মোচন করছে ধীরে ধীরে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে- সদৃশ যমজ দুই ভাইয়ের ক্ষেত্রে কেনো একজন সমকামী, আর অন্যজন আবার বিষমকামী- এপিজেনেটিক্সের প্রভাব গোনায় না ধরলে এর ভালো কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। এপিজেনেটিক্সের এই পরীক্ষাগুলো থেকে বোঝা যায় যে, জিনগত উপাদানের পাশাপাশি পরিবেশের প্রভাবও প্রবলভাবেই রাজত্ব করে প্রবৃত্তি নির্মাণে। পরিবেশের প্রভাব আছে বলেই জেলখানায় কিংবা বন্দি পরিবেশে অনেকে সমকামী প্রবৃত্তি প্রদর্শন করলেও জেল

থেকে ছাড়া পেলে তাদের আচরণের পরিবর্তন ঘটে। শুধু মানুষ নয়, চিড়িয়াখানায় কিংবা বন্দি পরিবেশে বহু প্রজাতি মুক্ত অবস্থার চেয়ে অনেক বেশি সমকামী আচরণ করে থাকে বলে প্রমাণ পেয়েছেন। কাজেই সমকামী আচরণ নির্মাণে পরিবেশ অনেকের মধ্যেই একটা খুব বড় নিয়ামক।

কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই যে পরিবেশ বদলে দিয়ে যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে ভেবে নিলে ভুল হবে। সমকামিতার ব্যাপারটা আসলে একেকজনের কাছে একেক রকম। সমকামীদের সাথে কথা বললেই দেখা যাবে, এদের অনেকেই ছোটবেলা থেকেই তারা বিপরীতধর্মী লোকজনের প্রতি কোনো আকর্ষণ অনুভব করতো না। এদের অনেকেই চেষ্টা করেও যৌনপ্রবৃত্তি পরিবর্তন করতে পারেনি। অনেকে আবার হতাশায় আত্মহত্যাও করেছে এমন উদাহরণও আছে অনেক।

আমাদের মধ্যে অধিকাংশই ডানহতি, তারা ডান হাতেই অধিকাংশ কাজ করেন? সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই দিয়ে কেউ এটাকে স্বাভাবিক বলতে পারেন। কিন্তু যারা ছোটবেলা থেকেই বা হাতে লেখে বা কাজকর্ম করে, তারাও কি স্বাভাবিক নয়? তাদের এই বা হাতে লেখার প্রবৃত্তি কি জন্মগত নাকি পরিবেশের ফল বলা যাবে? অধিকাংশই এটাকে জন্মগত বলেই রায় দেবেন। তারা চেষ্টা করলেই দুই হাতেই সমান দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন বলে মনে হয় না, যদিও খুঁজলে চেষ্টায় সব্যসাচী মানুষ হয়েছেন– এমন উদাহরণ পাওয়াও দুর্লভ হবে না। যৌনপ্রবৃত্তির ব্যাপারটাও অনেকেই ডান হাতি- বা হাতির মতো প্রবৃত্তির ব্যাপার মনে করেন। কেউ কেউ চেষ্টায় বদলাতে পারেন, তবে অধিকাংশই বোধহয় পারেন না।

এমনো হতে পারে যে, যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণকারী জিনগুলো অনেক ছোটবেলাতেই (অনেকের মধ্যে) স্থায়ী হয়ে যায়, অনেকটা আমাদের চোখের রঙ এর মতো। আমরা পরিবেশ পরিবর্তন করে পরে আর তা আর পরে বদলাতে পারি না। চেষ্টা করেও যারা পরবর্তী জীবনে যৌনপ্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটাতে পারেন না তাদেরটা হয়ত

এজন্যই। তবে, অনেকে যেমন কন্টাক্ট লেন্স পরে চোখের কালো মনিকে নীল করে ফেলেন, সেরমকম চেষ্টা যে যৌনপ্রবৃত্তি নিয়েও অনেকে করেন না তা নয়। অনেকে সফল হন, অনেকে হন না। আরো একটা ভালো উদাহরণ দেয়া যাক। আমরা যারা পরিণত বয়সে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছি, তাদের ইংরেজি উচ্চারণে মাতৃভাষার একটা টান থেকেই যায়। ভারত থেকে যারা পাড়ি জমান তাদের থাকে ইন্ডিয়ান এক্সেন্ট। যারা ছেলেবেলায় ব্রাজিলে বড় হয়েছে, তাদের আছে ব্রাজিলিয়ান উচ্চারণ। এখন পরবর্তী জীবনে আমরা দেশ বদল করে আমেরিকায় এসেও আমাদের একসেন্ট খুব বেশি পরিবর্তন করতে পারি কি? ব্রাজিলিয়ানের সেই স্প্যানিশ-ব্রাজিলান একসেন্টের টান রয়েই যায়, আমাদের অনেকের মধ্যে যেমন ইন্ডিয়ান এক্সেন্টের প্রভাব। তবে লক্ষ্ করলেই দেখা যাবে যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত 'আমেরিকানাজড' হওয়াতে অন্যের চেয়ে বেশি পারদর্শী। এরা মাতৃভাষার উচ্চারণগত প্রতিবন্ধকতা অনেকদূর অতিক্রম করে পরদেশী ভাষাটা ভালোই রপ্ত করতে পারেন, তারপরেও যারা খুব কেউকেটা তারা ধরে ফেলেন। আবার অনেকের ক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধকতা একদমই অতিক্রম করা হয়ে উঠে না- একটা শব্দ উচ্চারণ করলেও তা নিজের টিপিকাল মাতৃভাষার এক্সেন্ট নিয়ে বেড়িয়ে আসে। যৌনপ্রবৃত্তির ব্যাপারটাও হয়ত সেরকম। উচ্চারণের মতই সেই ছোটবেলাকার টান থেকেই যায় কারো কারো, কেউ কেউ হয়ত এটা অতিক্রমে বেশি পারদর্শী, কেউবা একদমই কম।

আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে। সমকামিতাকে নিরুৎসাহিত করে বিষমকামিতাকে উৎসাহিত করার সামাজিক একটা চাপ সবসময়ই আমাদের সমাজে থেকে যায়। অনগ্রসর সমাজে এই চাপ অনেক বেশি প্রবল। এই চাপ অতিক্রম করেও যারা নিজেদের সমকামী হিসেবে নিজেদের পরিচিত করে রাখতে পারেন, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা জৈবিক হবার সম্ভাবনাই বেশি। সায়েন্টিফিক আমেরিকান মাইন্ডের 'ডু গেস হ্যাভ এ চয়েস' প্রবন্ধে (২০০৬) একটি তাৎপর্যপূর্ণ

মন্তব্য করা হয়েছে যা হয়ত অনেক পাঠককে ভাবনার খোড়াক যোগাবে–

> ‘যেহেতু ছোটবেলা থেকেই বিষমকামী সমাজের সদস্যদের কাছ থেকে আসা অব্যাহতো চাপ সহ্য করে সমকামীদের বড় হতে হয়, এদের মধ্যে যারা শেষ পর্যন্ত সমকামী হিসেবে টিকে থাকেন, এবং নিজেদের সমকামী হিসবেই সমাজে পরিচিত করেন তারা যে সমকামের প্রতি একটা জিনগত তাড়না থেকেই এটি করেন তা বোধ হয় বোঝা যায়। যদিও সমকামীদের একটা অংশ তাদের যৌনপ্রবৃত্তি পরিবর্তন করতে পারেন বলে জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে, তারপরেও সমকামীদের একটা বড় অংশই তা পারেন না, কিংবা পারলেও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে নয়।’

অভিজিৎ রায়

(১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বাংলাদেশী-মার্কিন প্রকৌশলী, লেখক ও ব্লগার। তিনি বাংলাদেশের মুক্ত চিন্তার আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে সরকারের সেন্সরশিপ এবং ব্লগারদের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের সমন্বয়কারক ছিলেন। তিনি পেশায় একজন প্রকৌশলী হলেও তার স্ব-প্রতিষ্ঠিত সাইট **মুক্তমনা**'য় লেখালেখির জন্য অধিক পরিচিত ছিলেন। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একুশে বইমেলা থেকে বের হওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা তাকে কুপিয়ে হত্যা ও তার স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যাকে আহত করে

অভিজিৎ রায় ইন্টারনেট, ম্যাগাজিন এবং দৈনিক পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তার লেখার বিষয় ছিলো আধুনিক বিজ্ঞান, নাস্তিকতা, সমকামিতা এবং দর্শন। মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত তার বইগুলোর মধ্যে *সমকামিতা (২০১০) একটি।*